২৬ মে ১৯৯৩ ❑ আনন্দবাজার প্রকাশন ❑ দশ টাকা

আনন্দমেলা

❑ বিশেষ আকর্ষণ:
আর্থার. কোনান
ডয়েল-এর লেখা
শার্লক হোম্‌সের গল্প।
এই গল্প দুটি শার্লক হোম্‌সের
গ্রন্থসমগ্রে নেই।
বাংলায় প্রথম অনুবাদ।

❑ রঙিন পোস্টার :
পি. ভি. সত্যেন
❑ আবার বিশ্বসেরা
ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বিশেষ রহস্য গল্প সংখ্যা

লিখেছেন:
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়,
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ,
সমরেশ মজুমদার,
আনন্দ বাগচী,
ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়,
অদ্রীশ বর্ধন ও
আরও অনেকে।

আজকের ছোট বাচ্চারা আর আগেকার দিনের মত নেই। তাদের হেল্‌থ ড্রিঙ্কইবা আজকের মত হবেনা কেন?

দেহের প্রয়োজনীয় ফ্লুইড (দেহরস) তৈরী ও রক্ষা করে। তাইতো, ডাক্তাররা বাড়ন্ত বাচ্চাদের জন্য সর্বদাই সুপারিশ করেন প্রোটিন-সমৃদ্ধ আহার। বোনাসে আছে উচ্চমানের প্রাকৃতিক সোয়া-জাত প্রোটিন। স্বাস্থ্য ও বলবর্ধক।

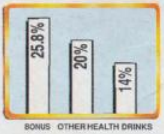

ক্রীমে ভরপুর দুধের পুষ্টি

ক্রীমে ভরা দুধের পুষ্টিতে ভরপুর বোনাস দুরন্ত, প্রাণচঞ্চল বাচ্চাকে দেয় যথেষ্ট শক্তি। বোনাস ক্যালসিয়ামেও সমৃদ্ধ। বাচ্চার শক্ত হাড় ও উজ্জ্বল দাঁত গড়ে তোলার সহায়ক।

মুখরোচক স্বাদ

বোনাসের স্বাদ এত লোভনীয় যে বাচ্চারা মনের আনন্দে খাবে। যদিও সামান্য মিষ্টি দেওয়া থাকে, তবে আরো একটু চিনি মিশিয়ে দিন, দেখবেন এক চুমুকে ওরা কেমন সাবাড় ক'রে দিয়েছে।

নতুন বোনাস আপনারও প্রিয়

নতুন বোনাস তৈরী করা কত সহজ। স্রেফ, এক গ্লাস জলে বড় চামচের তিন চামচ বোনাস দিন। ব্যস্, তৈরী। ইচ্ছা করলে, দুধও মেশাতে পারেন।

এবার হয়ত ভাবছেন দামের কথা। দাম সকলের নাগালের মধ্যে। আপনার বাচ্চাদের যখন এত কিছু করতে হয়, তখন ওদের হেল্‌থ ড্রিঙ্কও কি সেই রকমই হওয়া উচিত নয়?

* 46% of protein requirement for age group 4-6 years. (ICMR Report 1992)

আজকের বাচ্চাদের ওপর কত দিকের চাপ। স্কুলে দীর্ঘ সময়, একগাদা হোম ওয়ার্ক, খেলাধুলার প্রতিযোগিতা, কম্পিউটার, নাচগান, পড়াশুনা আরো কত কি। বলতে গেলে, আজকের কচি বাচ্চারা দম ফেলার সময় পায় না। তাই ওদের হেল্‌থ ড্রিঙ্ক হওয়া উচিত প্রোটিন ভরপুর।

নেসলে এনেছে বোনাস

শিশু পুষ্টিতে আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ নেস্‌লের তৈরী নতুন বোনাসে আছে আজকের বাড়ন্ত বাচ্চার অত্যাবশ্যক পুষ্টি উপাদান। ফ্যাট, কার্বোহাইড্রেট, ফাইবার, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ও অন্যান্য মিনারেলস্। এবং সর্বোপরি অতিরিক্ত প্রোটিন।

বোনাসে আছে অতিরিক্ত প্রোটিন

বোনাসে আছে বাড়তি প্রোটিন-২৫.৮ শতাংশ। আর পাঁচটা হেল্‌থ ড্রিঙ্কের প্রায় দ্বিগুণ। স্রেফ্, দু'গ্লাস বোনাস আপনার বাচ্চার দৈনন্দিন প্রোটিনের প্রায় অর্ধেক পূরণ করে।

বাড়তি প্রোটিন, স্বাস্থোজ্জ্বল বিকাশ

আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন উচ্চমানের প্রোটিন দেহগঠন করে। পেশীর কোষকলা এবং

নতুন দিনের নতুন হেলথ-ড্রিঙ্ক

Mudra:NES:0034:BEN

১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০০ ❑ ২৬ মে ১৯৯৩ ❑ ১৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা

আনন্দমেলা

বিশেষ গোয়েন্দা গল্প সংখ্যা

গোয়েন্দা গল্প

খেলার মাঠ সার আর্থার কোনান ডয়েল ৪
গোয়েন্দা ওয়াটসন সার আর্থার কোনান ডয়েল ৬
ফটিকের কেরামতি শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৭
লাখ টাকার পাথর সমরেশ মজুমদার ১৫
ঘড়ি-রহস্য সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৮
আয়না আনন্দ বাগচী ২২
হেমলক জোন্‌সের চুরুটের বাক্স ফ্রান্সিস ব্রেট হার্ট ২৫
বুবাই আশিস সান্যাল ৩৩
বাঘের নখ অদ্রীশ বর্ধন ৩৬
একটি টিকিটের সূত্রে শিবায়ন ঘোষ ৪৮
জুহু বিচে তদন্ত ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৫৫
সেদিন অবেলায় অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ৫৯
গোলোকদার কম্পিউটার ··· পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত ৬৬

ধারাবাহিক উপন্যাস

পান্ডব গোয়েন্দা ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ৭৫
শিউলি সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৭৮

কবিতা

রহস্যময় শ্যামলকান্তি দাশ ৬৮

কমিক্‌স

অরণ্যদেব ৩১, টিনটিন ৫৩, আর্চি ৭১, গাবলু ৭৩, টারজান ৭৪

খেলাধুলো

ওয়েস্ট ইন্ডিজই এখন ক্রিকেটে বিশ্বসেরা তানাজি সেনগুপ্ত ৪৫
রঙিন পোস্টার : ভি. পি. সত্যেন ৪১

নিয়মিত বিভাগ

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে ১১, ক্যাম্পাস ৩০, কুইজ ৬৪, আঁকিবুকি ৭৬, হাসিখুশি ৭৬, শব্দসন্ধান ৮০, বইয়ের খবর ৮১, নানারকম ৮২

সম্পাদক : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ বাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দাম ১০ টাকা।
বিমান মাশুল ত্রিপুরা ২০ পয়সা উত্তর পূর্ব ভারত ৩০ পয়সা

গরমের ছুটিতে পড়ার জন্য এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল এক ডজনেরও বেশি গোয়েন্দা গল্প। সার আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোম্‌সের দুটি গল্প বাংলায় এই প্রথম প্রকাশিত হচ্ছে। শার্লক হোম্‌সের প্যারডি করে গল্প লিখেছেন অনেকেই। তাঁদেরই একজন ফ্রান্সিস ব্রেট হার্ট। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্পের অনুবাদ পাঠকদের ভাল লাগবে। ভাল লাগবে অন্যান্য গল্পও।

■ আগামী সংখ্যায় ■

প্রচ্ছদকাহিনী
কোবরার মুখোমুখি

বিষাক্ত সাপ গোখরো, শঙ্খচূড়। তা ছাড়াও আছে ভয়ঙ্কর সব সাপ। শুধু এদেশে নয়, আফ্রিকাতেও, বিশ্বের নানা দেশে। ভয়ঙ্কর এই সাপেদের মুখোমুখি হওয়ার রোমাঞ্চকর নানা ঘটনার কথা নিয়ে এই প্রচ্ছদকাহিনী। সঙ্গে দুর্দান্ত সব ছবি।

আশাপূর্ণা দেবীর গল্প
কপালের নাম গোপাল

ভীষ্ম সাহনির গল্প
শাহ শের আলির সমাধিসৌধ

গোয়েন্দা গল্প

খেলার মাঠ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

"আমি হলে নিশ্চয়ই করতাম," বললেন শার্লক হোম্‌স। ভাবনায় বাধা পেয়ে চমকে উঠলাম, কারণ আমার সঙ্গী প্রাতরাশে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর সমস্ত মনোযোগ কফি পটের গায়ে দাঁড় করানো খবরের কাগজটার ওপরে। এখন তাকিয়ে দেখলাম তাঁর দৃষ্টি আমার প্রতি দৃঢ় নিবদ্ধ। চোখ দুটিতে কিছুটা কৌতুক, কিছুটা প্রশ্নও, যেমন হত যখন তিনি নিজস্ব কোনও মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন।

"কী করতে?" আমি জানতে চাইলাম।

হোম্‌স হাসিমুখে ফায়ারপ্লেসের ওপরের তাক থেকে তুর্কি নাগরাটা নিয়ে তার থেকে লম্বা সরু-সরু ফালি তামাক পুরনো মাটির পাইপটাতে ভরলেন। তাঁর প্রাতরাশ সব সময় এভাবেই শেষ হত।

"তোমার মতো চরিত্রের পক্ষে খুবই উপযুক্ত প্রশ্ন, ওয়াটসন," হোম্‌স বলতে লাগলেন, "তুমি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না, যদি বলি তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্য আমার কোনও খ্যাতি হয়ে থাকলে তার সবটাই এসেছে তোমার মতো প্রশংসনীয় সহচরের জন্য। যে তুলনায় অন্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দেয়। আমি কি শুনিনি জনসমক্ষে প্রথম আবির্ভাবের সময় তরুণীরা সাদাসিধে সঙ্গিনী চায়? এদের মধ্যে খানিকটা মিল আছে।"

বেকার স্ট্রিটের ঘরগুলিতে দীর্ঘদিন একসঙ্গে থাকার ফলে আমাদের মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গতা ছিল যার জন্য একে অন্যকে আঘাত না দিয়েও অনেক কথাই বলা যেত। তা সত্ত্বেও স্বীকার করছি, হোম্‌সের মন্তব্যে বিরক্ত হয়েছিলাম।

"আমি হয়তো খুবই নিরেট," আমি বললাম, "কিন্তু আমি মানতে বাধ্য, বুঝতে পারছি না তুমি কী করে জানলে আমাকে..."

"এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেলায় সাহায্য করতে বলা হয়েছে।"

"ঠিক তাই। চিঠিটা এইমাত্র পেলাম, আর তার পর থেকে তোমার সঙ্গে কথা বলিনি।"

"তবু," হোম্‌স চেয়ারে এলিয়ে বসে দু' হাতের আঙুলের ডগাগুলো ছোঁয়াতে লাগলেন, "আমি সাহস করে এও বলব যে, মেলার উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট মাঠটি বড় করা।"

আমি অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকালাম, আর-একটা শব্দহীন হাসি তাকে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল।

"ঘটনা হচ্ছে, হে আমার প্রিয় ওয়াটসন, তুমি একজন উৎকৃষ্ট রোগী। তুমি কখনও নিরাসক্ত নও। বাইরের যে-কোনও প্ররোচনায় তুমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দাও। তোমার মানসিক প্রক্রিয়া মন্থর হতে পারে, কিন্তু কখনও অস্পষ্ট নয়, আর প্রাতরাশের সময় আমি জেনেছি সামনে রাখা টাইম্‌স-এর সম্পাদকীয়টির চেয়ে তোমাকে পড়া সহজ।"

"তুমি কী পদ্ধতিতে এইসব সিদ্ধান্তে এলে? জানতে পারলে খুব খুশি হব।"

"আমার ভয় হয়, ভাল মানুষের মতো সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে নিজের ক্ষতি করছি," হোম্‌স বলল। "কিন্তু এক্ষেত্রে যুক্তির ধারাবাহিকতা এমন সুস্পষ্ট তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, কোনও কৃতিত্ব দাবি করা উচিত নয়। তুমি চিন্তিতভাবে ঘরে ঢুকলে, যেন মনে-মনে কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক চালাচ্ছ। তোমার হাতে একটাই চিঠি ছিল। এখন কাল রাতে তুমি ঘুমোতে গেছ খুবই ভাল মেজাজে, সুতরাং এ-কথা পরিষ্কার যে হাতের চিঠিটাই তোমার পরিবর্তনের কারণ।"

"তো তো বটেই।"

"বলছ বটে, তবে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেওয়ার পর। যাকগে, স্বাভাবিকভাবেই আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, চিঠিতে এমন কী ছিল যাতে তোমার এই ধরনের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। হাঁটবার সময় তুমি খামের উলটো দিকটা আমার দিকে ধরে ছিলে। আর আমি দেখলাম, সেই ঢালের মতো নকশাটা, যা তোমার পুরনো কলেজ ক্রিকেট টিমের ক্যাপেও রয়েছে। আবার পরিষ্কার হয়ে গেল, আবেদনটি এসেছে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে—বা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কোনও ক্লাব থেকে। খাবার টেবিলে পৌঁছে তুমি ঠিকানাটা ওপর দিকে করে খামটা তোমার প্লেটের পাশে রাখলে। তারপর ফায়ারপ্লেসের ওপরে বাঁ দিকে টাঙানো বাঁধানো ছবিটাকে দেখতে গেলে।"

আমার প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিকভাবে হোম্‌স লক্ষ করেছেন দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। "তারপর ?"

"প্রথমে ঠিকানার দিকে নজর দিলাম। ছ' ফুট দূর থেকেও ধরতে পারলাম চিঠিটা বেসরকারি। আমার এই ধারণার কারণ ঠিকানাতে তোমাকে 'ডক্টর' বলা হয়েছে। একজন এম· বি· হিসেবে এই সম্বোধনে তোমার কোনও আইনগত অধিকার নেই। আমি জানি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা উপাধির সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে বড় খুঁতখুঁতে। কাজেই আমি নিঃসন্দেহ হলাম তোমার চিঠিটি বেসরকারি। যখন খাবার টেবিলে ফিরে এসে তুমি খামটাকে উলটে ধরলে আর দেখা গেল ভেতরে একটা ছাপা কাগজ, মেলার কথাটা আমার প্রথম মনে এল। রাজনৈতিক সম্ভাবনাও আমার মাথায় এসেছিল, তবে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দিতে হল, কারণ রাজনীতিতে এখন কিছুই হচ্ছে না।

"টেবিলে ফিরে আসার পরও তোমার মুখের ভাব একই রয়ে গেল। বোঝাই যাচ্ছিল ছবিটা দেখে তোমার চিন্তাপ্রবাহ দিক পরিবর্তন করেনি। তা হলে ছবিটাও একই বিষয়ের। আমি এইবার ওটাকে দেখলাম, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট একাদশ ; তার মধ্যে তুমি আছ ; পেছনে প্যাভিলিয়ন ও ক্রিকেটের মাঠ দেখা যাচ্ছে। ক্রিকেট ক্লাব সম্বন্ধে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে তার থেকে জেনেছি গির্জা আর অশ্বারোহী সৈনিকরা ছাড়া এদের মতো ঋণগ্রস্ত পৃথিবীতে কেউ নেই। যখন টেবিলে বসে তুমি খামটার ওপর পেনসিলে দাগ কাটতে লাগলে, আমার সন্দেহ রইল না তুমি কোনও মেলা থেকে টাকা তুলে মাঠের উন্নতির কথা ভাবছ। তোমার মুখে তখনও দ্বিধার ছাপ ছিল। তাই তোমাকে চমকে দিয়ে উপদেশ দিলাম, এত ভাল কাজে তোমার সাহায্য করা উচিত।"

এই অতি সরল ব্যাখ্যায় আমি না হেসে পারলাম না।

"অবশ্যই, ব্যাপারটা একেবারেই সোজা।"

আমার মন্তব্যে হোম্‌স বিরক্ত হলেন।

"আমি আরও বলতে পারি তোমার কাছে যা চাওয়া হয়েছে তা হল, ওদের পত্রিকার জন্য একটি লেখা, আর তুমি ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছ এই ঘটনাটা নিয়েই লিখবে।"

"কিন্তু কী করে...," আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

"একেবারেই সোজা। উত্তর তুমি নিজেই খুঁজে নাও। এখন (হোম্‌স খবরের কাগজটা তুলে নিলেন) যদি অনুমতি দাও এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধটিতে ফিরে যাই। বিষয় উত্তর ইতালির ক্রেমোনা অঞ্চলের গাছ আর কেন তাদের কাঠ দিয়ে সবচেয়ে ভাল বেহালা তৈরি হয়। এইরকম কিছু বহুদূরবর্তী ক্ষুদ্র সমস্যা আমাকে মাঝে-মাঝে টানে।"

কাহিনী-সূত্র : মূল ইংরেজি শিরোনাম 'The Field Bazaar' প্রকাশিত হয়েছিল এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মুখপত্র 'The Student' এর ২০ নভেম্বর, ১৮৯৬ সংখ্যায়। সার আর্থার কোনান ডয়েল ১৮৭৬ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। গল্পে যেমন আছে, কোনান ডয়েলের উদ্দেশ্য ছিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিকেট মাঠের উন্নতিকল্পে টাকা তোলা। শার্লক হোম্‌সের স্রষ্টা সারে-র হয়ে ক্রিকেট খেলতেন। এই সুবাদেই ১৯০৩ সালে পি. জি. উডহাউস তাঁর সাক্ষাৎকার নেন একটি পত্রিকার জন্য। ডবলিউ. জি. গ্রেস মারা যাওয়ার পরে The Times-এ ১৯১৫-র ২৭ অক্টোবর প্রকাশিত শোকজ্ঞাপক রচনাটি কোনান ডয়েলই লিখেছিলেন। এই গল্পটি হোম্‌সের প্রকাশিত দু'খণ্ডের সমগ্র কীর্তিকাহিনীতে পাওয়া যাবে না। তিনি যে ক্রিকেটে আগ্রহী ছিলেন এ-তথ্য প্রথমে এই গল্পেই জানা যায়। পরিশেষে, প্রশ্ন উঠতে পারে 'A Study in Scarlet' বা 'শোণিত লেখা'-য় (১৮৮৭) কি ভুল ছিল ?এই কাহিনীতে ওয়াটসন এম· ডি· বা ডক্টর অব মেডিসিন, এম·বি·বা ব্যাচেলর অব মেডিসিন নন। তাই তিনি নিঃসন্দেহে ডঃ ওয়াটসন।

অনুবাদ : ধরণী ঘোষ

ছবি : অনুপ রায়

গোয়েন্দা গল্প

গোয়েন্দা ওয়াটসন

সার আর্থার কোনান ডয়েল

প্রাতরাশের টেবিলে বসার পর থেকেই ওয়াটসন তাঁর সঙ্গীকে একাগ্রচিত্তে দেখছিলেন। হোমস মাথা তুলতে চোখাচোখি হল।

"কী ভাবছ ওয়াটসন ?"

"তোমার কথা।"

"আমার ?"

"হ্যাঁ হোমস, আমি ভাবছিলাম তোমার কায়দাগুলো কী খেলো, আর কী আশ্চর্য, লোকের এখনও ওতে আগ্রহ আছে।"

"আমি এ-বিষয়ে একমত," বললেন হোমস।

"সত্যি-সত্যিই আমার মনে পড়ছে আমিই এরকম কিছু বলে থাকব।"

"তোমার কায়দাগুলো," ওয়াটসনের গলার স্বর কঠোর হল, "সত্যিই সহজে শেখা যায়।"

"কোনও সন্দেহ নেই," হোমস হাসলেন। "তুমিই এইভাবে সূত্র থেকে সিদ্ধান্তে আসার একটা উদাহরণ দাও না।"

"সানন্দে," ওয়াটসন উত্তর দিলেন। "আমি বলতে পারছি আজ সকালে ঘুম থেকে ওঠার সময় তুমি খুবই বিচলিত ছিলে।"

"চমৎকার," বললেন হোমস, " কী করে জানলে ?"

"কারণ, সাধারণত তুমি খুব ফিটফাট, তবুও দাড়ি কামাতে ভুলে গেছ।"

"হায়, হায়, কী বুদ্ধি," বলে উঠলেন হোমস। "আমার ধারণা ছিল না ওয়াটসন তুমি এত চটপটে ছাত্র। তোমার ঈগল-চক্ষু কি আর কিছু দেখতে পেয়েছে ?"

"হ্যাঁ হোমস, তোমার একজন মক্কেল আছে, নাম বার্লো, আর তার মামলায় তুমি সুবিধে করতে পারোনি।"

"আরে, তুমি জানলে কী করে ?"

"ওর খামের ওপর নামটা দেখলাম। ওটা খোলার সময় তোমার গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল, আর তুমি ভ্রুকুটি করে খামটা পকেটে ঢোকালে।"

"অপূর্ব ! তোমার সত্যিই চোখ আছে। আর কিছু ?"

"হোমস, আমার ভয় হচ্ছে তুমি ফাটকা খেলা ধরেছ।"

"কী করে বলতে পারলে ওয়াটসন, আমি তো ভাবতেই পারছি না।"

"তুমি খবরের কাগজ খুলে ব্যবসা-বাণিজ্যের পাতাটা দেখলে, তারপর পছন্দের কিছু পেয়েছ এমন একটা আওয়াজ করলে।"

"থাক, তোমার খুব বুদ্ধি, ওয়াটসন। আরও ?"

"হ্যাঁ হোমস, তুমি ড্রেসিং গাউনের বদলে কালো কোট পরেছ, তার মানে তোমার কাছে বিশেষ দরকারি কেউ আসবে।"

"আরও কিছু আছে ?"

"হোমস, আমার সন্দেহ নেই, আরও কিছু পেতে পারি। কিন্তু শুধু এই ক'টা বললাম তোমাকে দেখাবার জন্য যে তোমার মতো বুদ্ধিমান পৃথিবীতে আরও লোক আছে।"

"আর কিছু আছে যাদের অত বুদ্ধি নেই," বললেন হোমস।

"মানছি তারা সংখ্যায় কম, কিন্তু হে প্রিয় ওয়াটসন, তুমি তাদের একজন বলেই আমার আশঙ্কা।"

"কী বলতে চাও হোমস ?"

"বেশ, বলছি। হে আমার প্রিয় বন্ধু, তোমার সিদ্ধান্তগুলো আমি যতটা চাই ততটা সঠিক হয়নি।"

"মানে আমার ভুল হয়েছে।"

"সে তো একটু হয়েছেই। এক-এক করে দেখা যাক। আমি দাড়ি কামাইনি কারণ ক্ষুর ধার দিতে পাঠিয়েছি। কোট পরেছি কারণ এমনই দুর্ভাগ্য, তাড়াতাড়ি দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তার নাম বার্লো, আর চিঠিটা এসেছে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক আছে এটা জানাতে। ক্রিকেটের পাতাটা ব্যবসা-বাণিজ্যের পাশে। আমি দেখছিলাম, সারে কেন্ট-এর সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে কি না। কিন্তু চালিয়ে যাও, ওয়াটসন, চালিয়ে যাও। কায়দাটা খুবই খেলো। কোনও সন্দেহ নেই তুমি তাড়াতাড়ি শিখে যাবে।"

কাহিনী-সূত্র :

মূল ইংরেজি শিরোনাম 'How Watson learned the trick' লেখার উপলক্ষ ১৯২৪ সালে রানি মেরি-র জন্য একটি পুতুলের বাড়ি তৈরি, যার স্থপতি ছিলেন আধুনিক নতুন দিল্লির জনক Sir Edwin Lutyens. এই ছোট বাড়িটির (এখন উইন্ডসর দুর্গে) লাইব্রেরিতে মানানসই খুদে-খুদে বই আছে। প্রতিটির খাড়াই দেড় ইঞ্চি আর চওড়া সওয়া ইঞ্চি। কোনান ডয়েল গল্পটি নিজের হাতে লিখেছেন ৩৪ পাতা জুড়ে। বলা বাহুল্য, প্রচলিত দু'খণ্ডের হোমস রচনাবলীতে এটি পাওয়া যাবে না।

অনুবাদ : ধরণী ঘোষ

ছবি : অনুপ রায়

গোয়েন্দা গল্প

ফটিকের কেরামতি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

মাঝরাত্তিরে শিয়রের জানালাটায় মৃদু ঠুকঠুক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফটিকের। ঘুম তার খুব পলকা। সে উঠে হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে জানালাটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। আঁট করে বন্ধ রয়েছে পাল্লা। এত রাতে কারও আসার কথা তো নয়! চোর-ডাকাত যে নয় তা ফটিক জানে। কারণ, চোরের বাড়িতে চোর আসে না। তবে কে হতে পারে?

ফটিক গলাখাঁকারি দিয়ে খুব বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, "কে আজ্ঞে? কী চাইছেন?"

ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা চাপা স্বরে বলল, "জানালা খোলো। দরকার আছে।"

"কী দরকার?"

"তোমার কিছু রোজগার হবে।"

রোজগার জিনিসটা ফটিক বড় ভালবাসে। রোজগারের মতো জিনিস নেই। গত দিন দশেক তার এক পয়সাও রোজগার হয়নি। দিনের বেলা সে বেড়া বেঁধে বেড়ায়। রাতের বেলা একটু-আধটু চুরিটুরির চেষ্টা করত। দুটোর কোনওটাতেই তার সুবিধে হচ্ছে না। কচু-ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটছে। একা-বোকা মানুষ বলে চলে যায়।

ফটিক বুকে একটু সাহস এনে জানালাটা খুলল। কিন্তু বাইরে অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। ফটিক একটু ভয়ে-ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিল। হঠাৎ দস্তানা-পরা একখানা হাত তলার দিক থেকে উঠে এসে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট ছুড়ে দিল তার পায়ের কাছে। ফটিক চমকে উঠে নিচু হয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল। বেশ ভারী জিনিস।

বাইরে থেকে ভারী গলাটা বলল, "ওটা একটা পিস্তল। গুলি ভরা। সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। কাজটা করতে পারলে আরও পাঁচশো।"

পিস্তল! ফটিকের হাত-পা কাঁপতে লাগল। বলল, "আজ্ঞে এ যে ভয়ঙ্কর জিনিস।"

"শুনতে ভয়ঙ্কর, ব্যবহার করা খুব সোজা।"

"কাজটা কী বলবেন?"

"বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে পরশুদিন। হাজার লোকের নেমন্তন্ন। দেড়শো বরযাত্রী আসবে। বাজি-টাজি ফাটবে। তোমার কাজটা হল, গোলেমালে হরিবোল। ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে বঙ্কুবাবুর কাছাকাছি চলে যাবে। নলটা পিঠের বাঁ দিকে ঠেকাবে, ঘোড়াটা টেনে দেবে, ব্যস।"

"ওরে বাবা!" ফটিক ঘামতে লাগল।

"কোনও ভয় নেই। সন্ধে সাতটা থেকে বাজি ফাটবে। শব্দটা কেউ লক্ষই করবে না। কাজ সেরে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ফেলবে। তাড়াহুড়ো না করে ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আহা-উহু করবে। থানা থেকে পুলিশ আসতে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণে বেরিয়ে নদীর ধারে বটতলার বাঁধানো চাতালের কাছে গিয়ে দেখবে ইট চাপা দেওয়া আরও পাঁচশো টাকা রয়েছে। টাকাটা নিয়ে পিস্তলটা ওখানেই রেখে চলে আসবে। তোমার কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে তিনদিনের মধ্যে তোমাকে খুন করা হবে।"

ফটিক আঁতকে উঠে বলল, "তা বঙ্কুবাবুকেও কেন আপনারাই সাবাড় করছেন না? আমি যে জীবনে খুনখারাপি করিনি।"

"আমাদের অসুবিধে আছে। কাজটা তোমাকেই করতে হবে।"

"আমি কি পারব আজ্ঞে?"

কেউ কোনও জবাব দিল না। একটা পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল।

ফটিক ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, বুক এমন ধড়ফড় করছে যেন তবলার লহরা, খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। তারপর মোড়কটা খুলে পিস্তলটা দেখল। এসব জিনিস সে চোখেও দেখেনি আগে। বিদঘুটে চেহারা, তাকালেই ভয় হয়।

রাতে আর ফটিকের ঘুম হল না। সারা রাত আকাশ-পাতাল ভেবে মাথাটাই গরম হয়ে গেল। খুনখারাপি তার লাইন নয়। রক্ত দেখলে সে এখনও ভিরমি খায়। সে সামান্য চুরিটুরির চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতেও তার হাতযশ নেই। নিতান্ত অভাবে পড়েই চেষ্টা করতে হয়, নইলে চুরিও তার লাইন নয়। দুটো পেটের ভাতের জোগাড় হলে সে কস্মিনকালেও চুরি করত না। কিন্তু এরা যে তাকে খুনোখুনিতে কেন নামাতে চাইছে তা সে বুঝতে পারছে না। খুন না করতে পারলে খুন হতে হবে— কী সব্বোনেশে কথা! ঘনঘন জল খেতে-খেতে তার পেট জয়ঢাক হয়ে গেল, তবু বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সকালবেলা মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাওয়ায় বসে রইল ফটিক। তার বাটিভর্তি পান্তা পড়ে রইল। খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে না। কাল বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে। আর কালকেই তাঁকে খুন করতে হবে।

মেয়ের বিয়ে বেশ জাঁকিয়েই দিচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তাঁর মেলা পয়সা। চার-পাঁচ রকমের ব্যবসা আছে। বঙ্কুবাবুর বাড়ি ফটিকের একরকম গা ঘেঁষেই। রোজ দু'বেলা যাতায়াতের পথে সে দেখেছে, বিয়ের মস্ত আয়োজন হচ্ছে। বিশাল শামিয়ানা, দেবদারু দিয়ে তোরণ হচ্ছে, নহবত বসেছে। মেলা লোক খাটছে দিনরাত। দুঃখের বিষয়, এ-বিয়েতে ফটিকের নেমন্তন্ন নেই। হওয়ার কথাও নয়। তার মতো লোককে পোঁছে কে?

ভয়ে ফটিকের কেমন যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু কী করবে তা বুঝতে পারছে না। বঙ্কুবাবুর মতো পাজি লোক মারা গেলে তার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু খুন করাটায় তার ঘোর আপত্তি হচ্ছে।

ফটিকের মাথায় নানা ফিকির খেলছে। কিন্তু কোনওটাই মনোমতো নয়। একবার মনে হল, পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যারা তার পেছনে লেগেছে, তারা হয়তো নজর রাখছে। পুলিশের কাছে যাবে? গিয়ে লাভ নেই, পুলিশ তার কথা বিশ্বাস করবে না। উলটে পিস্তল রাখার দায়ে হাজতে পুরবে। বঙ্কুবাবুকে সব ভেঙে বলবে? লাভ কী? তিনি খুন না হলে সে নিজেই যে খুন হবে।

দুপুর অবধি মাথাটা পাগল-পাগল লাগল। তারপর নুন-লঙ্কা-তেঁতুল দিয়ে পান্তাটা খেয়ে নিল সে। পেট ঠান্ডা হল। মাথাটাও যেন একটু শীতল লাগতে লাগল। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। কে হতে পারে লোকটা? খুন করতে চায় কেন? তাকে দিয়েই খুনটা করাতে চায় কেন? বঙ্কুবাবুকে মেরে কার কী লাভ?

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ফটিক। একখানা কথা মনে পড়ে গেল তার। মাসতিনেক আগে বঙ্কুবাবুর বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে মুনিশ খাটানো হয়েছিল। সেই দলে ফটিকও ছিল। সারাদিন খাটিয়ে মাত্র পাঁচটি টাকা মজুরি দিয়েছিলেন বঙ্কুবাবু। খাবার জুটেছিল চিঁড়ে আর গুড়। তবে বড় ঘরের জানালার নীচে আগাছা কাটার সময় ফটিকের কানে একটা কথা এসেছিল। ফটিকবাবু যেন কাকে বলছেন, "ওই গ্যাঁড়াই আমাকে মারবে একদিন। তারপর সব গাপ করবে।"

এই গ্যাঁড়াটি কে তা ফটিক জানে না। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সে পিস্তলটা বিছানার তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখল। পাঁচশোটা টাকা ট্যাঁকে গুঁজল। গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বঙ্কুবাবুদের বাড়িতে সানাই বাজছে। মেলা লোকলস্কর খাটছে। তোরণে ফুলের তৈরি প্রজাপতি বসানো হয়েছে। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। ফটিক বাড়িতে ঢুকে চারদিক দেখতে লাগল। তার মতো আরও অনেকেই দেখতে এসেছে। ফটকে দরোয়ানদের তেমন কড়াকড়ি নেই।

শামিয়ানার ওপরে বড়-বড় ঝাড়লণ্ঠন লাগানো হচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে দেখছিল ফটিক। হঠাৎ কে যেন বজ্রমুষ্ঠিতে তার ডান হাতের কনুই চেপে ধরে বলে উঠল, "এই যে!"

ফটিক এমন আঁতকে উঠল যে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। তোতলাতে-তোতলাতে বলল, "আজ্ঞে, আমি না। আমি কিছু

করিনি।"

বঙ্কুবাবু কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। হাসি-হাসি মুখ করে বললেন, "তুই, ফটিক না?"

"যে আজ্ঞে।"

বঙ্কুবাবু হাসি-হাসি মুখ করেই বলেন, "একটু উপকার কর তো বাবা। কুমুদের দোকানে পাঁচ সের সুপুরি রাখা আছে। আনার লোক নেই। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় তো।"

ফটিক ধাতস্থ হল। আঁতকে ওঠার ভাবটা চট করে কেটে গেল তার। কাল তো এ লোকটাকেই খুন করার কথা। ঘাবড়ালে চলবে কেন। সে হঠাৎ বলে বসল, "লোক নেই কেন বঙ্কুবাবু? গ্যাঁড়াকেই তো পাঠাতে পারেন।"

বঙ্কুবাবু অবাক হয়ে বললেন, "গ্যাঁড়া! গ্যাঁড়াটা আবার কে?"

ফটিক সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, "ওই যে, আপনার কী যেন হয়!"

আন্দাজে ঢিল মেরেছিল। বোধ হয় লাগল না।

বঙ্কুবাবু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভ্রু-জোড়া কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন, "তোর তো সাহস কম নয়! জামাইকে দিয়ে

সুপুরি আনাতে বলছিস ! আর আমার বড় জামাই কি তোর ইয়ার যে গ্যাঁড়া-গ্যাঁড়া করছিস ?"

ফটিক হাতজোড় করে বলল, "আজ্ঞে আমরা মুখু-সুখু মানুষ, কত ভুলভাল বলে ফেলি !"

"যা সুমুখ থেকে। সুপুরিটা নিয়ে আয়।"

পথে হাঁটতে-হাঁটতে দুইয়ে-দুইয়ে চার করল ফটিক। বঙ্কুবাবুর দুটো মেয়ে, ছেলে-টেলে নেই। বঙ্কুবাবু মারা গেলে মেয়েরা ওয়ারিশান। বড় জামাই গ্যাঁড়া। তাকে চেনে না ফটিক। তবে একটা গন্ধ পাচ্ছে।

সুপুরি পৌঁছে দেওয়ার পর বঙ্কুবাবু একটা সিকি বকশিশ দিলেন। তারপর হাসিমুখ করেই বললেন, "হঠাৎ গ্যাঁড়ার কথা বললি কেন বল দিকি !"

"আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।"

বঙ্কুবাবু একখানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনেই বললেন, "অকালকুষ্মাণ্ড। ছিবড়ে করে ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও।"

ফটিক বশংবদ দাঁড়িয়ে থেকে শুনে নিচ্ছিল।

"কী শুনছিস দাঁড়িয়ে ?"

"আজ্ঞে, গালাগাল দিচ্ছেন তো, চলে গেলে বেয়াদপি হবে যে !"

"গালাগাল তোকে দিইনি।"

"তবে কাকে ?"

"নিজের কপালকে। ওই যে দেখছিস না, চেহারা বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই আমার কপাল।"

যাকে দেখিয়ে দিলেন বঙ্কুবাবু তার বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। রং ফরসা, কোঁচানো ধুতি আর মুগার পাঞ্জাবি পরে ঘুরে-ঘুরে ব্যবস্থা দেখছে।

"বেশ জামাইটি আপনার বঙ্কুবাবু।"

"হ্যাঁ, একেবারে মনের মতো। এখন যা তো। জ্বলছি নিজের জ্বালায়।"

ফটিক লোকটিকে ভাল করে দেখে নিল। যাতে ভুল না হয়। তারপর ধীরেসুস্থে ফিরে এল। মনটা একটু হালকা লাগছে।

মাঝরাতে আবার জানালায় ঠকঠক। ফটিক জানালা খুলে অমায়িক গলায় বলে, "যে আজ্ঞে।"

ভারী গলা বলল, "মনে আছে তো !"

"খুব মনে আছে। বাকি টাকাটা দেবেন নাকি ?"

"কাল পাবে। জায়গামতো। কাজে যদি গন্ডগোল হয় তো মরবে।"

"আর বলতে হবে না।"

পরদিন ফটিক দোকানে গিয়ে ভাল করে সাঁটিয়ে খেল। দুপুরে ঘুমোল, বিকেলে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে হাজির হল বঙ্কুবাবুর বাড়িতে। সারা বাড়ি আজ যেন রাজবাড়ির মতো দেখাচ্ছে। আলোয়-আলোয় স্বপ্নপুরী। ভিড়ে ভিড়াক্কার। বরসহ বরযাত্রীরাও সব এসে গেল সন্ধের মুখেই। গোলাপজল ছিটোনো হচ্ছে চারদিকে। বঙ্কুবাবু সবাইকে "আসুন, বসুন" করছেন। পাশে গ্যাঁড়া। সেও খুব সেজেছে।

বাজি পোড়ানো শুরু হল। বাজির শব্দে চারদিক একেবারে গমগম করতে লাগল। হঠাৎ ফটিক লক্ষ করল, গ্যাঁড়া এই এত ভিড়ের মধ্যেও আড়চোখে তাকে নজরে রাখছে।

ফটিক মনে-মনে হাসল। গ্যাঁড়া এক মুহূর্তের জন্যও বঙ্কুবাবুর কাছ থেকে নড়ছে না।

লোকজন যখন শামিয়ানার বাইরে এসে ভিড় করে উর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে আতশবাজি দেখছে, ঠিক সেইসময় ফটিক এগিয়ে গিয়ে গ্যাঁড়ার পেছনে দাঁড়াল। নলটা তার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, "ইষ্টনাম স্মরণ করুন বঙ্কুবাবু।"

গ্যাঁড়া হঠাৎ আঁতকে উঠে বলল, "আমি বঙ্কুবাবু নাকি ? আহাম্মক কোথাকার ! ওই তো বঙ্কুবাবু।"

ফটিক মাথা চুলকে বলল, "ইস, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো !"

গ্যাঁড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "গাধা কোথাকার ! যাও যাও, কাজ সারো, আর সময় নেই।"

ফটিক একগাল হাসল, "বটে ! তা টাকাটা জায়গামতো আছে তো !"

গ্যাঁড়া মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আছে।"

"ঠিক তো !"

গ্যাঁড়া ঘুরে তার গালে একখানা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, "বেয়াদপ কোথাকার !"

ব্যাপার দেখে বঙ্কুবাবু এগিয়ে এলেন, "এ কী ! কী হয়েছে ?"

ফটিক গালে হাত বোলাতে-বোলাতে বলল, "হয়নি। তবে হবে।"

"কী হবে ফটিক ?"

ফটিক গ্যাঁড়ার দিকে চেয়ে বলল, "বলব বাবু ?"

গ্যাঁড়ার মুখটা হঠাৎ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। আচমকা সে ভিড় ঠেলে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। তাকে আর দেখা গেল না।

বঙ্কুবাবু চালাক লোক। ফটিকের হাত ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন চট করে।

"ফটিক, ব্যাপারখানা কী ?"

ফটিক লজ্জায় অধোবদন হয়ে সবই বলল। খুব অপরাধী মুখ করে। কিন্তু বঙ্কুবাবুর মুখখানা চকচক করতে লাগল। একটু খুশির গলাতেই বললেন, "ব্যাটা অনেকদিন ধরেই নানা মতলব আঁটছিল। তুই বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিস। তোর বুদ্ধি আছে। ও ব্যাটা আর ইদিকে আসবে না শিগগির।"

বঙ্কুবাবু খুশি হলেই হাত-উপুড়। আর তাঁর হাত-উপুড় মানেই পর্বত। বঙ্কুবাবু ফটিককে একখানা দোকান করে দিলেন। বেশ বড়সড় মুদির দোকান। আর বটগাছের তলায় পাঁচশো টাকাও পেয়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা বঙ্কুবাবুকে দিয়েছিল ফটিক। বঙ্কুবাবু বললেন, "এটা আমারই জিনিস। গ্যাঁড়া গেঁড়িয়েছিল।"

তা কথাটা হল, ফটিককে আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে না।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আজ্ঞে হ্যাঁ, সঠিক খাবার না খেলে বাচ্চার বাড়-বাড়ন্তে বাধা আসে...

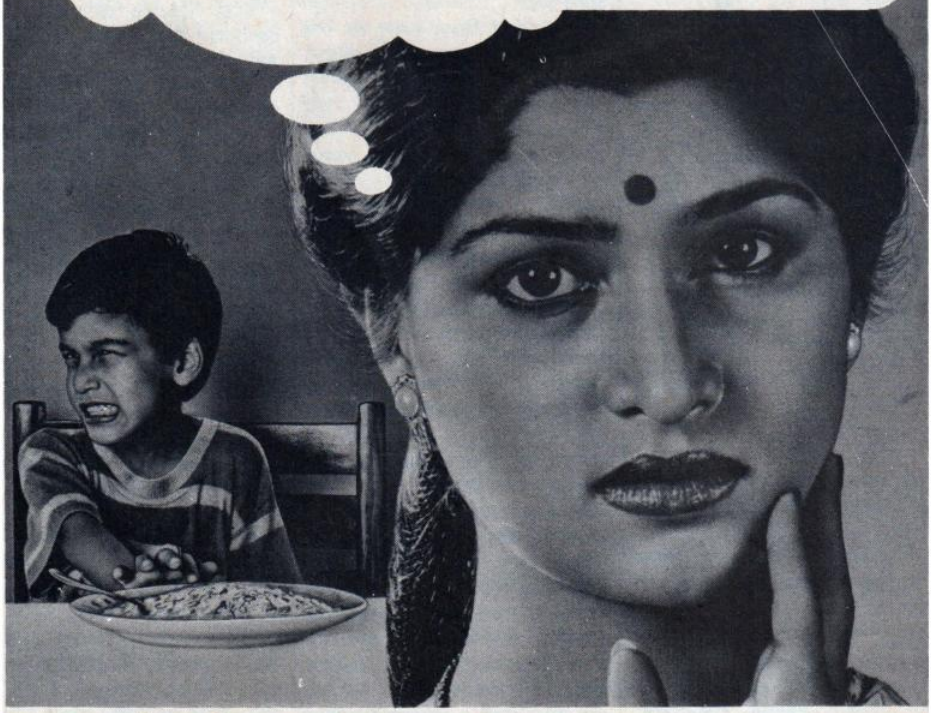

যে বাচ্চা ঠিকমত খায় না, সে তার শরীরের প্রয়োজনমত পুষ্টি পুরোপুরি পায় না। আর পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে বাচ্চার বাড়-বাড়ন্তে বাধা আসতে পারে। ওকে দিন কমপ্লান, যা হারানো পুষ্টি ফিরে পেতে ওকে সাহায্য করে। কমপ্লানে রয়েছে দুধ প্রোটিন (২০%) - তার বাড়-বাড়ন্তের জন্যে সবচেয়ে সেরা প্রোটিন। তাছাড়া, অন্যান্য ২২ রকমের খাদ্যগুণও যা তার শরীরের জন্যে একান্ত প্রয়োজন।

কমপ্লান®

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

GX/27/224 BEN R2

বিজ্ঞান : যেখানে যা হচ্ছে

কোষ-তোরণের প্রহরী

ডি·এন·এ·অর্থাৎ ডি অক্সি রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড আছে প্রতিটি জীবকোষে। জীবদেহের যাবতীয় গঠন ও প্রকৃতির সে নিয়ন্তা। ডি·এন·এ·হল কোষের মস্তিষ্ক। কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে এর অবস্থান। মহামূল্যবান এই ডি·এন·এ·কে রক্ষা করার জন্য নিউক্লিয়াসের চারপাশে রয়েছে এক সছিদ্র আবরণ, যার নাম 'নিউক্লিয়ার মেমব্রেন'। নিউক্লীয় পরদার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইসব ছিদ্র দিয়ে নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে ডি এন এ তৈরির মালমসলা— নানা ধরনের অণু এবং আয়ন। আবার রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা আর·এন এ·শারীরবৃত্তীয় নানা নির্দেশ নিয়ে বেরিয়ে আসে ওইসব ছিদ্রপথেই। ছিদ্রগুলি যেন কোষের

চেকপয়েন্ট। এদের চেহারা ঠিক কেমন, এতদিন তা খুব স্পষ্ট করে জানা ছিল না। সম্প্রতি ক্যালিফোর্নিয়ার লাজোলার স্ক্রিপস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের জেনি হিন্স এবং তাঁর সহযোগী গবেষকরা নিউক্লীয় পরদার ছিদ্রগুলির ত্রিমাত্রিক ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছেন। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে তোলা ২০০টি ছবিকে কম্পিউটারে ফেলে এক-একটি ছিদ্রের যে ত্রিমাত্রিক চেহারা পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রতি ছিদ্রের চারপাশে জটিল সব প্রোটিন অণুর সমাবেশ। এই প্রোটিন-অণুরাই নিউক্লিয়াসের প্রবেশ-তোরণে এক-একজন প্রহরী। কোন-কোন অণু বা আয়নকে ঢুকতে বা বেরোতে দেওয়া হবে কিংবা হবে না সেটা তারাই ঠিক করে দেয়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এরকমই একটি ছিদ্রের ত্রিমাত্রিক চেহারা। অনেকটা আংটির মতোই। আংটির মাঝখানের ফুটোটি মূল ছিদ্র। এর চারপাশে আছে আরও আটটি ক্ষুদ্রতর ছিদ্র। গবেষকদের ধারণা, ছোট ছিদ্রগুলি আয়ন এবং ছোট অণুদের প্রবেশপথ। আর বড় ছিদ্র দিয়ে যাওয়া-আসা করে বৃহদাকার আর·এন·এ·অণু।

ঘরের দেওয়ালে সমুদ্র

আমরা কতভাবেই না ঘর সাজাই! দেওয়ালে বড়-বড় ছবি এঁটে কখনও অরণ্য, কখনও তুষারশুভ্র পাহাড়, কখনও-বা সমুদ্রের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাই। কিন্তু ছবি ছবিই, ত্রিমাত্রিক 'এফেক্ট' দিয়ে ক্ষণিক বিভ্রম আনতে পারলেও শেষপর্যন্ত তা ক্যামেরায় তোলা বা তুলিতে আঁকা দৃশ্যই থেকে যায়। কিন্তু 'লুমিলাইট' বলে নতুন এক চিত্রশিল্পে এইসব দৃশ্য যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। যতক্ষণ দেখা যায় ততক্ষণই বিভ্রম। সাধারণ সাদা দেওয়ালে জেগে ওঠে গভীর নীল সমুদ্র আর বিচিত্র সব জলচর।

অথবা রহস্যের হাতছানি দেয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কোনও অরণ্য। কিংবা সুদূর মহাকাশের অসীম বিস্ময় এসে ধরা দেয় চার দেওয়ালের মধ্যে। আর এসবের পেছনেই রয়েছে কালো আলোর খেলা। কালো আলো মানে আলট্রা ভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মি, সাদা চোখে যার ছটা ধরা পড়ে না, কিন্তু বিশেষ রঙে আঁকা দৃশ্যকে ফুটিয়ে তোলে জাদুস্পর্শে। আবার আলো বন্ধ করলেই দৃশ্যও অদৃশ্য। অতিবেগুনি আলোয় সাদামাঠা দেওয়ালে ফুটে ওঠে অসাধারণ এক দৃশ্য। কে বলবে আসল সমুদ্র নয়! শিল্পী তাঁর খুশিমতো যাই আঁকুন না কেন, অদৃশ্য আলো তাকে জীবন্ত করে তুলবে। এই লুমিলাইট শিল্প বিদেশে ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে, বিশেষ করে রেস্তরাঁ এবং থিয়েটার ও ডিস্কো নাচের হলগুলিতে। বিত্তবানদের বাড়িতেও হয়তো শিগ্‌গিরই চালু হয়ে যাবে।

পতঙ্গজগতে আদানপ্রদানের ভাষা আজও রহস্য...

পতঙ্গের ভাষা

মৌমাছি, প্রজাপতি, ফড়িং, ঝিঁঝিপোকা, পিঁপড়ে ইত্যাদি পতঙ্গরা রসায়নের ভাষায় পারস্পরিক ভাব বিনিময় করে। এই বিনিময়ের মাধ্যম হল ফেরোমোন নামে একটি হরমোন। এই প্রাণরাসায়নিক যৌগটির গন্ধের সূত্র ধরে ওরা খাবারের সন্ধান পায়, পায় বিপদের আগাম খবর। এটা বিজ্ঞানীরা অনেকদিন আগেই আবিষ্কার করেছেন। যদিও এর সম্পূর্ণ রহস্য এখনও অজানা। রাসায়নিক গন্ধের ভাষায় এই আদানপ্রদান শুধু এক-একটি প্রজাতির পতঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কখনও-কখনও ভিন্ন প্রজাতির মধ্যেও এটা দেখা যায়। যেমন, অ্যাটেমেলিস নামে

একরকমের ঝিঁঝিপোকা পিঁপড়ের বাসায় মাথা গোঁজার জন্য পিঁপড়ের পছন্দসই ফেরোমোন দিয়ে তাদের অনুমতি আদায় করে নেয়। মৌমাছিদের মধ্যে যোগাযোগের ভাষায় ফেরোমোনের গন্ধ ছাড়াও রয়েছে ওদের বিশেষ ভঙ্গির নাচ, এমনকী শব্দও। রানি মৌমাছি শ্রমিকদের ওপর ফেরোমোন প্রয়োগ করে তাদের দিয়ে শুককীটগুলিকে এমনভাবে লালনপালন করায় যাতে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও দ্বিতীয় রানির সৃষ্টি না হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মৌমাছিরা যে ধ্বনির ভাষায় কথা বলে, তা আসলে পর্যায়ক্রমিক ক্ষুদ্র এবং দীর্ঘ স্পন্দন। টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার মতো এর মধ্যেই হয়তো লুকনো থাকে শব্দ এবং বাক্য, যদিও আজ পর্যন্ত কেউই সে ভাষার মর্ম উদ্ধার করতে পারেনি। আর মৌমাছির নাচ? এ এক আশ্চর্য ব্যাপার, যা নিয়ে বিজ্ঞানীদের অসীম কৌতূহল। ওরা নেচে-নেচে বিশেষ বিন্যাসের মাধ্যমে সঙ্গীদের বুঝিয়ে দেয়, কোথায় কত দূরে আছে মধুর উৎস। এ থেকেই বিজ্ঞানী জে. বি. এস হলডেন যান্ত্রিক মৌমাছি তৈরির কথা বলেছিলেন। যারা আসল মৌমাছিদের নাচ নকল করে তাদের·ডেকে নিয়ে যাবে নির্দিষ্ট গাছে পরাগ সংযোগের উদ্দেশ্যে।

ন তু ন • ভে

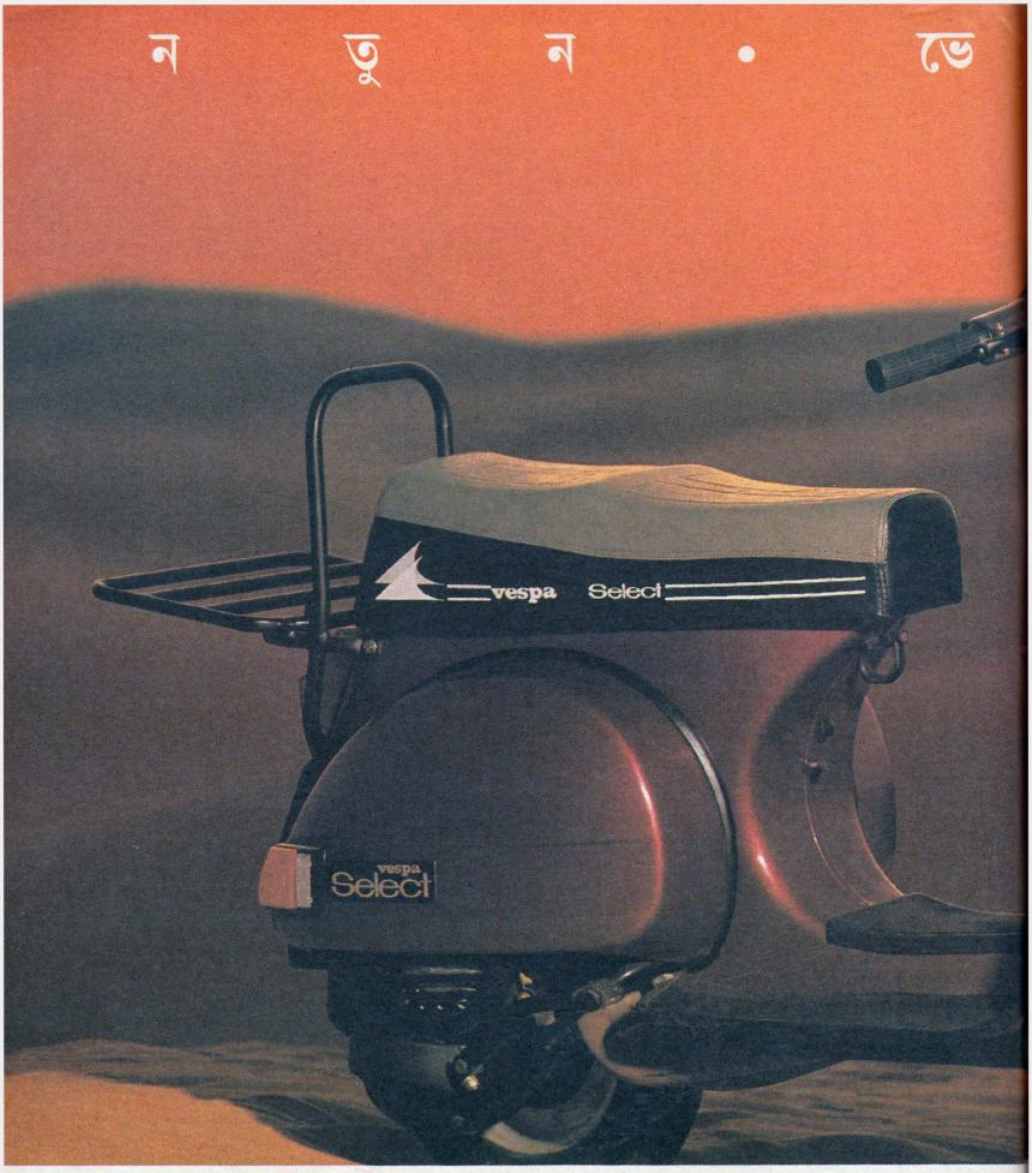

আন্তর্জাতিক স্টাইল এবং কর্মকুশলতার এমন তুলনাহীন সমন্বয় যে

নতুন ভেস্পা সিলেক্ট।
দু'চাকার ওপর রচিত এক অনবদ্য সৌন্দর্য আপনাকে আকৃষ্ট করবেই। ভারী সুন্দর মেটালিক রঙ। আধুনিক ও চমৎকার গড়ন। আপনার মন জিতে নেবে এক মুহূর্তে। চড়লেই আপনি পাবেন এমন এক অনুভূতি যা স্রেফ্ এক বিশ্বশ্রেষ্ঠ স্কুটারই দিতে পারে। প্রতি লীটারে ৬৫ কিঃ মিঃ মাইলেজ স্ট্যাণ্ডার্ড টেস্ট অবস্থায় [প্রতি লীটারে ৫০ কিঃ মিঃ শহরে চলাকালে]। ৭ বি এইচ পী শক্তি আর স্রেফ ১১ সেকেণ্ডে ৬০ কিঃ মিঃ প্রতি ঘন্টা গতি। এসবের সঙ্গে আছে, ভেস্পার সর্বজনবিদিত গুণমান, জগতজোড়া সুনাম, নজীরহীন

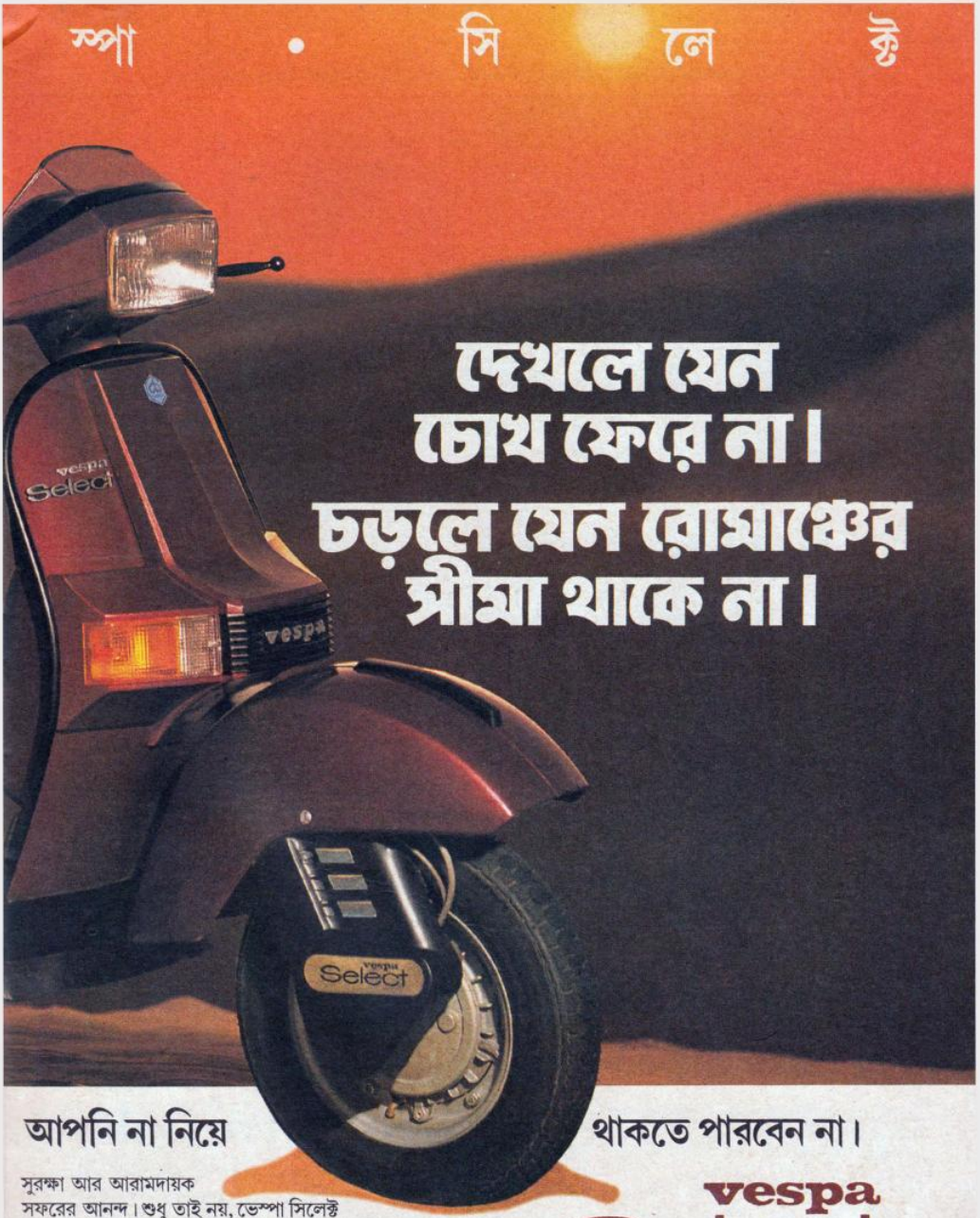

স্পা • সি লে ক্ট
দেখলে যেন
চোখ ফেরে না।
চড়লে যেন রোমাঞ্চের
সীমা থাকে না।
vespa Select
vespa
আপনি না নিয়ে
থাকতে পারবেন না।
সুরক্ষা আর আরামদায়ক
সফরের আনন্দ। শুধু তাই নয়, ভেস্পা সিলেক্ট
অটো স্টার্ট সুবিধাসহ পাওয়া যায়। এছাড়া আছে ১ বছরের
অনন্য ওয়ার্‍্যান্টি। অর্থাৎ সবদিক থেকেই ভেস্পা সিলেক্ট
এক অসাধারণ স্কুটার। আপনি না নিয়ে থাকতে পারবেন না।
কিছু নির্বাচিত শহরের এল.এম.এল. ভেস্পা
ডীলারের কাছে পাওয়া যায়।
vespa
Select
এখন গৌরবের সফর, আরো শ্রেষ্ঠতর।

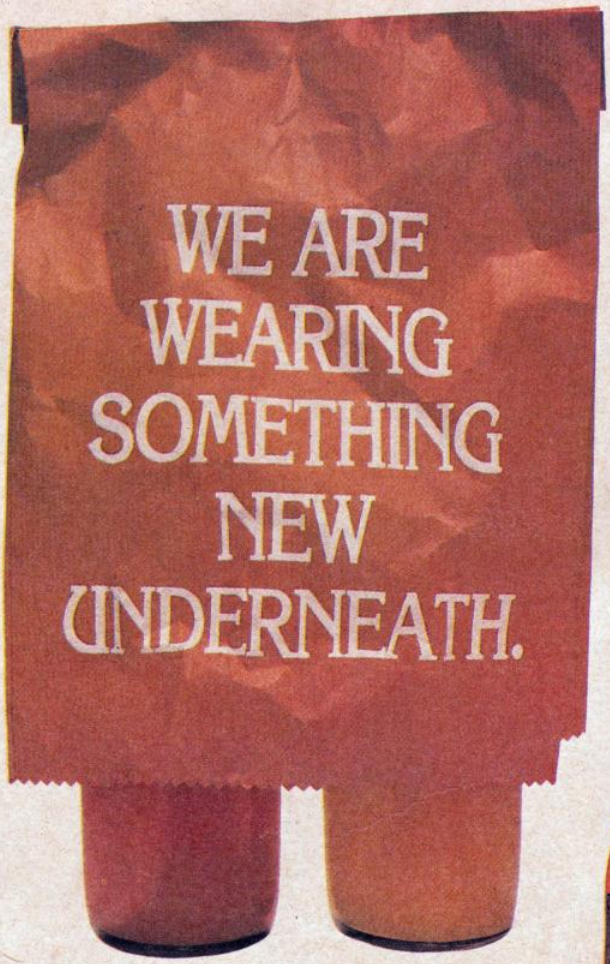

Now, we have a new name. Volfarm. But nothing else has changed. Specially not its precious taste. After all, it takes the finest fresh–packed fruits to make this a great squash. Nothing less.

Available, Orange and Lemon Squash

Vólfarm Gold

NATURE SQUASHED IN A BOTTLE.

SPEER 141 93

গোয়েন্দা গল্প

লাখ টাকার পাথর

সমরেশ মজুমদার

এই শহরের বিখ্যাত শিল্পপতি অমলেন্দু রায় পরলোকগমন করেছেন। খবরটা শুনে শহরের মানুষ খুবই দুঃখিত হয়েছিল। অমলেন্দুবাবুকে সবাই খুব ভালবাসত। নিজের বিশাল ব্যবসায় তরুণদের চাকরি দেওয়া ছাড়াও জেলার বিভিন্ন ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশেষ করে ফুটবল তাঁর প্রিয় খেলা ছিল। শহরের সবচেয়ে নামী ক্লাবের তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন।

খবরটা অর্জুন পেয়েছিল কদমতলায় চায়ের দোকানে বসে। তখন রাত আটটা। অমলেন্দু রায়ের সঙ্গে তার সরাসরি আলাপ ছিল না। কিন্তু কেউ মারা গেছেন শুনলে মন ভাল থাকে না। বাড়ি ফেরার পর মা বললেন, তিনটে টেলিফোন এসেছিল। তারা আবার করবে। আধঘন্টার মধ্যেই সেই টেলিফোন আবার এল। দু'জন মানুষ পৃথক-পৃথকভাবে টেলিফোন করছেন।

প্রথমজন অমলেন্দু রায়ের বড় ছেলে বিমলেন্দু। তিনি একটু ভূমিকা করে বললেন, আজই অর্জুনের সঙ্গে দেখা করতে চান। অর্জুন তাঁকে আসতে বলল। কারও বাবা সন্ধেবেলায় মারা গেলে যে পরিস্থিতি হয়, তাতে টেলিফোন করে একজন অপরিচিতের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়া মানায় না। বেশ অবাক হয়েছিল অর্জুন। খুব সিরিয়াস কিছু ওই পরিবারে ঘটেছে বলে সে অনুমান করেছিল। দ্বিতীয় ফোনটি করেছিল অমলেন্দুবাবুর মেজোছেলে কমলেন্দু। সে কোনও ভূমিকা করেনি। বলল, "আপনি আমার কিছু বন্ধুবান্ধবকে চেনেন। আমার বাবা আজ মারা গিয়েছেন। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে আমি ভাবছি না। বাবার কোমরে একটা রুপোর চেনে দামি পাথর ছিল। শুনতাম পাথরটার দাম এক লাখ টাকা। হাসপাতাল থেকে যখন বাবাকে নিয়ে আসা হয়, তখনও সেটা আমি দেখেছি। বাড়ি ফিরে এসে বাবার পোশাক পরিবর্তন করিয়ে দেওয়ার পর দেখি রুপোর চেনটা রয়ে গেছে, পাথরটা নেই। আপনি যদি রহস্য উদ্ধার করে দেন তা হলে পাঁচ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেব।"

"ভেবে দেখছি", বলে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল অর্জুন।

বিমলেন্দুবাবু এসেছিলেন দশটার মধ্যে। নিজেই গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। শোকের ছাপ ওঁর চোখে-মুখে। বাইরের ঘরে বসে মোটামুটি একই কাহিনী শোনালেন।

অর্জুন তাঁকে বলল, "আপনারা মৃতদেহের পোশাক পরিবর্তনের পর পাথরটা পাচ্ছেন না। পোশাক পরিবর্তনের সময় কে ওঁর সঙ্গে ছিলেন?"

"মা এবং আমার ছোট ভাই তপেন্দু। ঘরের দরজা বন্ধ করে ওরা চেঞ্জ করিয়ে দিয়েছিল।"

"স্বাভাবিক। তাঁরা কী বলেন?"

"মায়ের সঙ্গে তো কথা বলাই যাচ্ছে না। তিনি প্রায়ই জ্ঞান হারাচ্ছেন।" তপেন্দু বলল, 'বাবার মৃত শরীরে হাত পড়ায় সে এমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে, পাথরটার কথা খেয়ালই করেনি। "অর্জুনবাবু, পাথরটা শুধু দামি নয়, এ আমাদের পরিবারে আছে কয়েক পুরুষ ধরে।"

"আপনি কি এখনও আছে বলে ভাবছেন?"

"আমার বিশ্বাস বাড়িতেই আছে।"

"আপনার কথা অনুযায়ী মা এবং তপেন্দুবাবুকে সন্দেহ করতে হয়।"

"আমি কী বলব? মা এমন কাজ করলে আমাকে বলতেন। তপেন্দু... না না, বিশ্বাস হয় না। ওর এসব অভ্যেস ছিল না। তা ছাড়া ও পরেছিল পাজামা আর গেঞ্জি। ওই অবস্থায় কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। রাখতে গেলে মা দেখতে পেতেন।"

"পুলিশকে জানিয়েছেন ?"

"না। আমরা থানা-পুলিশ করতে চাই না। লোকে বলবে, বাবা মারা যাওয়ামাত্র গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আমাদের পারিবারিক সম্মান কিছু থাকবে না।"

"আপনার মেজোভাইকে সন্দেহ হয় ?"

"ঠিক সন্দেহ বলতে যা বোঝায়, তা হয় না। তবে ওর টাকা-পয়সার খুব টান। বাবা খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন ওর বাজে খরচের বহর দেখে। হাসপাতাল থেকে আসার সময় ও-ই দেখেছিল পাথরটা বাবার কোমরের চেনের সঙ্গে ঠিক আছে।"

"হাসপাতালে ভর্তি করার সময় শরীরের গয়না খুলে রাখার কথা। আপনারা অত দামি জিনিসসুদ্ধ ভর্তি করেছিলেন, ওখান থেকেও তো চুরি হয়ে যেতে পারত !"

"দুপুরে বাবার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর ওসব ভাবার সময় ছিল না। হাসপাতাল থেকেও কিছু বলেনি। মেজোভাই না বললে এখনও আমার মনে পড়ত না।"

"আপনার মেজোভাই ছাড়া কেউ হাসপাতাল থেকে আসার সময় পাথরটাকে দেখেনি, তাই তো ? একটু ভেবে বলুন !"

"হ্যাঁ, একমাত্র ওই দেখেছিল।"

"তা হলে তো এমনও হতে পারে ওটা হাসপাতাল থেকেই খোয়া গিয়েছে। আপনার মেজোভাই মিথ্যে বলছেন, যাতে লোকে ভাবে বাড়ি আসার পর কেউ সরিয়েছে।"

"অ্যাঁ, তা কি সম্ভব ?"

"কিছুই অসম্ভব নয়, আবার ঠিক এইটেই ঘটেছে এমন কথাও আমি বলছি না। আমি সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরছি। আচ্ছা, পোশাক পালটে দেওয়ার পর ওই ঘরের ভেতর থেকে কে বেরিয়ে এসেছিল প্রথমে ? আপনারা কোথায় ছিলেন ?"

"বাড়িসুদ্ধ সবাই কাঁদছিল। কারও মাথা কাজ করছিল না। তপেন্দু ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল। আমি ওকে কোনওমতে ছাড়িয়ে ঘরে গিয়ে দেখলাম মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক ডাকাডাকির পর ওঁর জ্ঞান এল।"

"তখন ঘরে কে কে ছিলেন ?"

"তখন ? তপেন্দু বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই ঘরে মা ছিলেন এবং আমি ঢুকেছিলাম।"

"আপনার পর ?"

"আমি চেঁচিয়ে মাকে ডাকাডাকি করার সময় সবাই এসে পড়ল।"

"ততক্ষণ আপনি একা আর আপনার মা অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেটা আধ মিনিটও নয়।"

"ওই সময়েই ইচ্ছে করলে আপনি পাথরটা সরাতে পারেন।"

বিমলেন্দুবাবু চমকে উঠলেন, "এ আপনি কী বলছেন ? আমি চোর ? আমি চুরি করলে আপনার কাছে আসব কেন ? ছি ছি ছি।"

"বিমলেন্দুবাবু, আমি আপনাকে একটা সম্ভাবনার কথা বলছি। আপনি চুরি করতেও পারেন আবার নাও পারেন। দেখা যাচ্ছে আপনাদের তিন ভাইয়ের কেউ সন্দেহের বাইরে থাকার মতো কাজ করেননি। কিন্তু এ-ব্যাপারে এখনই তদন্ত করতে গেলে জানাজানি হয়ে যাবে যে !"

"না। শ্রাদ্ধের আগে ব্যাপারটাকে গোপন রাখতেই হবে।"

"তা হলে ?"

"আপনি আজ একবার আমাদের বাড়িতে আসুন না ?"

"গিয়ে কী করব ? কাউকে জেরা করতে না পারলে," কথাটা বলেই মত পালটাল অর্জুন, "ঠিক আছে, আপনি যান, আমি আসছি।"

বিমলেন্দুবাবু ওর হাত জড়িয়ে ধরলেন, মুখে কিছু বললেন না।

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পর ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিল অর্জুন। এরকম পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়েনি। কাউকে জেরা করা চলবে না, কেউ জানতে পারবে না অথচ তদন্ত করে বের করতে হবে সেই মূল্যবান পাথরটা কোথায় গেল ! এ কি সম্ভব ? অমলেন্দুবাবুর তিন ছেলে এবং তিনজনের যে-কেউ ওটাকে সরাতে পারে এবং সেই সুযোগও তারা পেয়েছিল।

মোটরবাইক নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে এল অর্জুন। খোঁজখবর নিয়ে সেই নার্সের সামনে উপস্থিত হল, যিনি অমলেন্দুবাবুর সেবায় ছিলেন। অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি মাথা নাড়লেন, "হ্যাঁ, দেখেছি। রুপোর চেনে পাথরটা ছিল। ওঁর মেজো ছেলে বারবার ওটার খবর নিচ্ছিলেন।"

"কখন ? মারা যাওয়ার আগে না পরে ?"

"ভর্তি হওয়ার পর বলেছিলেন একবার। মারা যাওয়ার পর কয়েক বার ! আমি বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম অতই যখন চিন্তা খুলে নিজের কাছে রাখুন না। তাতে উনি জবাব দিয়েছিলেন, না, মা দুঃখ পাবে।"

"হাসপাতাল থেকে বডি নিয়ে যাওয়ার সময় ওটা ঠিক ছিল ?"

"হ্যাঁ। এ-ব্যাপারে আমি নিঃসন্দেহ।

কেন বলুন তো এসব জিজ্ঞেস করছেন ?"

"পরে বলব।" অর্জুন আর দাঁড়ায়নি। নার্সের বক্তব্য যদি সঠিক হয়। তা হলে মেজোভাই কমলেন্দু পাথরটা সরায়নি।

রায় বাড়িতে চলে এল অর্জুন। শোকের বাড়ি। এখনও লোকজন আসছে। খুঁজে-খুঁজে তপেন্দুকে বের করল সে। ছাদের ঘরে একা বসে সিগারেট খাচ্ছে। পরনে এখনও পাজামা আর গেঞ্জি। অর্জুনকে সে চেনার চেষ্টা করল। বয়স কুড়ি-একুশের মধ্যে।

অর্জুন বলল, "আপনার বাবা আমার শ্রদ্ধেয় মানুষ। খবরটা পেয়ে এসেছিলাম। এখানে সবাই আমার গুরুজন। সিগারেট খেতে পারছি না ওঁদের সামনে। তাই চলে এলাম ওপরে। দেশলাই আছে ?"

তপেন্দু বিরক্ত হয়ে কোমরে হাত দিয়ে পাজামার দড়ির ভেতরে ওলটানো কাপড়ের মধ্যে থেকে দেশলাই বের করে এগিয়ে ধরল। সিগারেট ধরাল অর্জুন।

"এই দেশলাইটা কতক্ষণ কোমরে রেখেছেন ?"

"দুপুর থেকে। কেন ?"

"ওভাবে তো কেউ রাখে না।"

"আমার আজ পেট খারাপ। ক'বার বাথরুমে গিয়েছি। হাসপাতালেও যেতে পারিনি তাই। পাঞ্জাবি পরিনি, রাখব কোথায় ?"

"পেট খারাপ অবস্থায় বাবার পোশাক পরিবর্তন করলেন ?"

"মা আমাকে ডেকেছিলেন বলেই করতে হল। আপনি কেন এসব প্রশ্ন করছেন ?"

"এমনি।" অর্জুন হেসে নেমে এল। পাজামা পরে কোমরে দেশলাই গুঁজে রাখলে কেউ অন্য কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না। তপেন্দুর পকেটের বালাই নেই। হাতে করে নিশ্চয়ই পাথর নিয়ে বের হয়নি। মা অজ্ঞান হয়ে গেছেন দেখে যদিও সেই সুযোগ ছিল। এক যদি সে ডেডবডির নীচে ওটা লুকিয়ে রাখে তা হলে আলাদা কথা, না হলে ছোট ভাই তপেন্দু পাথর সরায়নি।

রাত এখন বারোটা। মৃতদেহ এখনই শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে কি না এ-ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। বিমলেন্দু অর্জুনকে দেখে এগিয়ে এলেন, "বাবাকে দেখবেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আসুন।"

ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। কোণের দিকে খাটে অমলেন্দুবাবু শুয়ে আছেন। দরজা থেকে সেটা বেশ দূরে। তাঁর মাথার কাছে একজন মহিলা বসে আছেন। পায়ের কাছে কয়েকজন। ঘরে ঢুকেই অর্জুন চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "ভেতরে ঢোকার কত পরে আপনি মাকে ডেকেছিলেন ?"

"বড় জোর আধ মিনিট। তাও হবে না হয়তো।"

"উনি অজ্ঞান হয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ। মাথার পাশে মা বসে আছেন।"

"ঠিক আছে। আপনি পায়ের কাছে যাঁরা বসে আছেন তাঁদের একটু বাইরে নিয়ে যান।"

আধ মিনিটের মধ্যে এই ঘরে ঢুকে খাটের কাছে পৌঁছে কোমর থেকে চেন বের করে পাথর খুলে নেওয়া কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বলেই বড় ছেলে বিমলেন্দু সেটা সরাতে পারেন না। অবশ্য সময়টা যদি আধ মিনিটের অনেক বেশি হয় তা হলে আলাদা কথা।

ঘরে এখন কেউ নেই, শুধু তারা দু'জন ছাড়া। অর্জুন বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বিনীত গলায় বলল, "মাসিমা, মেসোমশাই আমাকে ভালবাসতেন।"

বৃদ্ধা বললেন, "তুমি কে বাবা ?"

"আমি অর্জুন। সত্য অন্বেষণ করি। পাথরটা ঠিক জায়গায় রেখেছেন তো ?"

সঙ্গে-সঙ্গে কেঁদে উঠলেন বৃদ্ধা। চাপা গলায় কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, "ভস্ম হয়ে যাক, সব ভস্ম হয়ে যাক।"

অর্জুন অমলেন্দুবাবুর দিকে তাকাল। মনে হল গলার একটা দিক যেন সামান্য উঁচু, টিউমারের মতো।

অত রাত্রে শ্মশানে একা আসতে এখনও অস্বস্তি হয়। যে মানুষেরা মৃতদেহ সৎকারের দায়িত্ব নেয়, তাদের একজনের নাম মহাদেব। এর সঙ্গে আলাপ ছিল অর্জুনের। মহাদেব তখন চুপচাপ বসেছিল। শ্মশানে ইতিমধ্যেই দুটো চিতা জ্বলছে। মহাদেবকে আলাদা ডেকে নিচু গলায় কিছু বলল অর্জুন। তারপর পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বের করে দিল।

অমলেন্দু রায়ের মৃতদেহ এসে গেল শ্মশানে। মফস্বল শহরের শ্মশানে আধুনিক ব্যবস্থা নেই। দেহ চিতায় তুলতে সময় লাগল। আগুন জ্বলে গেলে দেখা গেল মহাদেবরা দাহের কাজে তদারকি করছে। অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। সব ছাই হয়ে যাবে। কাঠ, শরীর। শুধু অস্থিটুকু থেকে যাবে। আর... সন্দেহটা এখনও মনে আঁচড় কাটছে।

ক্রমশ চিতা ছাই হয়ে মাটিতে মিলিয়ে গেল। মহাদেব আগুন নিভিয়ে মাটির সরায় চিমটি দিয়ে অস্থি তুলতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাত তুলে অর্জুনকে ডাকল। চিতার অনেক দূরে নদীর ধারে বসেছিল শ্মশানযাত্রীরা। ভোর হতে দেরি নেই।

অর্জুন এগিয়ে যেতেই মহাদেব নির্লিপ্তভাবে একটা পাথরের ছোট টুকরো তুলে ধরল, "এইটে বডিতে ছিল, পোড়েনি।"

"দাও।" রুমাল বের করে জিনিসটা নিয়ে নিল অর্জুন। মহাদেব গেল ছেলেদের হাতে অস্থি তুলে দিতে। অর্জুন উঠল মোটর বাইকে।

শূন্য বাড়ি। অমলেন্দুবাবুর ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। মেঝেতে চুপচাপ বসেছিলেন ওঁর স্ত্রী। পায়ের শব্দে মুখ তুললেন। অর্জুন বলল, "আবার বিরক্ত করছি।"

"কে তুমি ?"

"আমি অর্জুন। রাত্রে কথা বলেছিলাম।"

"কী চাও ?"

"আমি কিছু চাই না। আপনি বলেছিলেন সব ভস্ম হয়ে যাক। কিন্তু কিছু জিনিস আছে যা কিছুতেই ভস্ম হয়ে যায় না। আগুন পোড়াতে পারে না। একটা খালি প্রদীপের খোল নিয়ে রুমাল থেকে পাথরটা বের করে রাখল তাতে অর্জুন। তারপর খোলটা বসিয়ে দিল প্রদীপের পাশে।

"এটা আপনাদের পারিবারিক সম্পত্তি। মনে হয় আপনি ছোট ছেলে বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনার স্বামীর কোমর থেকে খুলে ওঁর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। জিভের নীচে ওটার যাওয়ার কথা নয়। কী করে গলার ভেতরে গেল সেটা আপনি জানেন। বড় ছেলে ঘরে ঢোকার আগেই কাজটা করেছিলেন আপনি। আপনার একটাই স্বার্থ ছিল, জিনিসটা ছেলেদের হাতে পড়ুক আপনি চাননি। কিন্তু এটা ভস্ম হয়নি। এখন কী করবেন তা নতুন করে ভাবুন।ওরা দাহ শেষ করেছে, এখনই ফিরে আসবে। এলাম।"

সারারাত জাগার ক্লান্তি নিয়ে ভোরের রাস্তায় বাইক ছুটিয়ে যাচ্ছিল অর্জুন। এখন একটু ঘুমনো দরকার।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

গোয়েন্দা গল্প

ঘড়ি-রহস্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

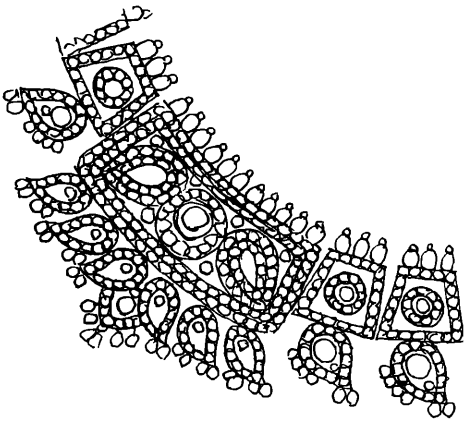

কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের প্রিয় পরিচারক ষষ্ঠীচরণের দু'দিন থেকে সামান্য সর্দিজ্বর। পাড়ার ডাক্তার তারকবাবু তাকে দেখতে এসেছিলেন। প্রচুর আশ্বাস দিয়ে এবং লম্বা-চওড়া প্রেসক্রিপশন লিখে তিনি আড্ডার মেজাজে বসলেন। দেশের হালচাল নিয়ে কিছুক্ষণ বকবক করে গেলেন। তারপর হঠাৎ মুচকি হেসে বললেন, "আচ্ছা কর্নেলসায়েব, আপনি তো বিখ্যাত রহস্যভেদী। এ যাবৎ বিস্তর জটিল রহস্য ফাঁস করেছেন শুনেছি। কিন্তু কখনও কি এমন কোনও কেস আপনার হাতে এসেছে, যার রহস্য ফাঁস করতে পারেননি ?"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা দেখছিলেন। বললেন, "প্রশ্নটা আপনাকেও করা যায়।"

ডাক্তারবাবু একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, "কেন ? কেন ?"

"ডাক্তার হিসেবে আপনার সুনাম আছে। আপনি কি সব রোগীর সঠিক রোগ ধরতে পেরেছেন ?"

ডাক্তারবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "কোনও ডাক্তারই এমন দাবি করতে পারেন না।"

কর্নেল প্রেসক্রিপশনটা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলেন। তারপর ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সাদা দাড়ি থেকে চুরুটের ছাই ঝেড়ে বললেন, "আমার ক্ষেত্রেও তা-ই। কিছু-কিছু রহস্য ফাঁস করতে শেষাবধি আমি ব্যর্থ হয়েছি।"

তারকবাবু আগ্রহ দেখিয়ে বললেন, "অন্তত তেমন একটা কেসের কথা বলুন। আমার জানতে ইচ্ছে করছে।"

কর্নেল চোখ বুজে চকচকে টাকে হাত বুলোতে শুরু করলেন। এবার আমারও খুব আগ্রহ হল। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ আমি ওঁর প্রায় ছায়াসঙ্গী। অসংখ্য জটিল রহস্য ওঁকে নিপুণ দক্ষতায় ফাঁস করতে দেখেছি। আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন, কোনও ক্ষেত্রে উনি ব্যর্থ হয়েছেন। তাই না বলে পারলাম না, "আশ্চর্য! কখনও তো আপনাকে ব্যর্থ হতে দেখিনি! তা ছাড়া তেমন কোনও কেসের কথা আপনি আমাকে বলেনওনি।"

"জয়ন্ত! তুমি সৈদাবাদ রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস হারানোর ঘটনা ভুলে গেছ।"

মনে পড়ে গেল। বললাম, "কিন্তু নেকলেস হারানোটা যত রহস্যময় হোক, কে ওটা চুরি করেছে, আপনি তো জানতে পেরেছিলেন। এখন চোর যদি নিপাত্তা হয়ে যায়, আপনার কী করার আছে ? খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার কাজটা পুলিশের।"

ডাক্তারবাবু অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "একটু ডিটেলস বলুন কর্নেলসায়েব! রাজবাড়ির জড়োয়া নেকলেস যখন, তখন নিশ্চয় প্রচুর দামি। কীভাবে ওটা চুরি গিয়েছিল ?"

কর্নেল বললেন, "সেটাই একটা জটিল রহস্য। সেই রহস্য আমি ফাঁস করতে পারিনি। নেকলেসটা নাকি রাজপরিবারের সৌভাগ্যলক্ষ্মীর প্রতীক। পরিবারে নতুন বউমা এলে বউভাতে জমকালো পার্টি দেওয়া হত। পার্টিতে নতুন বউমা নেকলেস পরে সিংহাসনে বসে থাকতেন। পার্টি শেষ হলে ওটা খুলে নিয়ে গিয়ে পাতালঘরে লক্ষ্মী প্রতিমার গলায় পরানো হত। এটাই ছিল বংশানুক্রমে রীতি। সে রাত্রে পার্টি শেষ হতে তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। হঠাৎ দেখা গেল বউমার গলায় নেকলেস নেই।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "জয়ন্তবাবু বলছেন আপনি নেকলেস চোরকে চিনতে পেরেছিলেন!"

"হ্যাঁ। কিছু সূত্র থেকে অনুমান করেছিলাম রাজবাড়ির জয়গোবিন্দ নামে এক কর্মচারী যেভাবেই হোক, নেকলেস চুরি করেছে। সে একা থাকত রাজবাড়ির একটা ঘরে। কিন্তু তার ঘরে শেষরাত্রে হানা দিয়ে দেখা গেল তল্পিতল্পা গুটিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে। তবে রহস্যটা থেকে গেল। জয়গোবিন্দ কখন কীভাবে নেকলেস চুরি করল ? হলঘরের পার্টিতে প্রচুর লোক ছিল। চোখধাঁধানো আলো ছিল। সব চেয়ে আশ্চর্য, নতুন বউমাও টের পাননি কখন তাঁর গলা থেকে নেকলেস উধাও হয়েছে।"

ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়ালেন। "উঠি কর্নেলসায়েব! এতক্ষণ রোগীরা আমার মুন্ডুপাত করছে।"

তারকডাক্তার চলে যাওয়ার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন, "তারকবাবু ডাক্তার হিসেবে জনপ্রিয়। কিন্তু মশা মারতে কামান দেগেছেন। একে তো ষষ্ঠী ওষুধ খেতেই ভয় পায়, তাতে এত সব ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, সিরাপ! তুমি একটু বোসো জয়ন্ত! দেখি, কাউকে দিয়ে ওষুধগুলো আনানো যায় নাকি।"

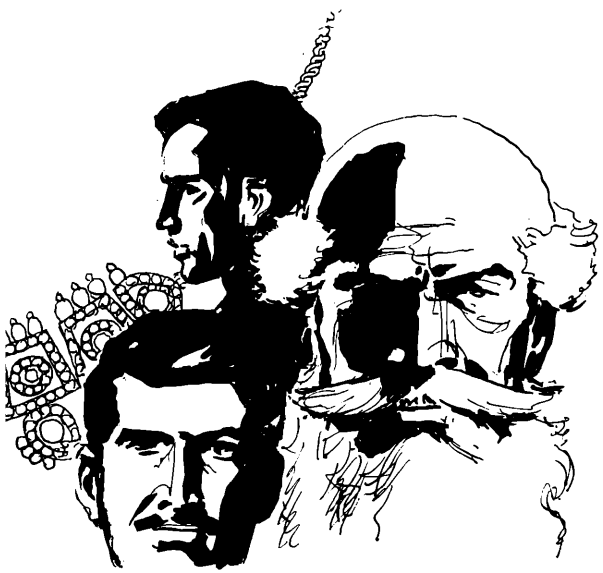

বললাম, "আমি এনে দিচ্ছি।"

এই সময় ডোরবেল বাজল এবং ড্রয়িং রুমের দরজায় পরদার ফাঁকে অবাক হয়ে দেখলাম, ষষ্ঠীচরণ গিয়ে দিব্যি দরজা খুলে দিল। তারপর প্রায় তাকে ঠেলে সরিয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক সটান এ-ঘরে এসে ঢুকলেন। নমস্কার করে কাচুমাচু মুখে তিনি বললেন, "কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য দুঃখিত। দাদা বলে গেছেন, টাইম ইজ মানি। তো কাগজে আপনার কীর্তিকলাপ পড়েছি। ছবি দেখেছি। অনেক চেষ্টায় ঠিকানা জোগাড় করে ছুটে এসেছি। টাইম ইজ মানি। কিন্তু—"

ওঁর কথার ওপর কর্নেল বললেন, "আপনি বসুন। বলুন কী ব্যাপার।"

ভদ্রলোক সোফায় বসে রুমালে মুখ মুছে বললেন, "সব কথা গুছিয়ে বলতে সময় লাগবে। কিন্তু ওই যে বললাম! দাদা বলে গেছেন টাইম ইজ মানি! ইংরিজি প্রবাদ হলেও কথাটা সত্যি।"

ভদ্রলোক পাগল নন তো? একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, "বারবার টাইম ইজ মানি বলছেন। অথচ নিজেই টাইম নষ্ট করছেন।"

ভদ্রলোক চটে গিয়ে বললেন, "আমার কথা হচ্ছে কর্নেলসায়েবের সঙ্গে।"

কর্নেল হেসে ফেললেন। "ঠিক। তবে উনি একজন সাংবাদিক। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরী। আপনি নিশ্চয় জানেন, রিপোর্টাররা সবকিছুতে খবর খোঁজেন?"

ভদ্রলোক ঝটপট আমাকে নমস্কার করে বললেন, "আপনিই সেই বিখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী? কী সৌভাগ্য! আপনি আমার এই খবরটা দয়া করে লিখুন! বজ্জাতদের মুখোশ খুলে দিন। হ্যাঁ, এবার খবরটা সংক্ষেপে বলি। কারণ টাইম ইজ মানি।" বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরে বসলেন। "আগে আমার নাম-ঠিকানা বলি। আমার নাম প্রাণনাথ রায়। সাতাশ বাই তিন, নকুড় মিস্ত্রি লেনে একটা মেসবাড়িতে একখানা আলাদা ছোট্ট ঘরে থাকি। চাকরি করি মতিলাল ট্রেডিং কোম্পানিতে। তো কিছুদিন থেকে একটা ভুতুড়ে ঘটনা লক্ষ করছি। ধরুন, টেবিলে যে পাঁজিখানা যেখানে রেখে বেরিয়েছিলাম, বাসায় ফিরে দেখি, সেখানা ঠিক সেইখানে নেই। কিংবা ধরুন, যে শার্টটা হ্যাঙ্গারে যেভাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, ফিরে এসে দেখি, সেটা সেইভাবে ঝোলানো নেই। একটা কাঠের ছোট্ট আলমারি আছে। তার তালা তেমনই আটকানো। অথচ ভেতরকার জিনিসপত্র এদিক-ওদিক হয়ে আছে। রোজ বিকেলে ছড়ি হাতে পার্কে বেড়াতে যাওয়ার অভ্যাস। কাল ছড়িটা দেখি, ব্র্যাকেটের যেখানে ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেখানে নেই। এইরকম অসংখ্য ব্যাপার প্রতিদিন ঘটছে। আমি এর মাথামুন্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। চোর ঢুকলে তো সে কিছু চুরি করত। কিন্তু এ-পর্যন্ত কিছুই চুরি যায়নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কেউ বজ্জাতি করে আমাকে তাড়াতে চাইছে। কিন্তু গত রাত্রে হঠাৎ একটি শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই টেবিলবাতি জ্বেলে দেখি কাঠের আলমারিটা নড়ছিল। সদ্য থেমে গেল। আতঙ্কে সারা রাত্রি আর ঘুম হয়নি। তো টাইম ইজ মানি। আর দেরি করা চলে না। আপনার শরণাপন্ন না হয়ে উপায় ছিল না।"

কর্নেল চুপচাপ শুনছিলেন। এতক্ষণে বললেন, "আপনার ঘরে কোনও দামি জিনিস আছে?"

"নাহ। যৎসামান্য টাকাকড়ি ব্যাঙ্কে রাখি। এই রিস্টওয়াচটা যদি দামি বলেন, এটা প্রায় সারাক্ষণ আমার হাতেই বাঁধা থাকে। শুধু স্নানের সময় টেবিলে খুলে রেখে যাই। কিন্তু এটা চুরি হয়নি।"

"আপনার দাদার নাম কী?"

"আমার দাদার নাম ছিল হরনাথ রায়।"

"তিনি বেঁচে নেই?"

"আজ্ঞে না। এখন আমি মেসবাড়ির যে-ঘরে থাকি, দাদা সেখানেই থাকতেন। বাউন্ডুলে ছন্নছাড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিয়ে করেননি। আমার সঙ্গে বহু বছর দাদার কোনও যোগাযোগ ছিল না। হঠাৎ দু'মাস আগে টেলিগ্রাম পেলাম, হার্ট অ্যাটাক হয়ে দাদা হাসপাতালে আছেন। সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এলাম কলকাতা।"

"আপনি কোথায় ছিলেন তখন?"

"সাহেবগঞ্জে। আমার কোম্পানির একটা ব্রাঞ্চ আছে সেখানে। আমাদের পৈতৃক বাড়িও সেখানে। আমার ফ্যামিলি এখনও সাহেবগঞ্জে আছে।"

"তারপর কী হল বলুন।"

"হাসপাতালে দাদা তখন মরণাপন্ন। আমাকে চিনতে পেরে শুধু বললেন, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস!' ব্যস! ওই শেষ কথা।"

"কথাটা একটা ইংরেজি প্রবচন। যাই হোক, তারপর?"

"দাদার শেষকৃত্য করে কোম্পানির হেড অফিসে গেলাম। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে

ছিল কলকাতায় বদলি হওয়ার। হেড অফিসে থাকলে অনেক সুযোগসুবিধে, বুঝলেন তো ?"

"বুঝলাম। কোম্পানি তা হলে আপনাকে কলকাতায় বদলি করল ?"

"আজ্ঞে। দাদার সঙ্গে মেসের ম্যানেজার প্রভাতবাবুর বন্ধুতা ছিল। তাই দাদার ঘরটা আমাকে একই ভাড়ায় ছেড়ে দিলেন।"

"ওই ঘরে তো আপনার দাদার জিনিসপত্র ছিল ?"

"ছিল। একটা তক্তাপোশ, বিছানাপত্তর, চেয়ারটেবিল, একটা সুটকেস, একটা ছোট্ট কাঠের আলমারি— এইসব।"

"আর কিছু ?

প্রাণনাথবাবু একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "আর তেমন কিছু— ও হ্যাঁ ! একটা প্রকাণ্ড দেওয়ালঘড়ি। ঘড়িটা অচল। দাদা কেন ওটা কিনেছিলেন, কেনই বা আর সারাননি, কে জানে ! আমি ওটা বেচে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু দাদার স্মৃতি।"

কর্নেল হাসলেন। "হ্যাঁ। টাইম ইজ মানি।"

প্রাণনাথবাবু সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, "কথাটা দাদা বলেছিলেন। সেই থেকে কেন কে জানে কথাটা আমাকে ভূতের মতো পেয়ে বসেছে।"

"আমাকেও।" বলে কর্নেল চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ফের বললেন, "আপনার ঘরের ভুতুড়ে ঘটনার কথা কি ম্যানেজার প্রভাতবাবু কিংবা আর কাউকে বলেছেন ?"

"প্রভাতবাবুকে বলেছিলাম।"

"উনি কী বলেছিলেন ?"

"উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'আপনার দাদাও ঠিক একই কথা বলতেন।'"

প্রাণনাথবাবু এবার চাপা গলায় বললেন, "ওই মেসবাড়িতে যাওয়ার পর দিন মেসের একজন বোর্ডার ননীবাবু আমাকে বলেছিলেন, ওই ঘরে নাকি ভূত আছে। বহুবছর আগে কে নাকি আত্মহত্যা করেছিল।"

"ঠিক আছে। টাইম ইজ মানি। আমরা আজ বিকেল পাঁচটা নাগাদ আপনার বাসায় যাব। তবে আপনি যেন কথাটা গোপন রাখবেন। আমরা আপনার কোম্পানির অফিসার হিসেবে যাব।"

প্রাণনাথবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল অভ্যাসমতো টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, "কী বুঝলে জয়ন্ত ?"

"ম্যানেজার ওঁকে তাড়াতে চাইছেন। কারণ নতুন বোর্ডার ঢোকাতে পারলে বেশি ভাড়া এবং সেলামিও পাবেন।"

"তাড়াতে চাইলে হরনাথবাবুর মৃত্যুর পর ওঁকে একই ভাড়ায় থাকতে দিলেন কেন ?"

"তা হলে কোনও বোর্ডার— ধরুন, সেই ননীবাবু ঘরটা পাওয়ার জন্য ওঁর পেছনে লেগেছেন।"

কর্নেল হাসলেন। "টাইম ইজ মানি। কথাটা গুরুত্বপূর্ণ ডার্লিং !"

বিরক্ত হয়ে বললাম, "কথাটা দেখছি সত্যিই ভূতের মতো আপনাকে পেয়ে বসেছে।"

"হ্যাঁ। ওটাই আসলে ভূত। সেই ভূতের উপদ্রব ঘটেছে প্রাণনাথবাবুর ডেরায়।" বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। "নীচের ফ্ল্যাটের লিন্ডার দাদা গোম্‌সকে দিয়ে ষষ্ঠীর ওষুধগুলো আনিয়ে নিই। তুমি বোসো। দু'জনে আজ রান্নাবান্না করব। তারপর বিকেলে নকুড় মিস্ত্রি লেনে যাব।"

দোতলা মেসবাড়িটা খুঁজে বের করতে অসুবিধে হয়নি। ঘিঞ্জি গলির বাঁকের মুখে একটা ছোট্ট পার্ক দেখা যাচ্ছিল। প্রাণনাথবাবু নীচে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বাড়ির একতলায় দোকানপাট। দোতলায় মেস। শেষ প্রান্তে প্রাণনাথবাবুর ডেরা। তার লাগোয়া ম্যানেজারের ঘর। সেই ঘরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রাণনাথবাবু ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে জানিয়ে গেলেন, ওঁর কোম্পানির অফিসাররা 'ইমপর্ট্যান্ট' কাজে এসেছেন। প্রভাতবাবু চেয়ারে বসেই করজোড়ে নমস্কার করলেন। ভদ্রলোক রোগা এবং বেঁটে। মুখে অমায়িক ভাব। তালা খুলে প্রাণনাথবাবু বললেন, "আপনারা দয়া করে একটু বসুন। আমি চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।"

"টাইম ইজ মানি !" বলে কর্নেল দেওয়ালঘড়িটার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। ঘড়ির কাঁটা বারোটা তিরিশে থেমে আছে।

বললাম, "একেই বলে বারোটা বেজে যাওয়া।"

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে তার ওপর উঠে আতশ কাচ বের করলেন। একটু পরে বললেন, "ডায়ালে কিছু কথা লেখা ছিল। ঘষে ফেলা হয়েছে। তবে ঘড়িটা বিলিতি এবং খুব দামি। হরনাথ কিংবা তাঁর পূর্বপুরুষকে কেউ হয়তো উপহার দিয়েছিল।"

চেয়ার থেকে নেমে কর্নেল চেয়ারটা আগের জায়গায় রেখে কাঠের আলমারিটার কাছে গেলেন। উঁকি মেরে পেছন দিক দেখে আপন মনে বললেন, "সত্যিই এটা নড়ানো হয়েছে। ডান দিকের দুটো পায়া ইঞ্চিটাক সরে এসেছে।"

"কীভাবে বুঝলেন ?"

"কোনও আসবাব অনেককাল এক জায়গায় রাখলে মেঝেয় তার ছাপ পড়ে। পায়া দুটো সেই ছাপ থেকে সরে এসেছে।"

এইসময় প্রাণনাথবাবু ফিরে এলেন। তাঁর হাতে চায়ের দুটো কাপপ্লেট। বললেন, "আগে চা খেয়ে নিন আপনারা। তারপর সব দেখাচ্ছি।"

কর্নেল বললেন, "আপনি এই আলমারিটা খুলুন।"

"খুলছি। ওতে দাদার জামাকাপড় আর বইপত্তর ছাড়া কিছু নেই।"

প্রাণনাথবাবু কাঠের আলমারিটা খুলে দিলেন। কর্নেল আলমারির ভেতর যেন তল্লাশ শুরু করলেন। তল্লাশ শেষ হলে উনি চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "আপনার দাদার সেই সুটকেসটা দেখতে চাই।"

চামড়ার সুটকেসেও কিছু জামাকাপড় আর-একটা ফাইল পাওয়া গেল। ফাইলের কাগজপত্র দেখে কর্নেল বললেন, "আপনার দাদা দেখছি শেয়ার মার্কেটে ব্রোকার ছিলেন !"

"তাই বুঝি ? আমি কিন্তু দাদার কোনও কাগজপত্র এখনও খুঁটিয়ে দেখিনি !"

"আপনি ম্যানেজার প্রভাতবাবুকে ডাকুন। ওঁর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে চাই।"

প্রাণনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "ওঁকে ডাকা কি ঠিক হবে?"

"আপনি ওঁকে ডাকুন।"

কর্নেলের কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা ছিল। প্রাণনাথবাবু বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু উনি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওঁকে পাশ কাটিয়ে প্রভাতবাবুর আবির্ভাব হল। প্রাণনাথও ফিরে এলেন। আমার সন্দেহ হল, প্রভাতবাবু দরজার পাশেই হয়তো আড়ি পেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেল বললেন, "আসুন প্রভাতবাবু, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।"

প্রভাতবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন, "আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা লালবাজার থেকে এসেছেন। তবে সার, বড্ড দেরি করে এসেছেন। মরার আগে হরনাথ চোরাই জিনিস হাফিজ করে গেছে।"

কর্নেল বললেন, "চোরাই জিনিস! তার মানে?"

"মানে আপনারা ভালই জানেন! তবে আমি সার ওসব সাতে-পাঁচে ছিলাম না। হরনাথ আমাকে বলত বটে, 'খদ্দের দেখে দাও। সিকিভাগ তোমার।' আমি ওকে পাত্তা দিইনি।"

"কিন্তু জিনিসটা কী?"

"খুলে কিছু বলেনি হরনাথ। কাজেই জিনিসটা কী আমি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, জিনিসের দাম ছিল বড্ড বেশি। হরনাথ আভাস দিয়েছিল লাখের ওপরে দাম। আমার মালিক ভদ্রলোক, যাঁর এই মেসবাড়ি, তিনি কোটিপতি লোক। হরনাথ গোপনে তাঁর কাছেও গিয়েছিল। কিন্তু তিনিও কিনতে সাহস পাননি। আমাকে বলেছিলেন, 'ওই লোকটাকে তাড়াও।' কিন্তু তাড়াব কী করে? এ পাড়ার সব গুন্ডা, বদমাশ ছিল হরনাথের হাতে।"

প্রাণনাথ ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "এসব কী বলছ প্রভাতদা! আমার দাদা—"

প্রভাতবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "খাল কেটে কুমির এনেছ। এখন তুমিই ঠেলা সামলাও পানু! আমাকে এসব ব্যাপারে জড়িয়ো না।"

বলে উনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রাণনাথবাবু ধপাস করে বিছানায় বসে বললেন, "আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না। আমার দাদা বাউন্ডুলে ছন্নছাড়া ছিলেন বটে, কিন্তু ওঁকে চোর অপবাদ কেউ কস্মিনকালে দেয়নি। আর দামি চোরাই জিনিস যদি ওঁর কাছে থাকবে, আমি তার খোঁজ পাব না? যদি বেচে দিয়েও থাকেন, সেই টাকাই বা গেল কোথায়?"

কর্নেল চুরুট ধরালেন। আমি বললাম, "এবার মনে হচ্ছে, আপনার ঘরে কেউ আপনার দাদার চোরাই জিনিস বা তা বিক্রি করা টাকা খুঁজতেই ঢোকে।"

প্রাণনাথবাবু প্রায় আর্তনাদ করলেন, "তেমন কিছু এ ঘরে নেই।"

কর্নেল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, "আপনার দাদা বলেছিলেন টাইম ইজ মানি। তাই না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"টাইমের সঙ্গে ঘড়ির সম্পর্ক আছে। আপনি ঘড়িটা সারাতে দিচ্ছেন না কেন?"

"সারাতে অনেক টাকা লাগবে। অত টাকা পাব কোথায়?"

"আমি নিজের খরচে সারিয়ে দেব। আমার ধারণা, ঘড়িটা চালু হলে আপনার ঘরে আর ভূতের উপদ্রব হবে না। ওই অচল ঘড়িই আপনার ঘরে ভূত ডেকে আনছে।"

প্রাণনাথবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন।

কর্নেল চেয়ার টেনে নিয়ে দেওয়ালঘড়ির তলায় গেলেন। তারপর চেয়ারে উঠে প্রকাণ্ড ঘড়িটা নামিয়ে আনলেন। বললেন, "দিন সাতেক পরে আমার কাছ থেকে এটা ফেরত নিয়ে আসবেন। কোনও বড় কোম্পানিতে এটা সারাতে দেব।"

ইলিয়ট রোডে তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ঘড়িটা খুলতে শুরু করলেন। বললাম, "সব ছেড়ে এই ঘড়ি নিয়ে পড়লেন কেন?"

কর্নেল হাসলেন, "কারণ টাইম ইজ মানি।"

"কর্নেল! আমার ভয় হচ্ছে এই অচল ঘড়ি আপনার মগজও অচল করে দিয়েছে।"

ডায়ালের কাচ খুলে আতশ কাচ রেখে কী দেখতে দেখতে কর্নেল বললেন, "এবার স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে। প্রেজেন্টেড টু মিঃ জয়গোবিন্দ রায় ফর হিজ সিনসিয়ার সার্ভিস অ্যান্ড অনেস্টি, অন দা অকেশন অব কুমারবাহাদুর প্রমথনারায়ণ চৌধুরী'স সেভেনটি ফার্স্ট বার্থ অ্যানিভার্সারি..."

চমকে উঠলাম। "কর্নেল! এটা তো তা হলে সৈদাবাদ রাজবাড়ির উপহার! এই উপহার হরনাথের হাতে গেল কী করে?"

"ডার্লিং! হরনাথই জয়গোবিন্দ। হরনাথের সুটকেসের ভেতর কয়েকটা পুরনো নেমকার্ড খুঁজে পেয়েছি। এই দ্যাখো, হরনাথ নাম ভাঁড়িয়ে রাজবাড়িতে কেয়ারটেকারের চাকরি জুটিয়েছিল।"

"বুঝেছি। কিন্তু জড়োয়া নেকলেসটা গেল কোথায়?"

"ভুলে যাচ্ছ জয়ন্ত! মৃত্যুর সময় হরনাথ বলেছিল, 'পানু! টাইম ইজ মানি। কথাটা মনে রাখিস।' পানুবাবু সূত্রটা বুঝতে পারেননি। নেকলেস চুরি যায় রাত সাড়ে বারোটায়। এই ঘড়ির কাঁটা তাই সাড়ে বারোটায় রেখেছিল হরনাথ। আর নেকলেসটা—" বলে কর্নেল ডায়াল খুলে ফেললেন এবং ভেতর থেকে একটা লাল ভেলভেটে মোড়া প্যাকেট বের করলেন। প্যাকেট খুলতেই দেখা গেল ঝলমলে হিরে মুক্তোবসানো সোনার ঝালর দেওয়া একটা জড়োয়া নেকলেস। কর্নেল মিটিমিটি হেসে ফের বললেন, "টাইম ইজ মানি! তবে হরনাথ কীভাবে নেকলেসটা চুরি করেছিল, এখন বুঝতে পারছি। এই দ্যাখো, পিঠের দিকে নেকলেসটার ক্লিপ ঠিকভাবে আঁটা নেই। সহজেই খোলা যায় কিংবা নিজে থেকেও খুলে পড়তে পারে। বিয়ের পার্টিতে নতুন বউমা নিশ্চয় ঘুমে ঢুলছিলেন। সেই সময় নেকলেস খসে পড়ে থাকবে। কেয়ারটেকার উপহারসামগ্রীর দায়িত্বে ছিল। সে সুযোগটা ছাড়েনি। ক্লিয়ার?"

সায় দিয়ে বললাম, "অল ক্লিয়ার। টাইম ইজ মানি, এটাও ক্লিয়ার।"

ছবি : বিমল দাস

গোয়েন্দা গল্প

আয়না

আনন্দ বাগচী

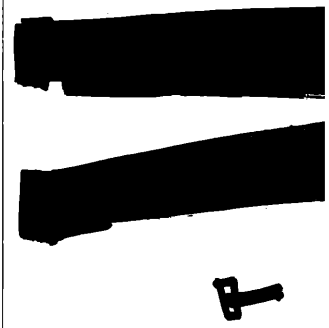

কিন্নরদের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছনোর আগেই সুনন্দর বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। খুনটুন নয় তো? ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা পুলিশের জিপ, ভ্যানগাড়ি আর অ্যাম্বুলেন্স দাঁড়িয়ে। সেই খালি গাড়িগুলোর পাশে খাকি পোশাকে কয়েকজন লোক খৈনি ডলতে-ডলতে নিচু গলায় কী যেন আলোচনা করছিল। তবে কি কিন্নরদের বাড়িতেই কিছু হয়েছে? আজকাল ফ্ল্যাটে ঢুকে ডাকাতি, ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা তো আকছার ঘটছে। বন্ধুর বিপদের আশঙ্কায় কেমন দিশেহারা হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সে।

একতলার অ্যাপার্টমেন্টের জানলা দিয়ে কিন্নর ওকে দেখতে পেয়ে গিয়েছিল। ছুটে বেরিয়ে এল। কাছে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, "এই সুনন্দ, শুনেছিস, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে দোতলায়। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না, কিরণকাকু নেই!"

"নেই! নেই মানে?" সুনন্দ হাঁ হয়ে যায়।

"নেই মানে ইয়ে, মারা গেছেন! হার্ট ফেলিওর।"

"সে কী! আমি যে ওঁর জন্যেই," পেছনে বিচিত্র রবের হর্ন শুনে রাস্তা ছেড়ে সরে গিয়েই সুনন্দ চমকাল। দেখল কমলেশকাকা তাঁর মিউজিয়াম মাস্টারপিস থেকে নামছেন। এ যুগে এই কিম্ভূত মডেলের গাড়ি ভাবাই যায় না।

"কী রে! তুই এখানে?"

অতশত জবাব দেওয়ার সময় ছিল না। শুধু বলল, "এ আমার বন্ধু কিন্নর সেন। একতলায় থাকে।"

"কিন্নর? বাঃ চমৎকার নাম! তোমার সঙ্গে একটু পরে এসে আলাপ করব, কেমন? এই, তুই আয় তো আমার সঙ্গে। কুইক!" হাত ধরে ছোট্ট করে একটা টান দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে কমলেশকাকা বললেন, "অন ডিউটি না, বুঝতেই পারছিস। আমার বুজুম ফ্রেন্ড কুশলকিরণ ঘোষ চলে গেল রে! খুবই রহস্যময়ভাবে। ফোন পেয়েই যেমন ছিলাম ছুটে আসছি।"

সুনন্দ দেখল ওঁর পরনে ঘরে পরার ধ্যাস্তানো পাজামা আর হাফ পাঞ্জাবি। অবাক হয়ে বলল, "ওঁকে তুমিও চিনতে?"

"চিনতাম মানে?" ভ্রূ কুঁচকে তাকালেন, "বললাম না, ছেলেবেলার বন্ধু? কত বড় লেখক!" বলেই হঠাৎ কিছু একটা খটকা লেগেছিল বোধহয়, তাই 'হুঁ' বলে ওর মুখের দিকে আর-এক ঝলক তাকালেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই।

ফ্ল্যাটের দরজায় মোতায়েন কনস্টেবল হাঁ-হাঁ করে পথ আগলে দাঁড়াতেই ভেতর থেকে এক দাবড়ানি। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা যেন চাবুক খেয়ে সিধে হয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে প্যাসেজে দু'জন পুলিশ অফিসারকে দেখা যাচ্ছিল। একজন থানার ও.সি.। অন্যজন লালবাজারের ডিটেকটিভ ইনস্পেক্টর। দু'জনেই ছুটে এসে স্যালুট করলেন, "আসুন সার! কাজ প্রায় শেষ, শুধু আপনার জন্যেই..."

ভেতরের ঘরে যেন মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। একগাদা লোক সেখানে সন্তর্পণে চলাফেরা করছিল। কেউ দেওয়ালের গায়ে মাছির মতো সেঁটে রয়েছে, কেউ টেবিলে হুমড়ি খেয়ে যেন গন্ধ শুঁকছে।

এটাই ছিল ওঁর লেখার ঘর। দিনসাতেক আগে কিন্নর ওকে নিয়ে এসেছিল সকালের দিকে। ব্যাপার এই, ছোটদের একটা পত্রিকা বের করবে বলে সুনন্দ খুব তোড়জোড় করে লেগেছে। এত বড় একজন লেখকের যে-কোনও একটা লেখা পেলেই ওরা বর্তে যাবে, তাই কিন্নরকে ধরেছিল। কিন্নর ওঁর নাড়িনক্ষত্র জানে, তাই বলে দিয়েছিল একবার লেখায় বসে গেলে কেউ মাথা খুঁড়লেও উনি দেখা করেন না। ঠিক সকাল সাতটায় উনি দাড়ি কামাতে বসেন। সব কিছুই ওঁর ঘড়ি ধরে, একচুল নড়চড় হওয়ার জো নেই। আসলে স্বাধীন মানুষ, লেখাই ওঁর জীবিকা, লেখাই ওঁর চাকরি। দিনে দশ ঘণ্টা করে লেখেন। প্রথম খেপ ভোর সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা। তারপর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখার পর চা দিয়ে গেলে চা খান। দাড়ি কামিয়ে স্নানটান সেরে আটটায় ব্রেকফাস্ট। খবরের কাগজে চোখ বুলনো। সাড়ে আটটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘণ্টা লিখে উঠে পড়েন। আহারান্তে একটু গড়িয়ে নিয়ে ফের তিনটে থেকে ছ'টা। চা খেয়ে একটু বাইরে ঘুরে আসেন। সন্ধেয় বন্ধু-বান্ধব, সম্পাদক প্রকাশক কি প্রতিবেশীরা কেউ এলে দেখা করেন। গল্পগুজবও হয়। রাতে আর কলম ধরেন না, পড়াশোনা করেন। এই রুটিন অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেন সপ্তাহে সাতদিনই। এত পুরস্কার, এত সংবর্ধনা আর প্রশস্তি তো আর অকারণে পাননি। এখন বাংলায় জীবিতদের মধ্যে, তিনিই বলতে গেলে এক নম্বর লেখক। ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ছিল। কিন্তু ঘরের দরজা উনি স্কাল থেকে বন্ধ করেই রাখেন। এটাই নিয়ম। বাড়ির লোকজন সবাই জানে। দাড়ি কামাতে বসেছিলেন। ঠিক সাতটায় ওরা নক করতে দরজা খুলে দিলেন। সব শুনে বললেন কথা দিতে পারছেন না। সাতদিন পরে ঠিক এই সময়ে সুনন্দ যেন তাঁকে একটা ফোন করে। তখন তিনি বলবেন আদৌ লিখতে পারবেন কি না।

আজ ঠিক সাতটাতেই সুনন্দ ফোন করেছিল কিন্তু পর-পর দু'বার রং নাম্বার হয়ে যাওয়ায় মিনিট সাতেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর ফোন বেজেই গেল উনি

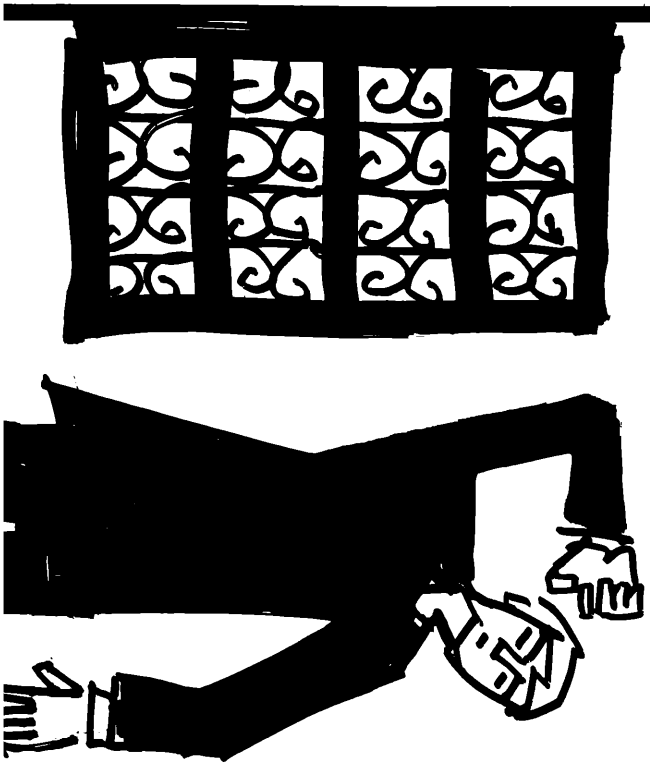

ধরলেন না। একটু সময় দিয়ে-দিয়ে বারতিনেক চেষ্টা করল কিন্তু একই ফল হল। ফোন উনি তুললেনই না। বোঝাই গেল উনি রেগে গিয়েছেন। তাই খুব মনমরা হয়েই কিন্নরের কাছে ছুটে এসেছিল সুনন্দ। এসে শুনল এই কাণ্ড !

লেখার ঘরখানা বেশ প্রশস্ত। পুব দিকে বিশাল জানলার একপাশে ছোট্ট একটা টেবিলে চা-ব্রেকফাস্ট হয়। তলায় দু'থাক দেরাজে দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, মসলা-মুখশুদ্ধি আর হঠাৎ দরকারের ওষুধপত্র থাকে। প্রায় তার গায়ে-গায়েই বেশ বড়সড় লেখার টেবিলে টেলিফোন, কারুকাজ করা কলমদানি, স্বামী বিবেকানন্দের ফ্রেমে দাঁড় করানো রঙিন ছবি, ধূপদান আর সুদৃশ্য শেড দেওয়া, যে-কোনও দিকে ঘোরানো-ফেরানো যায় এরকম টেবিল ল্যাম্প। পাশেই ঘূর্ণি বুকশেলফে ঠাসা রেফারেন্স বই। র‍্যাক পেরোলে ব্যালকনির দরজা আর অ্যাটাচ্‌ড বাথ।

চায়ের টেবিলের ঠিক উলটো দিকে পশ্চিমের জানলার তলায় মেঝের ওপরে প্রায় চিত হয়ে পড়ে ছিলেন কুশলকিরণ। কীরকম বেকায়দা ভঙ্গিতে। একটু তফাতে রেজারটা ছিটকে পড়ে আছে। এক গাল কামানো। অন্য গালে সাবানের ফেনা পুরু হয়ে শুকিয়ে রয়েছে। চোখ আধখোলা, মৃত্যুযন্ত্রণায় কোঁচকানো। ওদিকে টেবিলের দিকে চোখ ফিরিয়ে সাবান মাখানো ব্রাশ, জলের বাটি আর শেভিং ক্রিমের টিউব, আফটার শেভ লোশনের শিশি রয়েছে দেখতে পেল। গালে রেজারের মাত্রই একটা কি দুটো টান দিয়ে হঠাৎ পশ্চিমের জানলার কাছে কেন যে তিনি উঠে এসেছিলেন, বোঝা গেল না। তাঁকে কি কেউ ডেকেছিল ? তাঁকে এভাবে এখানে কি কেউ ডাকতে পারে ?

সুনন্দ পায়ে-পায়ে পশ্চিমের জানলায় গিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়াল। ততক্ষণে বডি তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বছর পঞ্চাশ বয়সের কিরণবাবুকে দেখতেই শক্তপোক্ত ছিল। কিন্তু মানুষটার নাকি হার্টের ব্যামো ছিল। নীচে এই হাউসের পেছন দিকের ফালি জমিতে কিচেন গার্ডেন টানা চলে গেছে। লতানে শশা, ভুঁইকুমড়ো, টম্যাটো আর লালশাক, ফুলকপির চাষ। চলাফেরা করার পথ নেই। তারপর মাথার কাঁটাতার জড়ানো এক মানুষ সমান পাঁচিল। পাঁচিলের ও-পিঠেই বোধ হয় লম্বা ডোবার সাইজের পুকুর ছিল একটা। ঘেঁষ ফেলে বোজানো হয়েছে। তার ওপাশে চোরকাঁটায় ছাওয়া ঘেসো জমি সাফ করে হাউসিং-এর গোটাতিনেক বাড়ি উঠছে। শুধু পিলার, মেঝে আর সিঁড়ি হওয়ার পর কোনও কারণে কাজ বন্ধ আছে। কমলেশকাকা পাশে এসে বললেন, "যা ভাবছিস, অসম্ভব।" সুনন্দ সত্যিই চমকাল। সে সত্যিই ভাবছিল। অসম্ভব। শুধু অসম্ভবই নয়, অর্থহীন, হাস্যকর। এদিক থেকে ভদ্রলোককে ডাকা দূরে থাক, এমন কোনও শব্দ-টব্দ করার লোকও নেই যা শুনে তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসবেন।

সুনন্দর কথা সব শুনে কমলেশকাকা বললেন, "তার মানে তুই যখন প্রথম রিং হতে শুনেছিলি তখন কুশল ওয়াজ অলরেডি ডেড। সদর বন্ধ ছিল। ওঁর স্ত্রী নবনীতা কিচেনে, গ্যাসে চাপানো প্রেশার কুকার সিটি দিচ্ছিল। অন্যদিকের একটা বেডরুমে বাইশ-তেইশ বছরের ভাগনে রূপেন দরজা বন্ধ করে শীর্ষাসন করছে। ফোন বেজে যাচ্ছে, অনেকক্ষণই কারও কানেই যায়নি। পরে শুনতে পেয়ে ওঁর স্ত্রী গিয়ে দেখেন ভেতর থেকে লেখার ঘরের দরজা বন্ধ। ফোন শেষবার বাজতে-বাজতে থেমে গেল। মেঝের ওপর কুশল পড়ে আছে। রূপেন ব্যায়ামের পোশাকেই ছুটে গিয়ে তেতলা থেকে ওঁর বন্ধু ভবনাথবাবুকে ডেকে আনে। তিনি তখন মর্নিং ওয়াক থেকে ফিরে সবে লুঙ্গি আর ফতুয়া চাপিয়েছেন, সেইসঙ্গে চায়ের জল। কারণ স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা এখানে নেই, বাইরে কোথায় বিয়েবাড়িতে গেছে। লোক জড়ো করে দরোয়ানকে ডেকে ঘরের কপাট ভেঙে ভেতরে ঢোকা হয়। ভবনাথই থানায়, লালবাজারে ফোন করেন। লালবাজার আমাকে।"

"কাকু, ডাক্তার কী বললেন ?" সুনন্দ জানতে চায়।

কমলেশ রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নিয়ে বললেন, "হার্ট ফেল। কিন্তু বাঁ হাতের তালুতে একটা পোড়া সাদা দাগ দেখতে পেয়েছেন। টাটকা। সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। এক কাজ কর, তোকে পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। এ-ঘরের যা কিছু দেখার ইচ্ছে খুঁটিয়ে দেখে নে। আমরা তারপর ওপাশের ঘর থেকে ভবনাথবাবুকে ডেকে নিয়ে ওপরে ওঁর ঘরে যাব। ওঁর মুখ থেকে আলাদা করে কিছু শুনব।"

গ্রিলে পিঠ ঠেকিয়ে পেছনে হাত রেখে সুনন্দ দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ হুল ফোটার মতো খচ্ করে আঙুলে কিছু বিঁধতেই সুনন্দ ভয়ে চমকে উঠেছিল। রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের ঘরে স্নায়ু এমনিতেই এমন টানটান হয়ে থাকে, ভিতু-সাহসীর কোনও ব্যাপার নয়। ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেল, কিছুই না, একগুছি তামার তার গ্রিলের নীচের দিকের একটা পাতে কেউ বেঁধে যেন আংটি বানিয়েছে। ছেলেবেলায় সুনন্দও করেছে, তবে আঙুলে। হাইট দেখেই বোঝা যায় কোনও বাচ্চা ছেলে কিংবা মেয়ের কাজ। ভাগ্যিস, কমলেশকাকা তার চমকে ওঠা দেখতে পাননি, সেই সময় সিগারেট ধরাচ্ছিলেন, নইলে ভিতু বলে ঠাট্টা করতেন। তারের গুছিটার প্যাঁচ খুলে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, কমলেশ বললেন, "কী করিস!"

"ও কিছু না।" সুনন্দ মুচকি হেসে বলল, "চলো, যাবে না?"

ভবনাথ সদর বন্ধ করে যেতেও ভুলে গিয়েছিলেন, সময় পাননি। ওদের নিয়ে একটু বিব্রত হয়ে বললেন, "আসুন, আসুন।"

সোফার ওপরে দলা পাকিয়ে ফেলে রাখা পাজামা-পাঞ্জাবি আর টুকিটাকি তুলে নিয়ে বললেন, "আপনারা বসুন, আমি আসছি। চা খাবেন? ইস, আমার চায়ের জল বোধহয় ফুটে শুকিয়ে গেল।"

কমলেশ মাথা নেড়ে জানালেন, না। ফিরে আসতেই কমলেশ জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি বোধহয় কোনও শব্দটব্দ শোনেননি?"

"কিসের শব্দ? না। তবে নীচের তলার ভদ্রলোক নাকি ধুপ করে কিছু পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনেছিলেন। কুশলের লেখার ঘরের ঠিক নীচেই ওঁর ঘর কিনা। তবে গুরুত্ব দেননি।"

"আচ্ছা রূপেন সম্পর্কে আপনার..."

"না, না, ও খুব ভাল ছেলে। একটু ডাল হেড, শরীরচর্চা নিয়েই মেতে থাকে। মামা-মামির অবর্তমানে ওই অবশ্য সব কিছু

পাবে। তবে ছেলেটার টাকা-পয়সার লোভ নেই। কুশলরা নিঃসন্তান, রূপেনকেই ওরা ছেলের মতো দেখত। আচ্ছা, জানেন, কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল, কুশলের নাম এবার নোবেল পুরস্কারের জন্যে উঠেছে। এবার যদি নাও হয়, সামনের বছরে পেয়ে যেতেও পারত!"

কমলেশ ঠাট্টা করে বললেন, "আপনার হিংসে হয়নি? আপনিও তো লেখক মশাই।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ভবনাথ বললেন, "কী যে বলেন ভাই! কিসে আর কিসে। আমি ওর পায়ের নখের যুগ্যিও না।"

আরও দু-একটা কথার পর সুনন্দ মাঝে পড়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা ভবকাকা, ওঁর ঘরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে কখনও ঢুকত?"

"না, কেন ঢুকবে না!" ভবনাথ হাত নেড়ে বললেন, "কুশল বাচ্চাদের ভীষণ ভীষণ ভালবাসত! ওই তো একতলার ভদ্রলোকের ভাইয়ের দুটি যমজ মেয়ে প্রায় ওর ঘরে ঘুরঘুর করত। কেন বল তো?"

সুনন্দ হেসে বলল, "এমনিই।"

ক'দিন পরে কমলেশকাকা সুনন্দদের বাড়িতে এসে হাজির। বললেন, "জানিস, বিশেষজ্ঞদের মত হচ্ছে ইলেকট্রিক শক দিয়ে কুশলের হার্টফেল করানো হয়েছে। কিন্তু কী করে, সেটাই ধরতে পারা যাচ্ছে না।"

সুনন্দ লাফিয়ে উঠে বলল, "তাই বলো! আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ইস কাকু, এই সোজা ব্যাপারটা আমি ধরতেই পারিনি। আমি কী মুখ্যু!"

কমলেশ সোজা হয়ে তাকালেন, "কী বকছিস পাগলের মতো?"

"হয়তো পাগলামিই করছি। আমার মনে হয় পশ্চিমের জানলার গ্রিলটা ইলেকট্রিফায়েড করে রাখা হয়েছিল। এই দ্যাখো,"— বলেই সুনন্দ ছুটে গিয়ে ওর টেবিল থেকে ইঞ্চি দুই-আড়াই লম্বা একগুছি তামার তার এনে দেখাল, "এ কোনও বাচ্চা মেয়ের কম্মো না।"

"এইটুকু তার দিয়ে? কোথায় পেলি?"

"গ্রিলে জড়ানো ছিল। পরে টেনে ছিঁড়ে নেওয়ার সময় এটুকু থেকে গিয়েছিল।"

"অ্যাঁ! তোর কথা ঠিক হলে বলতে হয় বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরার ফলেই কুশল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়? কিন্তু যে করেছে তার মোটিভ কী? আর কী করেই বা সে কুশলকে ওখানে টেনে নিয়ে গেল, গ্রিল ধরতে বাধ্য করল? ঘর তো ভেতর থেকে বন্ধই ছিল।"

"মোটিভ-টোটিভ আমি জানি না। তবে কী করে নিয়ে গিয়েছিল অনুমান করা যায়। হত্যাকারী পেছনের দিকের হাউসিংয়ের বাড়িটার তিনতলায় উঠে একটা ছোট হাত আয়না দিয়ে কুশলবাবুর সামনের আয়নায় রোদ্দুরের ঝলক ফেলতে থাকে। অবাক আর বিরক্ত হয়ে তিনি ব্যাপারটা দেখার জন্যে পেছনের জানলার দিকে আসেন। কোত্থেকে আলোটা আসছে বুঝতে পেরে ওপরের দিকে তাকান। কিন্তু কিছুই দেখতে পান না। মুখের ওপর আলো এসে পড়ায় চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ব্যাপারটা সামলাতে বাঁ হাতে গ্রিল চেপে ধরেন সঙ্গে-সঙ্গে। লোকটা ছুটতে-ছুটতে নিজের ঘরে ফিরে আসে আর তারটা টেনে ছিঁড়ে নেয়। আংটাটুকু গ্রিলের সঙ্গে লেগে থাকে। আগের রাতেই সে ব্যবস্থা করে রেখেছিল। কিন্তু কানেকশন দিয়েছিল ভোরবেলা। তারপর ওবাড়িতে উঠে রোদ ওঠার অপেক্ষায় বসেছিল।"

"ওয়ান্ডারফুল গপ্পো!" কমলেশ হাসলেন, "কিন্তু লোকটা কে? রূপেন, না নীচের তলার কেউ?"

"ভবনাথবাবু!" সুনন্দ মাথা চুলকে বলে, "তুমি খেয়াল করোনি, আমি দেখেছি। সোফার ওপর ছাড়া জামা-পাজামার সঙ্গে একটা গোলমতো আয়না আর তারের বান্ডিল (প্লাগ-পিন সুদ্ধু) তুলে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। চায়ের জলের ব্যাপারটা নিশ্চয় বানানো।"

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

গোয়েন্দা গল্প

হেমলক জোন্‌সের চুরুটের বাক্স

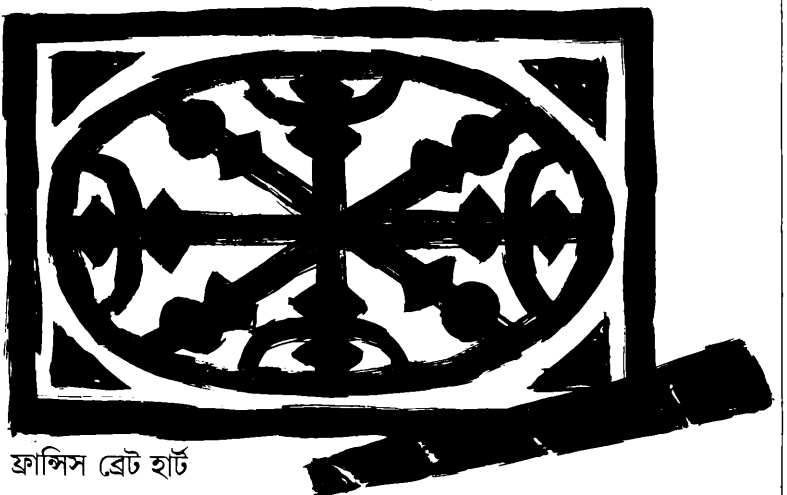

ফ্রান্সিস ব্রেট হার্ট

হেমলক জোন্‌স-এর পুরনো ব্রুক স্ট্রিটের বাসায় গিয়ে দেখলাম, সে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে আছে। বহুদিনের অনুরাগী বন্ধুর স্বাধীনতায় আমি আমার চিরপরিচিত ভঙ্গিতে তখনই তার পায়ের কাছে বসে আলতোভাবে তার জুতোয় হাত বুলোতে লাগলাম। দুটো কারণে এটা করার ইচ্ছে হল। একটা কারণ, গভীর চিন্তায় মগ্ন, ঝুঁকে-পড়া তার মুখটা এভাবে খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। আর দ্বিতীয় কারণটা হল, আমি যে তার অতিমানবিক মেধার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তার আভাসটাও এভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। রহস্যজনক কোনও সূত্রের খোঁজে সে এমনই চিন্তামগ্ন যে, এমনকী তখনও সে আমাকে লক্ষ করেনি। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা অনুধাবনের চেষ্টায় আমি যেমন বরাবর ভুল করে এসেছি, সেদিনও তাই করলাম।

"বৃষ্টি হচ্ছে," মাথা না তুলে সে বলল।

"তুমি কি বাইরে বেরিয়েছিলে ?" আমি চটপট বলে উঠলাম।

"না। তবে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার ছাতাটা ভিজে। আর তোমার ওই ওভারকোটটা, যেটা তুমি ঘরে ঢুকেই খুলে ফেলেছ, তার গায়েও ফোঁটা-ফোঁটা জল লেগে আছে।"

ওর এই মর্মভেদী দৃষ্টিতে আমি বিরক্ত হয়ে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পর, সে যেন বিষয়টা উড়িয়ে দিচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে বলল, "তা ছাড়া জানালায় আমি বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শোনো—"

আমি শুনলাম। নিজের কানকেও বিশ্বাস হয় না, শার্শিতে সত্যিই বৃষ্টির মৃদু শব্দ হচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা গেল, আর যাই হোক, এই লোকটাকে বোকা বানানো যাবে না।

"তুমি কি ইদানীং খুব ব্যস্ত ?" বিষয়টা পরিবর্তন করে আমি জিজ্ঞেস করলাম। "কোনও নতুন সমস্যা, যার সমাধান অসম্ভব বলে মনে করে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডও হাল ছেড়ে দিয়েছে, এখন কি তোমার বিপুল মগজটাকেই দখল করে রেখেছে ?"

সে তার পা একটু সরিয়ে নিল। কিছুটা গড়িমসি করে সেই পা আবার আগের জায়গাতেই নিয়ে গেল। তারপর ক্লান্ত গলায় আমার প্রশ্নের উত্তর দিল, "তুচ্ছ কয়েকটা ব্যাপার, তেমন বলার মতো নয়। ক্রেমলিন থেকে কয়েকটা রুবি উধাও হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে প্রিন্স কোপোলি আমার পরামর্শ নিতে এসেছিলেন। এসেছিলেন পুটিবাড়-এর রাজা। রত্নখচিত একটি তলোয়ার উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি তাঁর পুরো দেহরক্ষীবাহিনীকে কোতল করেছেন। তাতেও কাজ হয়নি। শেষে এসেছিলেন আমার কাছে কিছু সাহায্য নিতে। প্রেটজেল-ব্রান্টস-উগ-এর ডাচেস গোপনে খোঁজখবর নিতে চান ১৪ ফেব্রুয়ারি রাত্রে এবং গতরাত্রে তাঁর স্বামী কোথায় ছিলেন।" সে তার গলাটা কিছুটা নামিয়ে বলল, "এই ভাড়া-বাড়িরই এক বাসিন্দার সঙ্গে সিঁড়িতে দেখা হলে সে আমার কাছে জানতে চাইল, 'অন্য বাসিন্দাদের দরজায় গিয়ে বেল বাজালে ওরা কেন উত্তর দিতে চায় না বলুন তো ?'"

না হেসে পারলাম না। কিন্তু ওই ততক্ষণই, যখন দেখলাম ভ্রূ কুঁচকোতে শুরু করেছে।

"মনে করে দ্যাখো," সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এরকম একটা আপাতুচ্ছ প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই আমি জানতে পেরেছিলাম, পল ফেরোল কেন তার স্ত্রীকে খুন করেছিল, জোনস-এর ভাগ্নেই বা কী ঘটল !"

তখনই চুপ করে গেলাম। সে-ও কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ সে তার স্বভাবসিদ্ধ, নির্মম, বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে বলে উঠল, "এখন আমার হাতে যে কেসটা এসেছে তার তুলনায় এগুলো সত্যিই তুচ্ছ ঘটনা। একটা অপরাধ করা হয়েছে, এবং এক কথায়, তা আমারই বিরুদ্ধে। ভেবে দ্যাখো, কার এমন আস্পর্ধা। আমি নিজেও ভেবে দেখেছি, দুঃসাহস তো কম নয়। কিন্তু ঘটনা যা ঘটার তা ঘটেছেই। আমার একটা জিনিস চুরি গেছে !"

"তোমার জিনিস চুরি করল ? তুমি, তুমি হেমলক জোন্‌স, তোমার নাম শুনলে অপরাধীরা আঁতকে ওঠে।" আমি আর কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বিস্ময়ে আমি তার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে উঠে টেবিলের একটা কোনা আঁকড়ে ধরলাম।

"হ্যাঁ, শোনো। আর কাউকে কথাটা আমি জানাব না। তুমি তো বহুবছর ধরে আমাকে দেখছ, আমার কাজের পদ্ধতিটাও তোমার জানা আছে। আমি কী করি না করি, তা সাধারণ মানুষকে জানাতে চাই না। তোমার ক্ষেত্রেই শুধু পরদাটা একটু তুলেছি। বছরের-পর-বছর ধরে কষ্ট করে তুমি আমার কাজের ধারাটাকে মেনে নিয়েছ, আমার যুক্তিতর্কের প্রশংসা করেছ আন্তরিকভাবে, আজ্ঞাবাহী, অনুগত ভৃত্যের মতো তুমি নিজেকে সমর্পণ করেছ আমার কাছে, দিনের- পর-দিন আমার পায়ের কাছে পড়ে থেকেছ, নিজের প্র্যাকটিস জলাঞ্জলি দিতে বসেছ, রোগীপত্র যা ছিল তাও দ্রুত কমে আসছে, অল্প যে ক'জন আছে তাদের দেখে তেমন টাকাপয়সাও তুমি পাও না, আমার সমস্যা নিয়ে কখনও-কখনও আবার এমনই অবাস্তব চিন্তাভাবনা শুরু করে দাও যে, কুইনিন দিতে গিয়ে দিয়ে বসো স্ট্রিকনিন, না হয় এপসম-এর জায়গায় আর্সেনিক। তুমি সবকিছু এবং সবাইকে বিসর্জন দিয়েছ শুধু আমার জন্য— তোমাকেই আমি বিশ্বস্ত সহচর বলে গ্রহণ করছি।"

আমি তাকে আবেগে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু তখনও সে নিজের চিন্তাভাবনায় এমনই ডুবে আছে যে, সেই মুহূর্তে যান্ত্রিকভাবে সে তার ঘড়ির চেনে হাত রাখল, যেন সময় দেখার প্রয়োজন হয়েছে। "বোসো," সে বলল, "একটা চুরুট খাও।"

"চুরুট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।" আমি বললাম।

"কেন ?" সে জিজ্ঞেস করল।

বলতে দ্বিধা হল, হয়তো লজ্জাও পেলাম। চুরুট খাওয়া সত্যিই ছেড়ে দিয়েছি, কারণ প্র্যাকটিস প্রায় নেই, চুরুটের দামও বেশি। আমি শুধু পাইপ খেতে পারি। হাসতে-হাসতে বললাম, "পাইপই আমার ভাল লাগে। তা, চুরির কথাটা বলো। তোমার হারালটা কী ?"

সে ফায়ারপ্লেসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার দুটো হাত কোটের পকেটে। আমার দিকে তাকিয়ে স্মৃতিচারণার ভঙ্গিতে বলল, "তোমার মনে আছে, হিলারিটি থিয়েটারে একটা জিনিস উদ্ধার করে দিয়েছিলাম বলে তুরস্কের রাষ্ট্রদূত আমাকে একটা চুরুটের বাক্স উপহার দিয়েছিলেন ? হিরে বসানো সেই চুরুটের বাক্সটাই চুরি গেছে।"

"তার মধ্যে একটা হিরে ছিল বেশ বড়।"

"তোমার দেখছি মনে আছে।"

"সত্যি বলছ, চুরুটের ওই বাক্সটাই তুমি হারিয়ে ফেলেছ ?"

সে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "হারায়নি, চুরি গেছে। সত্যি বলছি। তবে আমি ওটাকে খুঁজে বের করবই। এবং আমি নিজে। তোমার পেশায় যদি কারও সাঙ্ঘাতিক অসুখ হয়, সে তখন নিজে-নিজে ওষুধ খায় না, একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠায়। এখানেই আমাদের তফাত। আমি এই ব্যাপারটা পুরো নিজের হাতে তুলে নেব।"

"তোমার চেয়ে ভাল গোয়েন্দা আর কে আছে ?" আমি উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলাম, "মনে হচ্ছে, চুরুটের বাক্সটা এখনই তোমার হাতে এসে গেছে।"

"আমি তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি," সে হালকা গলায় বলল, "তোমার বিচারবুদ্ধির ওপর আমার আস্থা আছে। আমার সঙ্কল্প, চুরুটের বাক্সটা আমি একা, কারও কাছ থেকে কোনওরকম সাহায্য না নিয়েই খুঁজে বের করব। তবু তোমার যদি কিছু পরামর্শ থাকে আমি শুনতে চাই।"

পকেট থেকে সে একটা নোটবুক ও পেন্সিল বের করল।

নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। ডাকসাইটে গোয়েন্দা হেমলক জোন্‌স আমার মতো সামান্য একটা লোকের পরামর্শ নিতে চাইছে ! খুশি মনে বললাম, "প্রথমে আমি বিজ্ঞাপন দেব, পুরস্কার ঘোষণা করব। এ-নিয়ে হ্যান্ডবিল বিলি করব। তারপর যাব বন্ধকের কারবারীদের কাছে, যাব থানায়। বাড়ির কাজের লোকদের জেরা করব। পুরো বাড়িটা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখব, হাতড়ে দেখব আমার সব পকেট। এখানে আমি বলতে—" হাসতে হাসতে বললাম, "আমি তোমার কথাই বোঝাতে চাইছি।"

এসব কিছু সে গম্ভীরভাবে লিখে রাখল নোটবুকে।

আমি বললাম, "ইতিমধ্যে তুমি হয়তো এসব কিছুই করে ফেলেছ।"

"হয়তো।" হেঁয়ালির মতো সে ফিরিয়ে দিল আমার কথাটা। পকেটে নোটবুকটা রেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বন্ধু, এখন কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে ক্ষমা করবে ? আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই ঘরেই

থাকো। আরাম করো। কিছু জিনিসপত্র আছে।" বিচিত্র সব জিনিসপত্রে ঠাসা শেল্‌ফগুলোর দিকে সে আঙুল তুলে দেখাল। "সময় কাটানোর মতো তোমার পছন্দমাফিক কিছু-কিছু জিনিস হয়তো ওখানে পাবে। পাইপ, তামাক সবই আছে।" আমার দিকে মাথা নেড়ে, সেই আগের মতোই দুর্বোধ ভঙ্গিতে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। তার ভাবভঙ্গির সঙ্গে আমার এত পরিচয় আছে যে, তার হঠাৎ এভাবে বেরিয়ে যাওয়াতে আমি কিছু মনে করলাম না। তার সদাসক্রিয় বুদ্ধি হয়তো আকস্মিক কোনও সূত্রের খোঁজ পেয়েছে, আর তার তদন্ত করার জন্যই যে সে এভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, তাতে আমার কোনও সন্দেহ থাকল না।

ঘরে একা পড়ে আছি, শেল্‌ফগুলোর দিকে ইতস্তত তাকাতে থাকলাম। কাচের ছোট-ছোট জার, তাতে আছে ধুলোমাটির মতো কিছু পদার্থ। লেবেল দেওয়া আছে, 'ফুটপাত ও রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া জিনিস।' লন্ডন ও শহরতলির প্রধান-প্রধান রাস্তা থেকে এগুলো সংগৃহীত। লেখা আছে, 'পদচিহ্ন শনাক্ত করার জন্য এগুলো কাজে লাগবে।' আরও অনেক জার আছে। আলাদা আলাদা লেবেল : 'বাস ও রাস্তার মোটগাড়ির আসন থেকে পাওয়া টুকরো-টাকরা জিনিস', 'সাধারণ জায়গা থেকে পাওয়া ম্যাটিং-এর নারকোলের ছোবড়া ও দড়ির সুতো', 'প্যালেস থিয়েটারের এক নং সারির এক থেকে ৫০ নং আসনের মধ্যে মেঝে থেকে কুড়নো

সিগারেটের টুকরো ও পোড়া দেশলাই কাঠি।' বিস্ময়কর এই মানুষটির নিখুঁত কর্মপদ্ধতির প্রমাণ সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

এভাবে মগ্ন হয়ে সব দেখছিলাম, এমন সময় দরজা খোলার সামান্য একটু শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি একটা অচেনা লোক ঘরে ঢুকেছে। কাঠখোট্টা চেহারার একটা লোক, গায়ে ময়লা ওভারকোট ও আরও নোংরা একটা মাফলার ওর গলায় জড়ানো। মাথায় টুপি। বেশ বিরক্ত হয়েই এই অনধিকার প্রবেশকারীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। ভুল করে ঘরে ঢুকে পড়েছি— কর্কশ গলায় ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে কথাটা বলেই লোকটা বেরিয়ে যাওয়ার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিল। তখনই তার পিছু নিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে দেখি লোকটা চটপট নেমে, মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেল।

আমার মাথায় চুরির কথাই ঘুরছে, তাই এই ঘটনায় একটা কথাই মনে হল। আমি আমার বন্ধুর স্বভাবটা জানি। গভীর অনুপ্রেরণার মুহূর্তে সে তড়িঘড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা শুধু কোনও একটা বিষয়কে নিয়েই এত মেতে ওঠে যে, তখন খুব সম্ভবত সে তার নিজের জিনিসপত্রের দিকে আর মন দিতে পারে না। তাই, এমনকী ড্রয়ারে চাবি দেওয়ার মতো সাদামাঠা ব্যাপারটাও তার মনে থাকে না। বারদুয়েক চেষ্টা করে দেখলাম, আমার কথাটাই ঠিক। তবে একটা ড্রয়ার কী কারণে জানি না, পুরো খুলতে পারলাম না। হ্যান্ডেলটা চ্যাটচ্যাট করছে। যেন কেউ নোংরা হাতে ওগুলো খুলেছিল। পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে হেমলক বেশ খুঁতখুঁতে জানি। তাই কথাটা ওকে জানিয়ে রাখব ভেবেছিলাম। কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। হায়! তারপর—। যাই হোক, আগের কথাটা আগেই বলে নেওয়া যাক।

আশ্চর্যের কথা, ওর ফিরতে বেশ দেরিই হচ্ছিল। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে থাকতে-থাকতে নিবিড় উষ্ণতায় ও জানালার কাচে বৃষ্টির শব্দে একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হয়তো স্বপ্ন দেখছিলাম। ঘুমের মধ্যে আধা অচেতন অবস্থায় মনে হল কে যেন আলতোভাবে আমার পকেটে হাত ঢোকাতে চাইছে। সন্দেহ নেই, চুরির কথাটা তখনও আমার মন থেকে যায়নি। পুরোপুরি যখন চেতনা ফিরে এল, আমি দেখলাম হেমলক জোন্‌স অন্যদিকে বসে আছে। গভীর চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের আগুনের দিকে।

"তুমি খুব ঘুমোচ্ছ দেখে তোমাকে আর ঘুম থেকে ওঠাতে চাইনি।" সে হেসে বলল।

আমি চোখ কচলে বললাম, "খবর কী? খোঁজ পেয়েছ?"

"যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে ভাল," সে বলল, "আমার মনে হয়..." নোটবুকে টোকা দিয়ে আরও জানাল, "তোমার কাছে আমি ঋণী।"

খুব খুশি হয়ে তার কাছ থেকে আরও শোনার অপেক্ষায় রইলাম। কিন্তু বৃথা। আমার মনে রাখা উচিত ছিল, মেজাজ ভাল থাকলে হেমলক জোন্‌স তেমন কথাবার্তা বলে না। অদ্ভুত একটা লোক ঘরে ঢুকে পড়েছিল, তাকে স্রেফ এই কথাটা বলতে সে শুধু হাসল।

পরে, আমি যখন যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম, সে খেলাচ্ছলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার কোটের হাতার ভেতর দিকে ছোট-ছোট খয়েরি কিছু লোম লেগে আছে। শিলের চামড়ায় এই লোম থাকে। শিলের চামড়ার থলি তুমি যদি শক্ত হাতে ধরে থাকো, তা হলে কোটের ওই জায়গায় লোম লাগতে পারে।

"অন্তত এই একবার তোমার ভুল হল" বিজয়ীর ভঙ্গিতে আমি বললাম, "তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারবে ওগুলো আমারই মাথার চুল। চুল কেটেছি, তখন ওই হাতটা অ্যাপ্রনের বাইরে ছিল।"

ভুরু কুঁচকে সে তাকাল, তবু আমি ঘুরে দাঁড়াতেই সে আমাকে আলিঙ্গন করল।

বরফের তৈরি এরকম একটা মানুষের কাছে কদাচ আমি এটা আশা করি। সে এমনকী আমাকে ওভারকোটটা পরতেও সাহায্য করল। আমার পিঠ চাপড়ে বলল, "আবার এসো, তাড়াতাড়ি।"

"যে-কোনও সময়, সবসময় আমি আছি।" উৎসাহের সঙ্গে বললাম। "আমার অফিসে দশ মিনিট করে দু'বার শুধু খাওয়ার সময় নিই। রাত্রে ঘুমোই চার ঘণ্টা। আমার বাদবাকি সময় সবটাই তো তোমার জন্য, তুমি তো জানো।"

"সত্যিই তাই।" সে বলল। তার মুখে সেই দুর্বোধ হাসি।

যাই হোক, এরপর যখন গেলাম তখন সে বাড়ি ছিল না। একদিন বিকেলে তাকে ছদ্মবেশে যেতে দেখলাম। দেখলাম কাছের একটা বন্ধকী জিনিসপত্রের দোকানের জানালায় উঁকিঝুঁকি মারছে। আমার পরামর্শ যে সে গ্রহণ করেছে দেখে খুশি হলাম, এবং মনের খুশিতে, সাহস করে তাকে চোখ টিপলাম; পালটা সেও চোখ টিপল, তবে অচেনা ভঙ্গিতে।

দু'দিন পরে তার চিরকুট পেলাম, তার বাসায় সেদিন রাত্রে সে আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। সেই দেখা, হায়। আমার জীবনের সে এক স্মরণীয় ঘটনা, আর হেমলক জোন্‌সের সঙ্গেও সেই আমার শেষ দেখা। ঠাণ্ডা মাথায় পুরো ঘটনাটা আমি বর্ণনার চেষ্টা করব, তবে সেই স্মৃতি মনে পড়লে এখনও নাড়ি চঞ্চল হয়ে ওঠে।

আমি দেখলাম, সে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দৃষ্টি, যা তার সঙ্গে আলাপের পর মাত্র একবার কি দু'বার দেখেছি। কঠিন, কঠোর যুক্তি, তর্ক বিশ্লেষণে যে দৃষ্টি থেকে মানবিক সব গুণ, মায়া, মমতা সহানুভূতি অন্তর্হিত হয়েছে। সে তখন হিমশীতল, বীজগণিতের একটা প্রতীক মাত্র। বস্তুত, তার সমস্ত সত্তা তখন এমনই ঘনীভূত যে, তার পোশাক শরীরের সঙ্গে ঢিলে হয়ে গেছে, মানসিক চাপে তার মাথার আকার এত ছোট হয়ে গেছে যে, টুপিটা কপাল থেকে পেছনে সরে গিয়ে বড় দুটো কানের সঙ্গে আক্ষরিক অর্থে ঝুলে আছে।

আমি ঘরে ঢোকার পর সে দরজায় চাবি বন্ধ করে দিল, বন্ধ করে দিল জানালা, এমনকী চিমনির সামনে একটা চেয়ার রাখল। গভীর আগ্রহ নিয়ে যখন আমি তাৎপর্যপূর্ণ, সতর্কতামূলক এই ব্যবস্থাগুলো লক্ষ করছি, তখন সে হঠাৎ একটা রিভলভার বের করে আমার কপালে ঠেকিয়ে ঠাণ্ডা, নিচু গলায় বলল, "চুরুটের বাক্সটা দাও।"

বিভ্রান্ত অবস্থাতেও আমার উত্তরটা ছিল

সত্য, স্বতঃস্ফূর্ত ও অযাচিত। আমি বললাম, "আমি ওটা পাইনি।"

সে তিক্তভাবে হাসল, রিভলভারটা ছুড়ে ফেলল। "এই উত্তরই আমি আশা করেছিলাম। তা হলে এবার তোমাকে ওই মারাত্মক অস্ত্রের চেয়েও তোমার অপরাধের আরও ভয়ঙ্কর, আরও বিরামহীন ও বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিনিষ্ঠ প্রমাণের মুখোমুখি আমি দাঁড় করাব।" সে পকেট থেকে জড়ানো একখণ্ড কাগজ ও নোটবুক বের করল।

"তুমি নিশ্চয়," আমি খাবি খেতে-খেতে বললাম, "রসিকতা করছ। তুমি এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করো না—"

"চুপ করো!" সে গর্জন করে উঠল, "বোসো।"

আমি তার নির্দেশ মান্য করলাম।

"তুমি নিজেই নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছ," নির্মম গলায় সে বলতে থাকল, "নিজেকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছ আমার পদ্ধতির কাছে—পদ্ধতিগুলো তোমার পরিচিত, তুমি ওগুলোর প্রশংসা করো, বছরের-পর-বছর তুমি ওগুলো মেনে নিয়েছ! প্রথম যেদিন তুমি চুরুটের বাক্সটা দেখলে সেই দিনটার কথায় আমরা ফিরে যাব। তোমার অভিব্যক্তি," সে শীতল, পরিকল্পিত স্বরে, নিজের কাগজটা দেখে বলল, "ছিল: 'কী সুন্দর! জিনিসটা যদি আমার হত।' অপরাধে সেই তোমার প্রথম পদক্ষেপ, এবং আমার প্রথম ইঙ্গিত। 'জিনিসটা যদি আমার হত' থেকে 'জিনিসটা আমি নেবই', এবং নিছক খুঁটিনাটি 'কী করে জিনিসটা আমি পাব', এগিয়ে যাওয়াটা স্পষ্ট। চুপ! কিন্তু আমার যুক্তিতে অপরাধের সাঙ্ঘাতিক একটা প্ররোচনা থাকে, সামান্য একটা জিনিসের জন্য তোমার বিশ্রী প্রশংসাটাই প্ররোচনা হিসেবে যথেষ্ট নয়। তুমি চুরুট খাও।"

"কিন্তু," আমি আন্তরিকভাবে বলে উঠলাম, "আমি তোমাকে বলেছি, চুরুট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

"নিবোধ!" ঠাণ্ডা গলায় সে বলল, "এই দ্বিতীয়বার তুমি নিজে ধরা দিলে। হ্যাঁ, তুমি বলেছ। অভিযোগ যাতে না ওঠে, তার জন্য এরকম পূর্বপ্রস্তুত, অযাচিত বিবৃতি দেওয়া ছাড়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক আর কীই বা হতে পারে! তবু, আমি আগেই বলেছি, তোমার মতলবটা গোপন করার জন্য এই জঘন্য চেষ্টাটাও যথেষ্ট নয়। আমাকে খুঁজে বের করতে হবে কী সেই দুর্দান্ত মোটিভ যা তোমার মতো লোককেও প্ররোচিত করেছিল। ওই মোটিভ আমি খুঁজে পেয়েছি যার মধ্যে, তাকে বলা হয় কামনা। সবচেয়ে জোরালো আবেগ হচ্ছে ভালবাসা, আমার মনে হয় তুমিও তা স্বীকার করবে," সে তিক্ত গলায় কথাটা বলল, "সেই রাত্রে তুমি এসেছিলে! তুমি তোমার জামার হাতায় নিয়ে এসেছিলে অকাট্য সব প্রমাণ।"

"কিন্তু," আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম।

"চুপ," তার বজ্রনির্ঘোষ। "আমি জানি তুমি কী বলবে। তুমি বলবে, শিলের চামড়ার থলি হাতে কোনও লোককে তুমি যদি আলিঙ্গন করো, তার সঙ্গে চুরির সম্পর্ক কী! তা হলে বলি, শিলের চামড়ার ওই থলিই বুঝিয়ে দিচ্ছে তুমি কী মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েছ। হালকা, বিনোদন-সাহিত্যের সঙ্গে তোমার যদি আদৌ পরিচয় থাকে তা হলে তোমার জানা উচিত, নোংরা স্বার্থপ্রসূত ভালবাসারই পরিচায়ক শিলের চামড়ার থলি। তুমি এর জন্য তোমার মানমর্যাদা বিকিয়ে দিয়েছ—চুরি-যাওয়া চুরুটের বাক্সই ওই শিলচামড়ার থলিটার দাম। টাকা পয়সা নেই, পসারও কমে যাচ্ছে। এই অবস্থায় এটাই ছিল একমাত্র উপায়, যা দিয়ে ভালবাসার মানুষটির কাছ থেকে তুমি তোমার প্রতিদান পেতে পারতে। তোমার কথা ভেবেই আমি তাঁর বিষয়ে খোঁজখবর নিইনি। চুপ! তোমার মোটিভটার বিষয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার পর এবার আসি তুমি কীভাবে অপরাধটা করলে সেই প্রসঙ্গে। সাধারণ লোকেরা ওভাবেই শুরু করত, চুরি যাওয়া জিনিসটা কোথায় গেল, তা আবিষ্কারের চেষ্টা করত। এগুলো আমার পদ্ধতি নয়।"

এমনই সুতীক্ষ্ণ তার যুক্তি যে, আমি নিজেকে নিরপরাধ জানলেও আমার অপরাধের সহজ-সরল উদ্ঘাটনের আরও খুঁটিনাটি বিবরণ জানার জন্য উৎকণ্ঠায় আমি আমার ঠোঁট কামড়াতে থাকলাম।

"যে রাত্রে আমি তোমাকে চুরুটের বাক্সটা দেখিয়েছিলাম, আর তারপর বাক্সটা অন্যমনস্ক হয়ে ওই ড্রয়ারে রেখে দিয়েছিলাম, সেই রাত্রেই তুমি ওটা চুরি করেছিলে। ওই চেয়ারে তুমি বসে ছিলে, আর ওই শেলফ থেকে কিছু একটা নেওয়ার জন্য আমি উঠে গিয়েছিলাম। চেয়ার থেকে না উঠেই তৎক্ষণাৎ তুমি তোমার চোরাই জিনিসটা হাতিয়ে নিয়েছিলে। চুপ! মনে পড়ে, সেই রাত্রে যখন আমি তোমাকে ওভারকোটটা পরতে সাহায্য করেছিলাম? বিশেষ করে

আমি তোমার হাত দুটো কোটের হাতায় ঢোকাতে সাহায্য করেছিলাম। সেই সময় স্প্রিংয়ের টেপ দিয়ে আমি তোমার কাঁধ থেকে হাত পর্যন্ত মেপে নিয়েছিলাম। পরে তোমার দর্জির কাছে গেলে সে ওই একই মাপ আমাকে দিয়েছিল। তোমার চেয়ার ও ওই ড্রয়ারটার মাঝখানের সঠিক দূরত্বই এটা প্রমাণ করছে।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম।

"বাকিটা আমার সিদ্ধান্তেরই পক্ষে নিছক খুঁটিনাটি কিছু বিবরণ। তোমাকে আবার ড্রয়ারটা নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে দেখেছি। কথা বলার চেষ্টা কোরো না। অচেনা যে লোকটা মাফলার গলায় জড়িয়ে ভুল করে ঘরে ঢুকে পড়ে ছিল সে আসলে আমিই। আরও বলে রাখি, আমি ইচ্ছে করে তোমাকে একা ঘরে রেখে যাওয়ার সময় ড্রয়ারের হ্যান্ডেলে সাবান লাগিয়ে রেখেছিলাম। সাবানটা ছিল তোমার হাতে, যাওয়ার আগে যখন তোমার করমর্দন করে গেলাম। তুমি যখন ঘুমিয়ে ছিলে, তখন আরও কিছু ঘটেছে কি না জানার জন্য তোমার পকেটগুলো আলতো করে ছুঁয়ে দেখেছিলাম। তুমি যখন আমার ঘর থেকে যাচ্ছ, সেই সময় তোমাকে

আলিঙ্গন করেছিলাম, যাতে তুমি তোমার শরীরে লুকিয়ে চুরুটের বাক্স বা অন্য কোনও জিনিস নিয়ে যাচ্ছ কি না, তা অনুভব করতে পারি। যেভাবে এবং যে জন্য তুমি জিনিসটা ইতিমধ্যেই হাতছাড়া করেছিলে বলে তোমাকে জানিয়ে দিয়েছি, তার পক্ষে আমার ধারণাটার সমর্থন আমি এভাবেই পেয়ে গিয়েছিলাম। তখনও আমার বিশ্বাস ছিল, তুমি দুঃখ প্রকাশ করবে, অপরাধ স্বীকার করবে। তোমার রাস্তাতেই দু'বার তোমাকে দেখা দিয়েছিলাম। প্রথমবার সফররত এক নিগ্রোর ভূমিকায়, দ্বিতীয়বার, এক বন্ধকী দোকানের জানালায় যখন আমি উঁকিঝুঁকি মারছিলাম। ওই দোকানেই তুমি তোমার চোরাই জিনিসটা বিক্রি করেছ।"

"কিন্তু," আমি ফেটে পড়লাম, "বন্ধকের সেই কারবারীকে জিজ্ঞেস করলে তুমি দেখতে কী অন্যায়—"

"নির্বোধ!" সে তীক্ষ্ণ গলায় বলল, "তুমি পরামর্শ দিয়েছ বন্ধকের কারবারীর কাছেখোঁজ নিতে। তুমি কি ভেবেছ আমি তোমার কোনও পরামর্শ গ্রহণ করেছি— চোরের পরামর্শ? বরং তোমার পরামর্শগুলো আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, আমি কী কী এড়িয়ে চলব?"

"আমার ধারণা," তিক্তগলায় আমি বললাম, "তুমি এমনকী ড্রয়ারটাও খুঁজে দ্যাখোনি।"

"না," সে শান্তভাবে বলল।

সত্যি বলতে কী, সেই প্রথম বিরক্ত হলাম। সবচেয়ে কাছের ড্রয়ারটায় গিয়ে তখনই টান দিলাম। আগের মতোই আটকে গেল, ড্রয়ারের কিছুটা অংশ খুলল না। চেষ্টাচরিত্র করে অবশ্য দেখলাম ভেতর থেকে আটকে যাচ্ছে, ড্রয়ারের ওপরের দিকে কিছু একটা জিনিস ড্রয়ারটাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে। হাত ঢুকিয়ে সেই জিনিসটাকে বের করে আনলাম। সেই চুরি-যাওয়া চুরুটের বাক্স। আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠে তার দিকে ফিরে তাকালাম।

কিন্তু তার মুখভঙ্গি দেখে বিব্রত হতে হল। সুতীক্ষ্ণ, মর্মভেদী দৃষ্টির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে ঘৃণা। "আমার ভুল হয়েছে," সে আস্তে-আস্তে বলল। "আমি তোমার দুর্বলতা ও কাপুরুষতাটাকে আমল দিইনি। এমনকী তোমার অপরাধ সত্ত্বেও তোমার সম্পর্কে আমার ধারণাটা ছিল উঁচু; এখন বুঝতে পারছি সেই রাত্রে ড্রয়ারটাকে নিয়ে তুমি কেন কেরামতি করছিলে। অবিশ্বাস্য কোনও উপায়ে— সম্ভবত আবার চুরি করেই তুমি চুরুটের বাক্সটাকে দোকান থেকে নিয়ে এসে চাবুক-খাওয়া কুকুরের মতো সেটাকে এমন বিশ্রীভাবে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছ। তুমি ভেবেছিলে আমাকে, হেমলক জোন্‌সকে প্রতারণা করবে! আরও বড় কথা, আমার অভ্রান্ত থাকার গৌরবটাকেই তুমি ধ্বংস করতে চেয়েছিলে। যাও, আমি তোমাকে ছেড়ে দিলাম। পাশের ঘরে যে তিনজন পুলিশ অপেক্ষা করছে আমি আর তাদের ডেকে পাঠাব না। যাও, চিরদিনের মতো আমার দৃষ্টির বাইরে চলে যাও।"

তখনও হতচকিত আমি পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে আমার কান ধরে হলঘরে বের করে দিয়ে আমার মুখের ওপর তার ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। দরজাটা আবার খুলে সে আমার টুপি, ওভারকোট, ছাতা, জুতো সব আমার সামনে ছুড়ে দিল। তারপর দরজাটা আমার কাছে বন্ধ হয়ে গেল চিরদিনের জন্য।

আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। বলতে বাধ্য, এরপর অবশ্য আমার পসার বেড়েছে, আমার পুরনো প্র্যাকটিসের অনেকটাই আবার ফিরে পেয়েছিলাম, আমার রোগীরাও অনেকে সুস্থ হয়ে উঠেছিল। আমি ধনী হয়ে উঠলাম। আমার এক-ঘোড়ার একটা গাড়ি ও বাড়ি ছিল ওয়েস্ট এন্ডে। তবু প্রায়ই সেই বিস্ময়কর মানুষটির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির কথা মনে পড়ে যায়, ভাবি অসতর্ক মুহূর্তে সত্যিই যদি তার চুরুটের বাক্সটা চুরি না করতাম!

কাহিনী-সূত্র :

ফ্রান্সিস ব্রেট হার্ট-এর 'দ্য স্টোলেন সিগার-কেস' গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০০-এর ডিসেম্বরে, 'পিয়ারসন্‌স' পত্রিকায়। এলেরি কুইন বলেছেন, শার্লক হোম্‌সের যত প্যারডি হয়েছে, তার মধ্যে ব্রেট হার্টের এই গল্পটিই শ্রেষ্ঠ। হার্টের গোয়েন্দা হেমলক জোন্‌স। শার্লক হোম্‌সের প্যারডি করে আরও যেসব চরিত্র বিভিন্ন লেখকরা সৃষ্টি করেছেন, তাদের নাম থিনলক বোন্‌স, শ্যামরক জোন্‌স, শার্লক কন্থস, সোলার পন্‌স, হোমলক সিয়ার্স ও পিকলক হোম্‌স। শার্লক হোম্‌সের প্যারডি করে গল্প লিখেছেন অগস্ট ডারলেথ, আগাথা ক্রিস্টি, অ্যান্টনি বাউচার, এলেরি কুইন, জেম্‌স বারি, মার্ক টোয়েন এবং ও হেনরি।

অনুবাদ : দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ক্যাম্পাস

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম : ৫০ বছরের সাধনা

পড়াশোনার পাশাপাশি মানুষের সেবা— এই পবিত্র ব্রতই নরেন্দ্রপুরের রামকৃষ্ণ মিশনকে মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। লিখেছেন মণিশঙ্কর দেবনাথ

মাত্র তিনজন ছাত্র। মাথার ওপর কোনও রকম একটা ছাদ। আর কয়েকজন নিষ্ঠাবান বিদ্যোৎসাহী মানুষ। ব্যস, মূলধন বলতে এটুকুই। আজ থেকে ৫০ বছর আগে আজকের সুবিখ্যাত নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের শুরুটা এরকমই।

আগে উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আজকের নরেন্দ্রপুরের কর্মযজ্ঞের ভিত্তিভূমি। সেটা ছিল ১৯৪৩ সাল। দেশ জুড়ে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ। এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা পায়নি ছোট পড়ুয়ারাও। তাদের পড়াশোনার পাট প্রায় চুকে যাওয়ার জোগাড়। ঠিক সেই সময়ে দৈব-আশীর্বাদের মতো এগিয়ে এসেছিলেন রাসবিহারী মল্লিক নামে উদার হৃদয়ের একজন মানুষ। অসহায় ছাত্রদের কথা ভেবে দান করলেন তাঁর পাথুরিয়াঘাটার বাড়িটি। সঙ্গে কিছু টাকাও। ব্যস, শুরু হয়ে গেল মহাকর্মযজ্ঞ। মানুষ তৈরি করার মহান যজ্ঞ।

গোড়ার দিকের ১০ বছরে ছাত্রসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৬০-এ। রাসবিহারীবাবুর বাড়িটি ছিল তিনতলা। ওই জায়গায় ছাত্রদের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। রাসবিহারীবাবুর ওই বাড়িতে আরও তিনটি তলা তৈরি করা হল। ১৯৫৩ সালে পাশের ২০নং যদুলাল মল্লিক রোডের বাড়িটিও কিনে নিলেন কর্তৃপক্ষ। ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, অতএব জায়গা চাই। পড়াশোনা করার জন্য চাই আদর্শ পরিবেশ। প্রকৃতির নিবিড় সংযোগে গড়ে তুলতে হবে ছাত্রদের মনোভূমি। সেটা ছিল ১৯৫৬ সাল। উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার দীর্ঘদিনের বাস উঠিয়ে চলে এল দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরে। ৩৩ একর জমির ওপর তৈরি হল ছাত্রাবাস। পরে অবশ্য আরও জমি কেনা হল। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৭ সালে পাথুরিয়াঘাটার ছাত্রাবাসটি সরিয়ে আনা হল। ছেদ ঘটল পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গে শেষ যোগসূত্রটির। নরেন্দ্রপুর স্কুলটির উদ্বোধন হল ১৯৫৯ সালে। প্রথম বছর ৯৯ জন ছাত্র ছিল স্কুলে। তখন হায়ার সেকেন্ডারি/মাল্টিপারপাস স্কুল ছিল এটি। স্কুলের জন্য প্রধানশিক্ষক এবং সহশিক্ষকদের

সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ

প্রাণান্তকর পরিশ্রমের শেষ ছিল না। ওই ৯৯ জন ছাত্রের মধ্যে ৭২ জনই ছিল শরণার্থী পরিবারের। তাদের যাবতীয় জিনিসপত্র স্কুল-কর্তৃপক্ষকে দিতে হয়েছিল। ১৯৬০ সালে স্নাতকস্তর চালু হয়। ওই বছর স্কুল, ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি এবং কলেজ পুরোদমে শুরু হয়ে যায়। পরে নানা বৃত্তিমূলক পড়াশোনা, গ্রামসেবক বৃত্তি, জুনিয়ার টেকনিক্যাল স্কুল ইত্যাদি সংযোজিত হতে থাকে।

সেদিনের সেই ছোট্ট স্কুলটির ছাত্রসংখ্যা এখন ৭৬০ থেকে ৭৬৫ জন। আয়তন বেড়ে গিয়েছে বহুল পরিমাণে। স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন শুধু পুঁথিপত্রের মধ্যে ছাত্ররা সীমাবদ্ধ থাকবে না। তারা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতার পাশাপাশি স্বাবলম্বী হতে হবে। ভালবাসতে হবে মানুষকে। সৎ, সত্যবাদী, কর্তব্যনিষ্ঠ সুনাগরিক গড়ে তোলাই এই স্কুলের লক্ষ্য। এ-ব্যাপারে শিক্ষক, সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বিশাল এই কর্মযজ্ঞের পুরোধাপুরুষ, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক ও বর্তমান সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ কৃতিত্বের সিংহভাগ সহকর্মীদের দিতে চান। "সে একটা দিন গেছে। দিনরাত খেয়াল নেই। সারাদিন ছুটোছুটি করছি। কীভাবে সময় কেটে গেল, আমি নিজেই জানি না। হিসেব কষতে গিয়ে দেখি কবেই ৫০ বছর পার করে এসেছি।" ৫০ বছর পূর্তি উৎসবের প্রাক্কালে স্মিতহাস্য স্বামীজি বললেন, "আদর্শ ছাড়া মানুষ হয় না। একজন মানুষের মধ্যে আদর্শ থাকতে হবে। প্রকৃত মানুষ তৈরির জন্য আমাদের চেষ্টার শেষ নেই।"

ছাত্ররা ব্যবহারিক জীবনে সফল হবে, এটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের কৃতিত্বের ওপর। পরিস্থিতি অনুযায়ী চলতে পারলে সফল হওয়া কোনও সমস্যা নয় বলে তিনি মনে করেন। "সত্যি বলতে কী, যখন প্রধানশিক্ষক ছিলাম তখন বয়স ছিল কম, একটা জেদ ছিল। গোটা ব্যাপারটাই আমার কাছে ছিল একটা চ্যালেঞ্জের মতো।"

প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক বলছিলেন, "গত ৫০ বছরে বহু ছাত্রকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তাদের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়েছি। ছাত্রদের অনেকেই অত্যন্ত কৃতী। দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই স্কুলের প্রায় ২০০ জন ছাত্র নানা সম্মানজনক পদে কাজ করছেন।"

তিনটি আবাসিক ছাত্র নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটির শুরু হয়েছিল, সেই প্রতিষ্ঠানে এখন শুধু সাড়ে সাতশোরও বেশি ছাত্র পড়ছে যে তাই নয়— কারিগরি, বৃত্তিমূলক, এমনকী শ্রমিকদের স্কুলও তৈরি হয়েছে এ-ক'বছরে। রয়েছে নাইট স্কুলও। এই স্কুলে ৩৫০ টি শিশু পড়ে। সম্পূর্ণ বিনা বেতনে। আর গোড়ার দিকের ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমিও চলছে পুরোদমে। ৫০ বছর পূর্তিতে মানুষ গড়ার ব্রত নিয়ে উত্তরোত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই এখন এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।

ফোটো : চন্দন ঘোষ

অরণ্যদেব

লি ফক

১৩শ শতাব্দী : ভয়ঙ্কর মোঙ্গল যোদ্ধারা প্রায় গোটা পৃথিবী জয় করেছিল ...

...পরাক্রান্ত মোঙ্গল সম্রাট চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে ...

৫০০ বছর পরে ... ১৮শ শতাব্দী ... তাঁর বংশধর ঝাটুন খানের শাসনে বিরাট সাম্রাজ্যের এক অংশ ।
আমার পূর্বপুরুষ ছোট একটা গ্রাম থেকে পৃথিবী জয় করেছিলেন ... আমি পারব না কেন ?

কুয়াশাচ্ছন্ন পাহাড়ের ওপাশে খোঁজ নিতে তিনি হানাদার পাঠালেন ...

!!

উর্বর জমি, পশু, মানুষ, অরণ্য ...
মানুষ ! আমার সাম্রাজ্য গড়ার দাস !

দাস সংগ্রহের হামলা শুরু

অষ্টম অরণ্যদেব ঢাক মারফত খবর পেলেন ... ১৭২৫
হানাদার ... মানুষ চুরি করছে ... অরণ্যদেব ... বাঁচান ...
?!

অরণ্যদেব লি ফক

মোঙ্গল হানাদার ... অরণ্যের যুবক আর যুবতীদের বেছে নিচ্ছে ...
শিশু আর বৃদ্ধদের ছেড়ে দিচ্ছে, অথবা ...
!
!

১৮শ শতাব্দী : ভাতুন ধাতুনের হানাদাররা অরণ্য থেকে দাস ধরে নিয়ে যাচ্ছে ...
গ্রামগুলি, আর যারা পড়ে রইল তাদের নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করছে ...

ঢাকের ভাষা গভীর অরণ্যে খবর পৌঁছে দিচ্ছে ...
অরণ্যদেব বাঁচান ... হানাদাররা চুরি করছে ... খুন করছে ...

খুলিগুহায় ... খুলিসিংহাসনে ....
বাবা, দয়া করে আমাকে সঙ্গে নাও।
না, কিট-৪। তুমি এখানে থেকে মাকে দেখবে।

১৭২৫ : অষ্টম অরণ্যদেব ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন....

চলমান অশরীরী ... হানাদাররা ওইদিকে ...
ক্রমশ

গোয়েন্দা গল্প

আশিস সান্যাল

বুবাই

রঙপো ! কী সুন্দর নামটি। চারদিকে সারি-সারি তুঁতে রঙের পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকা ঝাপসা মেঘ—কখনও ঝমঝম, কখনও টুপটাপ। পুবের কিনার ঘেঁষে ছুটে চলা তিস্তার অবিরাম ফোঁসফোঁস। অনেক দূর পর্যন্ত বাতাসে ভেসে যায় সেই শব্দ। অদ্ভুত ভাল লেগে গিয়েছিল জায়গাটা বুবাইয়ের।

মাত্র কয়েক ঘর মানুষের বসতি। দূরে পাহাড়ের গায়েও রয়েছে ছড়ানো-ছেটানো কয়েকটা বস্তি। কয়েকটা ছোট দোকানঘর নিয়ে গড়ে উঠেছে বাজার। বুধবার ও শনিবার হাট বসে। সেদিন অনেক দূরদূরান্ত থেকে লোক আসে। তা ছাড়া অন্যদিন সামান্য কিছু কেনাকাটা করে কাছাকাছি পাহাড়ি বস্তির মানুষরা।

তবে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসা-যাওয়ার পথে যখন যাত্রীবোঝাই বাস এসে থামে এখানে, তখন বেশ ভিড় জমে যায় দোকানে-দোকানে। চায়ের দোকানে তো রীতিমত লাইন পড়ে যায়। মালবাহী লরিকেও থামতে হয় এখানে কিছুক্ষণের জন্য। তখন লরির লোকেরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। যারা টেম্পো বা প্রাইভেট গাড়িতে যাওয়া-আসা করে, তাদেরও কিছুক্ষণ থামতে হয় এখানে। সব মিলিয়ে বেশ জমজমাট জায়গাটা।

আসলে জায়গাটা সিকিম থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রবেশপথ। সিকিমের শেষ, পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জনস্থান। তাই রয়েছে চেকপোস্ট। সারাক্ষণ টহল দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আবগারি দফতরের অফিসাররা সর্বদাই তৎপর।

বুবাই এসেছে তার মামার বাড়ি বেড়াতে। এই তার প্রথম মামার বাড়ি আসা। মামা ও মামিমা বহুবার আসার জন্য লিখেছেন। কিন্তু কিছুতেই আসা হচ্ছিল না। হয় স্কুলের পরীক্ষা, নয়তো নিয়ে আসার লোকের অভাব। এবার একটা সুযোগ হয়ে গেল। বাবার এক বন্ধু যাচ্ছিলেন গ্যাংটক, বিশেষ দরকারে। বাবার অনুরোধে রাজি হয়ে গেলেন তিনি। মামাকে চিঠি লিখে সব জানিয়ে রেখেছিলেন বাবা। তাই কোনও অসুবিধেই হয়নি। বাস থেকে নামতেই মামা প্রায় ছুটে এলেন।

"বুবাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"সকাল থেকে আমি অপেক্ষা করে আছি। আজ বাস আসতে বেশ দেরি হয়েছে।"

বাবার বন্ধু বুবাইকে মামার হাতে তুলে দিয়ে যেন স্বস্তি পেলেন। ফেরার পথে এখানে দু'দিন থেকে যাবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার গিয়ে বসেছিলেন বাসে। মামার হাত ধরে বুবাই এসে উঠেছিল বাড়িতে।

প্রায় একবিঘে জমি নিয়ে মামার বাড়ি। তিনটি বড়-বড় চারচালা বিশাল টিনের ঘর। ঘরগুলির দেওয়াল অবশ্য ইটের। মেঝে সিমেন্ট করা। ঘরের আসবাবপত্র সব আধুনিক। টিভি, ফ্রিজ, টেলিফোন—সবই আছে বাড়িতে। দেশভাগের পর নানা জায়গায় ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে-ঘুরতে শেষ পর্যন্ত এখানেই আস্তানা গেড়েছেন মামা। শুরু করেছিলেন একটা ছোটখাটো কাঠের ব্যবসা দিয়ে। সে প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর আগের কথা। এখন সেই কাঠের ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে বেশ বড় হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে রঙপোর এখন তিনিই সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

এত বড় বাড়িতে লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। মামা-মামিমা ছাড়া রয়েছে একজন সারাক্ষণের কাজের লোক। এ ছাড়া বাইরের দিকের বড় ঘরটায় রাতে ঘুমোতে আসে একটি ভুটিয়া ছেলে। দিনে সে কাজ করে মামার কাঠের দোকানে। একটা হোটেলের সঙ্গে মাসিক বন্দোবস্ত আছে খাওয়াদাওয়ার। রাতে প্রায়ই বাড়িতে ফেরে অনেক দেরিতে। ফিরেই ট্রানজিস্টারে জোরে হিন্দি গান চালায়। মামার একমাত্র সন্তান সুনীল থাকে আমেরিকায়। ভাল চাকরি করে সেখানে। কোনওদিন দেশে ফিরবে কি না সন্দেহ ! মামা-মামিমার সব থেকেও যেন কিছু নেই। সবকিছুই কেমন যেন একঘেয়ে।

এই একঘেয়ে জীবনযাত্রার মধ্যে বুবাই আসাতে যেন কিছুটা বৈচিত্র্যের সঞ্চার হল। মামিমা প্রায় সব সময় ব্যস্ত থাকেন বুবাইকে নিয়ে। মামাও ফিরে আসেন দোকান থেকে তাড়াতাড়ি। সবাই মিলে গল্প-গুজব করেন অনেক রাত পর্যন্ত।

এভাবে বেশ কয়েক দিন কেটে গেল বুবাইয়ের। এখন মাঝেমধ্যে বিকেলের দিকে বেড়াতে যায় এদিক-ওদিক। তিস্তার পাড়ে বসে দেখে দূরের পাহাড়চূড়ায় মেঘের এলোমেলো বিচরণ। সেদিনও বিকেলে তিস্তার পাড়ে বসে ছিল বুবাই। আকাশটা ছিল সেদিন ঝকঝকে পরিষ্কার। পড়ন্ত বেলার সোনালি রোদ্দুর তিস্তার বুকে ছিটকে পড়ে চিকচিক করছিল।

কেমন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল বুবাই। খেয়ালই ছিল না, কখন আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারদিক। কখন আকাশ সাঁতার-ক্লান্ত পাখিদের কিচিরমিচির শব্দে ভরে গিয়েছিল। যখন খেয়াল হল, তখন আকাশে মিটমিট করে জ্বলতে শুরু করেছে অজস্র তারা।

দ্রুত বাড়ির দিকে পা বাড়াল বুবাই। একটা পাহাড়ি গলিপথ অতিক্রম করে সবে বড় রাস্তায় পা দেবে, ঠিক তখনই একটা আর্ত চিৎকারে সে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু একবারই, তারপর আবার সব নিশ্চুপ। কিছুই সঠিক বুঝতে পারছিল না বুবাই। শব্দটা যেদিক থেকে এসেছিল, সেদিকে একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে বুবাই এগিয়ে চলল।

কিছুদূর পাহাড়ি গলিপথ ধরে এগিয়ে চলার পর একটা ছোট কুঁড়ে দেখতে পেল বুবাই। চুপিচুপি গিয়ে দাঁড়াল সেই কুঁড়ের সামনে। ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে বুবাই প্রায় শিউরে উঠল। ঘরের কোণে একটা নড়বড়ে টেবিলের ওপর মিটমিট করে জ্বলছে একটা তেলের বাতি। তার আবছা আলোয় দেখতে পেল বুবাই, ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে একটা রক্তাক্ত লাশ। তাকে ঘিরে বসে আছে পাঁচ-ছ'জন লোক। প্রত্যেকের হাতেই রিভলভার। সঠিক কিছু বুঝবার আগেই বুবাই শুনতে পেল একজন বলছে, "দিলাম শেষ করে। নইলে ফিরে গিয়ে সব জানিয়ে দিত পুলিশকে।"

"আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ ছিল লোকটাকে। কিন্তু ওকে ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তাই।"

"ঠিকই করেছিস। ওকে ছাড়া রুমটেক বৌদ্ধমন্দির থেকে মূর্তিটা সরানো ছিল অসম্ভব।"

"মূর্তিটার কত দাম হবে?"

"দশ লাখ তো বটেই।"

"দশ লাখ!"

"আশ্চর্য হচ্ছিস? জানিস মূর্তিটা কবেকার? ত্রয়োদশ শতকের তৈরি বিখ্যাত বৌদ্ধমূর্তি, নাম মৈত্রেয়। তিব্বতি শিল্পকলার দ্বারা প্রভাবিত। পুরো ব্রোঞ্জের। পৃথিবীর দুর্লভ শিল্পকলার অন্যতম।"

"এই লোকটাকে ম্যানেজ করেছিলে কীভাবে?"

"সে অনেক কথা। প্রায় ছ' মাস ধরে ঘুরেছি ওর পেছন-পেছন। বৌদ্ধমন্দিরের গোপন গুহাপথে ছিল ওর অবাধ যাতায়াত। লামারা সব বিশ্বাস করতেন ওকে।"

"তারপর?"

"একদিন কথায়-কথায় লোকটা আমাকে জানাল, তার লাখ-দুই টাকার দরকার। লাসায় যেতে হবে তাকে। সেখানে কয়েকটা অমূল্য পুঁথির সন্ধান পেয়েছে সে। তখনই বললাম যে, তাকে টাকাটার ব্যবস্থা করে দিতে পারি, যদি মৈত্রেয়-মূর্তিটা আমার হাতে তুলে দেয়।"

"লোকটা টোপ খেল?"

"না, ঠিক তা নয়।"

"তবে?"

"লোকটা চেয়েছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারতে। টাকাটাও নেবে অথচ মূর্তিটা হাতছাড়া করবে না।"

"কীভাবে?"

"খুব সহজ অঙ্ক। বৌদ্ধদর্শন ও শিল্পসাহিত্য নিয়ে গবেষণার সুবাদে মন্দিরের সবকিছু জানা ছিল তার। বৌদ্ধ পুরোহিতরাও সম্মান করতেন তাকে। মূর্তিটা সরানো তার পক্ষে মোটেই কঠিন কাজ ছিল না। কিন্তু সে চেয়েছিল চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে। তাই মনে-মনে একটা ফন্দি এঁটেছিল। ঠিক করেছিল, রাতের অন্ধকারে গুহার গোপন পথ দিয়ে মূর্তিটা সরিয়ে এনে আমার হাতে তুলে দেবে। আমার কাছ থেকে টাকাটা নিয়েই গা-ঢাকা দেবে রাতের অন্ধকারে। তারপর রুমটেক থেকে গাড়িতে মূর্তিটা নিয়ে যখন আমি রঙপোর দিকে রওনা হব, ঠিক তখনই লোকজন নিয়ে ও ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। মূর্তিটা উদ্ধার করে নিয়ে যাবে মন্দিরে। বিনিময়ে মিলবে প্রচুর বখশিশ।"

"তার মানে, লোকটা বেশ মতলববাজ!"

"নিশ্চয়ই! তবে আমার সঙ্গে চালাকি! আমি ওর অভিসন্ধি বুঝতে পারলাম। সঙ্গে-সঙ্গে শিলিগুড়িতে খবর পাঠালাম তোদের কাছে, গাড়ি নিয়ে রাত দুটোয় রুমটেক বাসস্টপে অপেক্ষা করতে।"

"অমাবস্যার রাত। তার ওপর আকাশটা ছিল ঘন মেঘে ঢাকা। সারা রুমটেক জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল গভীর নীরবতা। সারাক্ষণ চলছিল বৃষ্টির টুপটাপ। কালো রঙের রেইন কোট জড়িয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম রুমটেক বৌদ্ধমন্দিরের বাইরের দরজায়। এক সময় লক্ষ করলাম, মন্দিরের পেছন দিক থেকে একটা মৃদু আলো এগিয়ে আসছে এদিকেই। রাস্তার পাশে একটা বড় গাছের আড়ালে আমি গা-ঢাকা দিলাম। লোকটা কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে গেল নির্দিষ্ট জায়গার দিকে। এই তো সুযোগ! আমি পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওর ওপর। টু শব্দ করবার আগেই ওষুধমাখা রুমাল চেপে ধরলাম ওর মুখে। কয়েক মিনিট দাপাদাপি করে এলিয়ে পড়ল শরীরটা। তারপর নিয়ে এলাম ঘাড়ে করে বাসস্টপে। পরের ঘটনা তো সবই তোদের জানা।"

"কিন্তু লোকটাকে ওখানে খতম না করে এখানে করলে কেন?"

"সবাই জানবে, রুমটেক বৌদ্ধ মঠের মৈত্রেয়-মূর্তিটা চুরি করে পালিয়েছে এই লোকটি। ওখানে লাশটা ফেলে রাখলে সবাই ভাবত, বাধা দিতে গিয়ে ও প্রাণ হারিয়েছে। ওর পায়ের জুতোজোড়া এবং নোটবুকটি ফেলে রেখে এসেছি মন্দিরের সামনের পথটায়।"

কিছুক্ষণ সবাই কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। যেন পরবর্তী কাজের প্রস্তুতি। এর পর কীভাবে চলতে হবে, তা নিয়ে সবাই ভাবিত। বেশ কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনার পর আবার সেই লোকটিই বলতে শুরু করল, "আজ রাতের মধ্যেই কিন্তু পাচার করতে হবে মূর্তিটা।"

"সব ঠিক করে রেখেছি।"

"শাবাশ! এখন সব কিছু নিখুঁত হওয়া চাই।"

"সে ভাবতে হবে না আপনাকে।" বলল দলের আর-এক পাণ্ডা, "দিনের বেলায় পাহাড়ি পথে গিয়ে দেখে এসেছি সব। চেকপোস্টের সামনে দিয়ে তো আর যাওয়া যাবে না। সিকিম-পুলিশ ওত পেতে বসে আছে।"

"কাল রাতেই পেরিয়ে গেলে হত চেকপোস্টটা।"

"সে আর এখন ভেবে কী হবে? গাড়িটাই সব ভেস্তে দিল।"

"সত্যি, গাড়িটা যে মাঝপথে এভাবে বিগড়ে যাবে, তা ভাবতে পারিনি।"

"এখন আর সেসব ভেবে কী লাভ! কী করতে হবে, তাই বলো।"

"পাহাড়ি পথে? সে তো খুবই দুর্গম।"

"বিপদের আশঙ্কা রয়েছে প্রতি মুহূর্তে। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। ভরত

বাহাদুরকে আমি সকালেই খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। চেকপোস্টের ওপাশে শিলিগুড়ির দিকে যে প্রথম মাইলস্টোনটি রয়েছে, তার ধার ঘেঁষে রয়েছে একটা ঝরনা। বেশ ঝোপঝাড় রয়েছে সেখানে। সেখানে গাড়ি নিয়ে ঘুপটি মেরে সে রাত বারোটায় অপেক্ষা করবে তোদের জন্য।"

"তার মানে রাত বারোটার মধ্যে আমাদের পৌঁছতে হবে সেখানে?"

"ঠিক ধরেছিস।"

"মূর্তিটা ভরত বাহাদুরের হাতে তুলে দিলেই তো কাজ শেষ।"

"না, না। তোদের যেতে হবে ভরত বাহাদুরের সঙ্গে ধর্মনগর পর্যন্ত।"

"হ্যাঁ, নেপালের ধর্মনগর। সেখানে থাকবে প্রতাপ রানা। তার হাতে তুলে দিতে হবে মূর্তিটা।"

"কীভাবে চিনব তাকে?"

"ভরত বাহাদুর চেনে। মূর্তিটা তুলে দিয়ে তোরা চলে আসবি শিলিগুড়ির সেই হোটেলটায়। আমি অপেক্ষা করব তোদের জন্য। সেখানেই তোদের বখশিশ মিটিয়ে দেব।"

"তা হলে রওনা হওয়া যাক।"

কথা শেষ হতে–না–হতেই লোকগুলি তৈরি হতে আরম্ভ করল। মাথায় টুপি ও গায়ে কালো রঙের রেইনকোট চাপাল সবাই। হাতে টর্চ। পিঠে ছোট বোঝা।

বুবাই সব দেখেশুনে কেমন যেন অস্থির হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, দেশের একটা অমূল্য শিল্পসম্পদ বিদেশে পাচার হতে চলেছে। রুখতে হবে এই অপচেষ্টা। কিন্তু কীভাবে? থানায় যাবে? কিন্তু থানা কোন দিকে? মামা নিশ্চয়ই জানেন। মামাকে গিয়েই বলা যাক সব কথা।

পেছন ফিরে সবে দৌড় দিতে যাবে বুবাই, ঠিক এমন সময় কে যেন তার ঘাড়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল। পড়ে গেল বুবাই। তার মনে হচ্ছিল, যেন শরীরের হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। তাকিয়ে দেখে, এক বিশাল চেহারার তিব্বতি লামা তার সামনে দাঁড়িয়ে। প্রায় ধমকের সুরে তিনি বলে ওঠেন, "কী করছিলি এখানে?"

বুবাই আমতা-আমতা করতে থাকে। লোকটা আরও গলা চড়িয়ে বলল, "বেশি চালাকি করলে কিন্তু এক্কেবারে শেষ করে দেব।"

"বাড়ি ফিরছিলাম। পথ ভুল করে এদিকে এসে পড়েছি। এখানে নতুন এসেছি কিনা!"

এর মধ্যে কুঁড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে দু-তিনজন। সবাই বুবাইকে নানা জেরা শুরু করে দিল। বুবাই বুঝতে পারে, চুপ করে থাকলে রক্ষে নেই। যেন কিছুই সে জানে না, এভাবে সব কথার উত্তর দিতে লাগল। তিব্বতি লামা অন্যদের লক্ষ করে বললেন, "ওকে এভাবে ছেড়ে দেওয়া যাবে না।"

"ঠিক বলেছেন।"

"হাত-পা-মুখ বেঁধে সঙ্গে নিয়ে চলো। পরে দেখা যাবে, কী করা যায়।"

"কিন্তু?"

"কিন্তু কী?"

"এই দুর্গম পাহাড়ি পথে আর-একটা বোঝা বাড়ানো কি ঠিক হবে?"

"তা হলে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রাখো ঘরে। রাতে বুনো জন্তু-জানোয়ার শেষ করে দিয়ে যাবে। আর যদি না-ও করে, তা হলেও ক্ষতি নেই। সকাল হওয়ার আগেই আমরা পুলিশের ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে চলে যাব।"

লোকটার কথা শেষ হতে-না-হতেই সবাই মিলে বুবাইকে ধরে নিয়ে গেল কুঁড়ের ভেতর। তারপর মোটা দড়ি দিয়ে ওর শরীর কষে বাঁধল ওরা। একটা পুরনো কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল মুখ। তারপর মূর্তির বাক্সটা নিয়ে ওরা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিকে তখন চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে ঘন অন্ধকার। মাঝে-মাঝে দমকা হাওয়ায় কুঁড়ের ভাঙা দরজাজানলা খড়খড় করে উঠছিল। ভয় আর আশঙ্কায় শিউরে উঠছিল সমস্ত শরীর।

এক সময় সে দেখতে পেল টর্চ জ্বালিয়ে কয়েকজন লোক এগিয়ে আসছে এদিকেই। তবে কি তাকে খতম করার জন্য ওই লোকগুলি ফিরে আসছে? অবশ হয়ে আসছে সব কিছু। কিন্তু না, হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন ডাকছে তার নাম ধরে। পরিচিত স্বর। মামা উৎকণ্ঠা জড়িয়ে বলছেন তাঁর সঙ্গের ভুটিয়া ছেলেটিকে, "কী কুক্ষণেই যে ওকে আসতে লিখেছিলাম এখানে, এখন কিছু ঘটলে কী উত্তর দেব ওর বাবা-মাকে!"

"এত ঘাবড়াবেন না। এখানেই আছে কোথাও।" সান্ত্বনা দিয়ে বলল ভুটিয়া ছেলেটি।

এবার বুবাই সাহস ফিরে পেল। মরিয়া হয়ে মুখের বাঁধনটা একটা বাঁশের সঙ্গে লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান মারল। খুলে গেল মুখের বাঁধন। চিৎকার করে সে ডেকে উঠল, "মামা...আ...আ...।"

তার আর্ত কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হল বাতাসে। মামা, ভুটিয়া ছেলেটি ও আরও দু'জন প্রায় দৌড়ে এলেন সেখানে। টর্চের আলো ফেলে ঢুকলেন সেই কুঁড়ের মধ্যে। হাত-পায়ের বাঁধন খুলে বুবাইকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে।

বুবাইয়ের কাছ থেকে সব শুনে ভুটিয়া ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন চেকপোস্টের দিকে। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য রেখে গেলেন কয়েকজনকে।

পরের দিন সকালের জলখাবার খেতে বসেছে বুবাই, এমন সময় একটা জিপ এসে থামল বাড়ির সামনে। সিকিম পুলিশের ইউনিফর্ম পারা একজন মামাকে এসে বললেন, "আপনার ভাগ্নেকে নিয়ে একবার চলুন আমার সঙ্গে। বড়বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন।"

"কেন, কিছু হয়েছে নাকি?"

"চলুন না। সব দেখতে পাবেন।"

বুবাই তাড়াতাড়ি খেয়ে তৈরি হয়ে নিল। মামা ও বুবাই গিয়ে বসল জিপে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জিপ এসে থামল চেকপোস্টে। ঘরে ঢুকতেই বড়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এই আপনার ভাগ্নে বুবাই?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

এবার বুবাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দ্যাখো তো বুবাই, এদের চিনতে পারো কি না!"

"হ্যাঁ, ওই তো কাল রাতের সেই লোকগুলো!"

"এই বাক্সটা?"

"ওর মধ্যে রয়েছে মূর্তিটা। কিন্তু আসল লোকটা কোথায়?"

"শিলিগুড়ির কোনও হোটেলে আছে। ভয় নেই, ঠিক ধরা পড়বে। তার নামধাম সব জানা হয়ে গেছে। লোকটা এক নম্বরের ক্রিমিনাল।"

সামনের টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। বড়বাবু কার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠল একটা তৃপ্তির হাসি। ফোনটা নামিয়ে রেখে বললেন, "ধরা পড়েছে। সন্ধের দিকে আবার একটু বিরক্ত করব তোমাকে। দেখে যেয়ো লোকটাকে।"

কিছুক্ষণ সেখানে থেকে তারা বাড়ির পথে পা বাড়াল। মেঘের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ তখন ছড়িয়ে পড়েছে রঙপোর পাহাড়ে। এত বড় একটা পাচারকারি দলকে ধরতে তার অবদানও যে কম নয়, এ-কথা ভাবতে গিয়ে একটা অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করল বুবাই।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

গোয়েন্দা গল্প

বাঘের নখ

অদ্রীশ বর্ধন

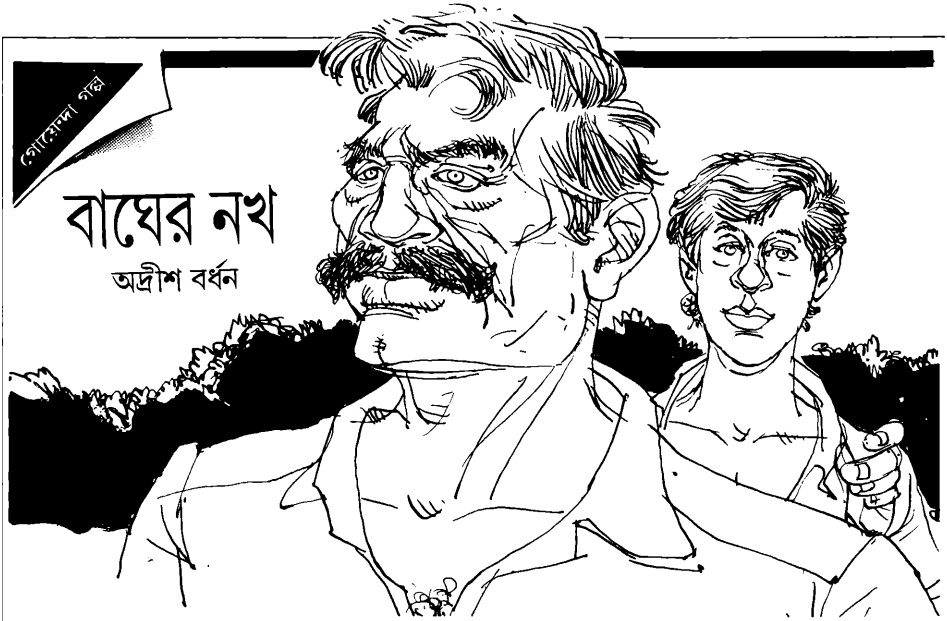

"বাঘের হাড় ? কলকাতায় ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, এই কলকাতায় ।"

"টাকা ফেললে বাঘের দুধ পাওয়া যায় জানতাম । বাঘের হাড়-ও ?"

"ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে ।"

কথা হচ্ছে ইন্দ্রনাথ রুদ্র আর তুহিন চাকীর মধ্যে । তুহিনবাবু জাঁদরেল সরকারি অফিসার । পুব ভারতের বন-জঙ্গল তাঁর নখদর্পণে । বুনো প্রাণীরা যাতে বহাল তবিয়তে থাকে, তা দেখেন । যাদের বংশ লোপ পেতে চলেছে, তাদের রক্ষা করেন ।

ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু বন-জঙ্গলের মানুষ বলে মনে হয় না । রোদে জলে রংও পুড়ে যায়নি । যেমন ফরসা তেমনই তৈলমসৃণ উজ্জ্বল মুখশ্রী । চকচকে টাক দখল করছে মাথাকে । ফলে, চওড়া কপাল আরও চওড়া হয়েছে । চশমাপরা চোখে, মস্ত কপালে বুদ্ধি ঝলমল করছে । লম্বা, ঋজু শরীরটায় নিপাট স্বাস্থ্যের রোশনাই । মুখে হাসি, কথায় বিনয়, উচ্চারণে উচ্চ শিক্ষা—এই মানুষ বনে-জঙ্গলে টো-টো করেন, মানুষখেকো বাঘকে ঘুমপাড়ানি বুলেট মেরে অজ্ঞান করেন, সাপের চামড়ার চোরা চালান বন্ধ করেন, ভাবতেও অবাক লাগছে ।

ইন্দ্রনাথ বলল, "বাঘের হাড় নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন ?"

"বাঘের হাড় বেচে যে লাখপতি হয়েছে, তার জান যে যেতে বসেছে ।"

"বাঘের হাড়ের এত দাম ?"

"চিনদেশে ওষুধপত্র তৈরি হচ্ছে যে বাঘের হাড় থেকে ।"

"চিনের ওষুধে বাংলার বাঘ ?"

"শুধু বাংলার নয়, ইন্দ্রনাথবাবু, সুমাত্রা আর জাভা, বালি আর পারস্য, মাঞ্চুরিয়া আর রাশিয়া সব জায়গা থেকেই বাঘের হাড় যাচ্ছে চিনের কারখানায় ।"

"কিন্তু বাঘ মারা তো নিষেধ ?"

"কে শুনছে ? নেই-নেই করেও এখনও তো হাজারছয়েক বাঘ রয়েছে পৃথিবীতে । সাইবেরিয়া যাদের আদিভূমি সেখানেই শুধু এরা নেই । বরফ-প্রান্তরে থেকে অভ্যেসও খারাপ করে ফেলেছে । গরম একদম সইতে পারে না । লম্বা ঘাসের মধ্যে, জলের মধ্যে গা ডুবিয়ে বসে থাকে—মানুষকে সমীহ করে, ভয়ও পায়—সেই মানুষই এদের সাবাড় করে আনছে । এশিয়ার বন-জঙ্গলই এখন ওদের ঠাঁই । নিস্তার নেই সেখানেও," বলতে-বলতে যেন চোখ ছলছল করে উঠল তুহিনবাবুর । গলা ভারী হয়ে এল ।

নরম গলায় ইন্দ্রনাথ বলল, "বাঘ শিকার তো একসময়ে মস্ত বাহাদুরির ব্যাপার ছিল ।"

"বাহাদুরির বাড়াবাড়ি দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে, বিশেষ করে বন্দুক আবিষ্কারের পর । শুধু ১৮৭৭ সালেই ১,৫৭৯টা বাঘ মারা হয়েছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ায় । আর এখন ? গোটা ইণ্ডিয়ায় পাবেন খুবজোর সাড়ে চার হাজার, সুন্দরবনে পাবেন শ'তিনেক ।"

"কিন্তু এখন তো খোদ গভর্নমেন্টই বাঘ মারার বিরুদ্ধে । আপনারা নজর রেখেছেন । তা সত্ত্বেও বাঘ মরছে ?"

"সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আয়তন জানেন ? ২,৫৮৬ বর্গ কিলোমিটার । এর অনেকটাই জুড়ে রয়েছে নদী, নালা, খাঁড়ি আর গভীর বন । চোরাশিকারিদের স্বর্গ বাঘের হাড় এখন বাঘের চামড়ার চাইতেও দামি । নইলে লাখ-লাখ টাকা কামায় কী করে ঢোলগোবিন্দ সরকার ?"

"যার জান যেতে বসেছে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ ।"

"তার জন্যে আপনি ছুটে এসেছেন ?"

"এক সময়ে নিজে বাঘ মেরেছে, ভাড়াটে শিকারি দিয়ে মারিয়েছে—এখন সুবুদ্ধি হয়েছে । চোরাশিকার বন্ধ করার জন্যে আমাকেই খবর দিয়ে যাচ্ছে ।"

"তাই তার জান-টা আপনি বাঁচাতে চান ?"

"আজ্ঞে ।"

"কিন্তু তার জান নেবে কে ? বাঘের ভূত ?"

"একজন অভিজ্ঞ চোরাশিকারি । এক সময়ে ছিল ঢোলগোবিন্দর ডান হাত । এখন তার যম । লোকটার নামও অদ্ভুত । টুটু মহারাজ ।"

হেসে ফেলল ইন্দ্রনাথ, "বিউটিফুল নাম । টাটু মহারাজ কি খুনের হুমকি দিয়েছে

ঢোলগোবিন্দকে ?"

"স্বপ্ন দেখেছে। সেই স্বপ্নের কথা শোনাতে দিনসাতেক আগে চলে এসেছে ঢোলগোবিন্দর কাছে।"

"স্বপ্নটা কী ?"

"ঢোলগোবিন্দর গলায় বাঘের নখ বসেছে। একটানে ছিঁড়ে দিয়েছে টুঁটি।"

"রোমাঞ্চকর স্বপ্ন। শুনেই ঘাবড়ে গেছে ঢোলগোবিন্দ সরকার ?"

"সে নির্বিকার। দেখলে বুঝবেন কী জিনিস। যে-বাঘের গর্জন শুনলে লোকে জ্ঞান হারায়, এ সেই বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে দুই ভুরুর মাঝে গুলি চালায়। স্বপ্নের কথায় সে মজা পেয়েছে।"

"তা হলে ভয়ে কাঁপছে কে ?"

"তার ছেলে। একমাত্র সন্তান। মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। হস্টেলে থেকে পড়াশুনো চালিয়েছে। বাবাই তার চোখের মণি। দুর্দান্ত বাপের ঠিক উলটো। পয়লা নম্বর ভিতু। টাট্টু মহারাজকে দেখে আর তার মুখে স্বপ্নের কাহিনী শুনে ভয়ে প্রাণ উড়ে গেছে। থানায় যায়নি, বাবাকে নিয়ে চলে এসেছে আমার কাছে। বলছে, প্রাইভেট ডিটেকটিভ দরকার।"

"কলকাতায় এসেছে ?"

"বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখেছি।"

"নিয়ে আসুন।"

•

ঘরে ঢুকল ঢোলগোবিন্দ সরকার। বাঘের মতোই নিঃশব্দে। চোখ দুটোও বাঘের চোখের মতো কটা। উচ্চতায় মাঝারি। তবে বোতাম-খোলা কলারওলা নীল গেঞ্জি-শার্টের ফাঁক দিয়ে ঠেলে উঠছে কাঁধের মাস্‌ল, বাহুর মাস্‌ল আর বুকের উল্কি-বাঘ। বাঘের মুণ্ডটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। বড় জুলপি আর মোটা গোঁফেও সাদা চুল। চৌকো চোয়াল। থ্যাবড়া নাক। শক্ত ঠোঁট। মুখের চামড়ায় অজস্র রেখা। কপালে, চোখের কোণে, নাকের পাশে, ঠোঁটের প্রান্তে। চামড়া পুড়ে ঝলসে গেছে রোদের আঁচে। লোকটাকে দেখলেই অসুর-অসুর মনে হয়। ভেতরটাও নিশ্চয় তাই। কটা চোখের আড়ালে নৃশংসতা যেন লুকিয়ে থাকতে পারছে না।

পেছন-পেছন এল তার ছেলে। বাবার চেয়ে একটু লম্বা। গায়ে মাস্‌ল বেশি না থাকলেও, বেশ চাবুক-চেহারা। মুখের গড়ন অনেকটা বাবার মতো। শুধু চৌকো নয় চোয়াল, চোখেও নেই প্রচ্ছন্ন নৃশংসতা। ভয়ের মলম মাখানো রয়েছে যেন চোখে। চাহনি চঞ্চল।

সকলের পেছনে এলেন তুহিন চাকী। ঢুকেই পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলের নাম মাধব সরকার। সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট। এখন কম্পিউটার হার্ডওয়্যার নিয়ে পোস্টাল ডিপ্লোমা কোর্স পড়ছে। বয়স বাইশ।

মামুলি কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর ইন্দ্রনাথ বলল, "মাধব, তুমি ভয় পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ, কাকু।"

"কিন্তু স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় ?"

"হুমকি তো সত্যি হতে পারে।"

"তুমি বলতে চাও, টাট্টু মহারাজ নিজেই খুন করবে তোমার বাবাকে ?"

"তার গলায় ঝোলে বাঘ-নখ। রুপোয় বাঁধানো।"

নিঃশব্দে হাসল ঢোলগোবিন্দ। যেন বাঘের দাঁতখিঁচুনি। কিছু বলল না।

কিন্তু রেগে গেল মাধব, "তুমি এখনও হাসছ ? তোমার রাশিচক্রে লেখা নেই, মৃত্যু হবে এ-বছরেই ?

"সেটা যে বাঘের নখে হবে, তা তো লেখা নেই," এতক্ষণে এই প্রথম কথা বলল ঢোলগোবিন্দ। গলার আওয়াজে কিন্তু বাঘের ডাক নেই। রয়েছে মেয়েলি তীক্ষ্ণতা। বাঘশিকারির গলা যে এত সরু হয়, তা জানা ছিল না।

"কিন্তু তুমি বাঘের নখে মরতে চাও না বলেই বাঘ শিকার ছেড়ে দিয়েছ।"

"বড্ড বাজে বকছিস," ঢোলগোবিন্দর গলায় এবার বিরক্তি।

ইন্দ্রনাথ বলল, "মাধব, তুমি জ্যোতিষে বিশ্বাস করো ?"

"করি। নিজেও চর্চা করি। কাগজ দিন," বলে নিচু টেবিলের তলায় রাখা স্লিপ প্যাড টেনে নিয়ে বুকপকেট থেকে ডট পেন বের করে বাঁ হাতে ঝপাঝপ আঁকল একটা রাশিচক্র। গড়গড় করে বলে গেল, অমুক গ্রহ অমুক জায়গায় রয়েছে বলে বাবার মৃত্যুর আর দেরি নেই।

নিঃশব্দে হেসে গেল ঢোলগোবিন্দ। ইন্দ্রনাথ শুনেটুনে বললে, "ডিটেকটিভ কি মৃত্যু আটকাতে পারবে ?"

রুখে উঠল মাধব, "চেষ্টা করতে ক্ষতি কী ? ওইরকম একটা স্বপ্নের কথা শুনলে কার না সন্দেহ হয় ? সব শুনেও চুপ করে বসে থাকা যায় ?"

"শুধু স্বপ্ন ? না কথাও আছে তার মধ্যে ?"

"আছে। বটগাছের ডালে বসে কে যেন বলেছে, বাবার গলা ফাঁড়বে বাঘ-নখ। তারপরেই দেখা গেছে, বাবা পড়ে রয়েছে চিত হয়ে—বাঘ-নখ ঢুকে রয়েছে টুঁটিতে," বলতে-বলতে শিউরে উঠল মাধব।

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ইন্দ্রনাথ। তারপর বলল, "চলো, শহরতলির শয়তানকে দেখে আসা যাক।"

তুহিনবাবুর গাড়ি যখন পৌঁছল ঢোলগোবিন্দর বাড়িতে, শীতের সূর্য তখন গাছের মাথায় নেমে পড়েছে। দূর থেকে বাড়ির চেহারা দেখে অবাক হয়েছিলাম। অনেক শিবমন্দির যেন গায়ে-গায়ে লাগানো। মোচার মতো গড়ন। গাছপালার ওপর দিয়ে প্রথমে দেখা গিয়েছিল চুড়োগুলো। ফটক পেরিয়ে বাগানে গাড়ি ঢোকার পর দেখলাম, প্রতিটা চুড়োর নীচে দুটো করে জানলা, ইস্পাতের পাল্লা আঁটা। দরজা মোটে একটা। মন্দির প্যাটার্নের এক-একটা ঘর যেন এক-একটা কেল্লা। এরকম অদ্ভুত বাড়ি জীবনে দেখিনি। জিজ্ঞেস করে জানলাম, শিবভক্ত এক জমিদার তৈরি করেছিলেন এই বাগানবাড়ি। একটা ঘর থেকে আর-একটা ঘরে যাওয়া যায় পাতাল-সুড়ঙ্গ দিয়ে। গোটা বাড়ির তলায় রয়েছে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। ঢোলগোবিন্দ সেইসব সুড়ঙ্গের নকশাসমেত গোটা বাগানবাড়ি কিনে নিয়ে সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়েছে। শুনে মনে-মনে বলেছিলাম, শখের বলিহারি। যেমন ছিল পেশা, তেমনই হয়েছে আস্তানা।

বাইরের দিকের নাটমন্দিরের মতো বসবার ঘরটায় মিনিটদশেক বসেছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল, বিচিত্র এই শিব-পুরীর তলার গোলকধাঁধা-সুড়ঙ্গে ঘুরব। কিন্তু ইন্দ্রনাথ হাতঘড়ি দেখে বলল, "টাট্টু মহারাজকে এখানে ডাকতে হবে না, আমিই যাব তার বাড়ি।"

তুহিনবাবু গাড়ি করে নিয়ে গেলেন। বিলের ধারে একটা একতলা পুরনো বাড়ি দেখিয়ে বললেন, "পাড় দিয়ে চলে যান। আমি এখানেই রইলাম।"

ঝাঁকড়া গাছের আড়ালে বাড়িটাকে ভূতের বাড়ি বলে দিব্যি চালানো যায়। চারপাশ নিঝুম। বাঁশের ফটক খুলে ইট পাতা সরু রাস্তায় পা দিতেই বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। খালি গায়ে একটা মিশকালো ছেলে এসে বাইরে দাঁড়াল। তার পরনে হাফপ্যান্ট ছাড়া কিচ্ছু নেই। নিগ্রো-নিগ্রো চেহারা। ছোট চুল, সরু কপাল, ভোঁতা নাক, উঁচু হনু।

কালো বাঘের মতোই সে ছিটকে চলে এল আমাদের সামনে। পথ আগলে দাঁড়িয়ে

বলল রুক্ষ গলায়, "কী চাই ?"

"টাট্টু মহারাজের চ্যালা বুঝি ?" হেসে-হেসে বললে ইন্দ্রনাথ, "যাও বাবা, তোমার কর্তাকে গিয়ে বলো, কলকাতা থেকে পুলিশের লোক এসেছে।"

ছোকরার চোখ দুটো একটু চমকে উঠল। সামলে নিল তখনই। পেছন ফিরে উধাও হয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। বেরিয়ে এল প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে, "আসুন।"

চৌকাঠ পেরিয়ে প্রায় অন্ধকার গলি। ডান দিকের ঘরে হ্যারিকেন জ্বলছে। তক্তপোশে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে রয়েছে একটা কালো কুচকুচে মূর্তি। গায়ে খয়েরি আলোয়ান জড়ানো।

মোলায়েম গলায় মূর্তি বলল, "আসুন। ঢোলগোবিন্দ পুলিশ ডেকেছে ? এত ভিতু হয়েছে আজকাল ? চোর কোথাকার। পাপের সাজা এইভাবেই হয়।"

আমি আর ইন্দ্রনাথ ভেতরে ঢুকে তক্তপোশেই বসলাম। বসবার অন্য চেয়ার তো নেই। হাফপ্যান্ট পরা ছোকরা গলি দিয়ে চলে গেল ভেতর দিকে।

ইন্দ্রনাথ বললে, "আমরা পুলিশ নই। তবে পুলিশ আমাদের পেছনে আছে।"

মিশকালো মূর্তি পলকহীন চোখে দেখছিল ইন্দ্রনাথকে আর আমাকে। আর আমি দেখছিলাম লোকটার কাঠখোট্টা মুখাবয়ব। রসকষ এক্কেবারে নেই। জ্যান্ত কঙ্কাল বললেই চলে। হাড়ের ওপর টান-টান করে লাগানো যেন চামড়া। চোখ দুটো খুব সাদা। হ্যারিকেনের আলোয় শ্বাপদের চোখের মতো জ্বলছে।

সে বলল, "পুলিশ নয় ? তবে কী ?"

"ডিটেকটিভ। এর পর আসবে পুলিশ। আপনি ঢোলগোবিন্দ সরকারকে খুনের ভয় দেখাচ্ছেন ?"

জীবন্ত কঙ্কাল বলল, "ভুল। যার মনে পাপ, সে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা এইভাবেই করবে। আপনি সব শুনুন। তারপর যা করবার করবেন। আমিও চলে যাচ্ছি পরশু। বাড়িভাড়া দেওয়ার টাকা নেই। এই তো বাড়ি তাই খালি পেয়েছি। ইচ্ছে ছিল, ঢোলগোবিন্দর মড়াটা দেখে যাব, কিন্তু বড্ড দেরি হচ্ছে স্বপ্নটা ফলতে।"

"আপনার বিশ্বাস, স্বপ্ন ফলবেই ?"

"না বিশ্বাস করলে সুন্দরবন থেকে এত খরচ করে এলাম কেন ? বনে-জঙ্গলে থাকি, বাঘ, কুমির, সাপের সঙ্গে ঘর করি। যা বললাম, তা মিথ্যে হবে না।"

"কিন্তু এখানে তো বাঘ থাকে না, তবে বাঘ-নখ ঝুলছে আপনার গলায় !"

ঝলসে উঠল শ্বাপদ চক্ষু, "সে-খবরও পেয়েছেন। হ্যাঁ, ঝুলছে, এই দেখুন।"

বলেই একটানে খুলে ফেলল গায়ের আলোয়ান। দেখলাম, কালো কার বাঁধা রুপোয় বাঁধানো প্রকাণ্ড বাঘ-নখ। এক সময়ে কত রক্তই না-জানি লেগেছিল এই নখে, রক্তের নেশা এখনও যায়নি। গা-শিরশির করে উঠল আমার।

টাট্টু মহারাজের গলায় এবার শোনা গেল টিটকিরি, "এই দেখেই চমকে উঠলেন ? পিঠ দেখলে তো মূর্ছা যাবেন।" বলেই, দেওয়াল থেকে পিঠ সরিয়ে নিয়ে ঘুরিয়ে ধরল আমাদের দিকে। আলোয়ান পিছলে নেমে যেতেই সত্যিই আঁতকে উঠলাম। কোনাকুনিভাবে একটা কাটাছেঁড়ার দাগ বীভৎস করে তুলেছে গোটা পিঠটাকে। মাংস আর চামড়া তালগোল পাকিয়ে ক্ষতস্থান জুড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু গোটা পিঠটার জ্যামিতি পালটে দিয়েছে।

আলোয়ান ঢাকা দিয়ে আবার ঘুরে বসল টাট্টু মহারাজ। বুকের বাঘ-নখ এক হাতে তুলে ধরে বলল, "এই নখের কীর্তি। এরই আর-একটা নখ ঢোলগোবিন্দকে বাঁধিয়ে উপহার দিয়েছি, ষড়যন্ত্রের স্মৃতি হিসেবে।"

"ষড়যন্ত্র ?"

"আমাকে খতম করার ষড়যন্ত্র। সুন্দরবনে কখনও গেছেন ? না, না, লঞ্চে চেপে যে সুন্দরবন আপনি দেখেছেন, আর আমার জানা সুন্দরবন এক্কেবারে আলাদা। দু'-তিন হাজার বছর আগেও গোটা সুন্দরবন অঞ্চল ছিল সমুদ্রের তলায়। আজও সেখানে জোয়ারের জলে বেশিরভাগ বন ডুবে থাকে। এক সময়ে রাজারাজড়ারা অনেক ইমারত বানিয়েছিল, এখন আছে ধ্বংসস্তূপ। ভাটার সময় জেগে ওঠে। আমি এইরকম একটা ভাঙা প্রাসাদের পাতাল ঘরে পেয়েছিলাম চার ঘড়া সোনার মোহর। বাদশাহি মোহর। আনন্দে নেচে উঠে খবরটা দিয়েছিলাম ঢোলগোবিন্দকে। তখনই নিয়ে যেতে পারিনি—জোয়ারের জলে পাতালঘর ডুবে গেছিল বলে। ভাটার টান শুরু হওয়ার আগেই ঢোলগোবিন্দকে খুঁজতে গিয়ে দেখি সে নেই। বাঘের বাচ্চাটাও নেই।"

"বাঘের বাচ্চা ?"

"অন্ধ বাচ্চা। জন্মের চোদ্দদিন পরে ওদের চোখ ফোটে। সেইদিনই একটা বাচ্চা জোগাড় করেছিলাম। প্ল্যান ছিল, বাঘিনীকে লোভ দেখিয়ে এনে গুলি করে মারব। বাচ্চা নেই, ঢোলগোবিন্দও নেই দেখে ভাবলাম, বাঘিনীর পেটে গেছে। নিজেই চলে গেলাম ভাঙা প্রাসাদে। বাঘ গরম সইতে পারে

না। ভাঙা বাড়ির মধ্যে ঢুকে বসে থাকে। সেদিন বাঘের বাচ্চাকে ওই বাড়ির মধ্যে রেখেই গাছে উঠে বসেছিল ঢোলগোবিন্দ। আমি যেই ঢুকেছি, বাচ্চার গন্ধে বাঘিনীও ঢুকেছে। গন্ধ শোঁকার ক্ষমতা ওদের অসাধারণ। বাচ্চার গন্ধ আর মানুষের গন্ধ—আর যায় কোথায়। প্রথমেই থাবা চালাল কাঁধ লক্ষ্য করে, যা ওদের ট্যাকটিক্স। কিন্তু আমি ছিটকে যেতেই পিঠ চিরে দু'ফালা হয়ে গেল—ঘুরেই বন্দুক চালিয়েছিলাম। সেই বাঘিনীর একটা নখ এই গলায়। থাবা আর গোঁফ চালান দিয়েছি মালয়ে।"

"থাবা আর গোঁফ ? বাঘের ?"

"ওই দিয়ে কবচ ওরা বানায়। ভাল দাম পেয়েছি। হাড় বেচেছে ঢোলগোবিন্দ।"

"মোহর ?"

"ও নাকি পায়নি। মিথ্যে কথা। তারপরেই ব্যবসা ছেড়ে এখানে বাড়ি কিনেছে। আর আমাদের নাড়িনক্ষত্র ফরেস্ট অফিসে জানাচ্ছে। স্বপ্নে ওর পাপের সাজা দেখে তাই ছুটে এসেছিলাম। মোহর বেচা টাকায় কেনা বাড়িটা দেখে গেলাম, মড়াটা দেখা হল না। আর কিছু জানতে চান ?"

"না," বলে উঠে পড়ল ইন্দ্রনাথ। শিব-পুরীতে ফিরে ঢোলগোবিন্দকে বলল, "রাত্রে দরজা বন্ধ করে ঘুমোন ?"

শব্দহীন অট্টহাস্য করে ঢোলগোবিন্দ বলল, "তা ঘুমোই। তবে পাতাল-সুড়ঙ্গগুলো টাট্টুকে দেখিয়েছি।

ক্ষমতা থাকে তো আসুক সেই পথে।"

অট্টহাস্য মিলিয়ে গেলে ইন্দ্রনাথ বলেছিল, "আপনার বাঘ-নখ কোথায় ?"

"আমার ছেলের গলায়," বলে বাঘের চাহনি মেলে একদৃষ্টে আমাদের বেরিয়ে যাওয়া দেখে গেল ঢোলগোবিন্দ।

পরের দিন দুপুর নাগাদ আবার এলাম শিব-পুরীতে। এ-নাম আমার মাথা দিয়ে বেরিয়েছে। শিবমন্দিরের মতো যে বাড়ির গঠন, তাকে শিব-পুরী ছাড়া কী বলব ?

ইন্দ্রনাথ আগের রাতে বাড়ি ফেরেনি। কুমোরটুলিতে নেমে গেছিল এক বন্ধুর বাড়িতে রাতে আড্ডা মারবে বলে। আজ ভোরবেলা সেখান থেকেই একটা চৌকো বাক্স নিয়ে এসেছিল ওর সুভাষ সরোবরের বাড়িতে। তুহিনবাবু গাড়ি নিয়ে যখন পৌঁছলেন আমি তার আগেই গিয়ে দেখেছিলাম বাক্সটা। বাইরে তালা ঝুলছে। ভেতরে কী আছে, তা বলেনি ইন্দ্র।

শিব-পুরীতে এই বাক্স নিয়েই এল ইন্দ্রনাথ। মনে আছে, সেদিন ছিল বেস্পতিবার। গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বেরিয়ে এল বাপ-বেটা দু'জনেই। মাধবের চোখে-মুখে ভয়ের ছাপ আগের চেয়েও বেড়েছে। কারণটাও শুনলাম। কাল রাতে এ-বাড়ির একমাত্র অ্যালসেশিয়ান কুকুরটাকে কেউ খুন করে আগুনে ঝলসাচ্ছিল। আগুন জ্বলছিল বাগানে। তখন রাত একটা। মালীর ঘুম ভেঙেছিল সকলের আগে। বাবাকে নিয়ে মাধব গিয়ে দেখেছিল বীভৎস সেই দৃশ্য। শুকনো ঝরাপাতা জড়ো করে আগুন জ্বালা হয়েছে। দু'পাশে দুটো খুঁটি পুঁতে আড়াআড়ি কাঠ বাঁধা হয়েছে খুঁটি দুটোর মাথায়। কুকুরের দেহ ঝুলছে আগুনের ওপর। তার সামনের দুটো পা আর পেছনের দুটো পা আলাদা ভাবে বাঁধা। আড়াআড়ি কাঠটা গলিয়ে দেওয়া হয়েছে বাঁধা পায়ের মধ্যে দিয়ে।

বাইরের ঘরে বসে সব শুনলাম। বলে গেল মাধব। চুপ করে রইল ঢোলগোবিন্দ। ঠিক যেন চৈনিক মুখ। মনের ভাব মুখে প্রকাশ পাচ্ছে না।

সব শেষে মাধব বলল, "নিশ্চয় টাটু মহারাজের কাজ। খুনের হুমকি যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, তার প্রমাণ। এ-বাড়ি পাহারা দিত এই কুকুর। আজ রাত থেকে সে আর পাহারা দেবে না।"

"আমরা দেব," বলল ইন্দ্রনাথ। "আমাদের থাকার ব্যবস্থা করো।"

রয়ে গেলাম সেই রাতে। কিচ্ছু ঘটল না। শুক্রবার সকালে বেরিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। ঘন্টাখানেক পরে ফিরে এল। বলল, "ভোরের হাওয়া খেয়ে এলাম। চমৎকার বিল। কিন্তু টাটুর দেখা পেলাম না। কথা রেখেছে। বাড়ি খালি। সুন্দরবনেই রওনা হয়েছে। মাধব, আর তোমার ভয় নেই।"

শুকনো হেসে মাধব বলল, "বাঁচলাম।"

ইন্দ্র বলল, "মৃগাঙ্ক অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখে। পাতাল-সুড়ঙ্গ দেখার খুব ইচ্ছে হয়েছে। মাধব, যাও না সঙ্গে।"

দেখলাম বটে সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধা। সারাজীবন মনে থাকবে। ইট দিয়ে বাঁধানো। সিধে হয়ে হাঁটা যায়। ঢোলগোবিন্দ সেখানে ইলেকট্রিক লাইন টেনেছে। আলোয় ঝলমল করছে। তা সত্ত্বেও গা-ছমছম করছিল সুড়ঙ্গের ঘুরপাক দেখে। কোথাও কোনও শব্দ নেই। কথা বলছিলাম তাই ফিসফিস করে। দেখছিলাম মূল সুড়ঙ্গের গা থেকে একটার-পর-একটা সরু সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে দিয়ে মাথা হেঁট করে হাঁটতে হয়। প্রত্যেকটা সুড়ঙ্গ ওপর দিকে উঠে গিয়ে শেষ হয়েছে শিব-পুরীর এক-একটা ঘরের দেওয়াল আলমারির মধ্যে। পাল্লা খুললেই ঢোকা যায় ঘরে।

ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরের আলমারি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমেছিলাম সুড়ঙ্গের মধ্যে। উঠেও এলাম সেই ঘরে। ইন্দ্রনাথ আর তুহিনবাবু নীচে নামেনি। খোশ গল্প করছিল ঢোলগোবিন্দর সঙ্গে। আমরাও জমে গেলাম বাঘের গল্পে। ঢোলগোবিন্দর মতো ঠোঁটকাটা মানুষেরও মুখ খুলিয়ে ছেড়েছে ইন্দ্রনাথ। ভয়াল ভয়ঙ্কর সুন্দরবনের গল্পে আসর মাতিয়ে দিয়েছে। শুনতে-শুনতে রাত হল গভীর। খেলাম কব্জি ডুবিয়ে। গরম রুটি আর মুরগির মাংস। তারপর দই।

মাধব হাই তুলছিল অনেকক্ষণ থেকেই। টাটু মহারাজ তল্লাট ছেড়ে চম্পট দেওয়ায় মনও ওর হালকা। উদ্বেগ চলে গেলে ঘুম তো আসবেই।

ইন্দ্রনাথ বলল, "যাও, যাও, টেনে ঘুমোও। ঢোলগোবিন্দবাবু, আপনিও ঘুমোন। দেওয়াল-আলমারিতে তালা দিয়েছেন ?"

আবার শব্দহীন অট্টহাসি হেসে ঢোলগোবিন্দ বলল, "টাটু যখন ছিল, তখনও দিইনি, এখনও দেব না।"

মাধব বলে উঠল, "বাবা, তোমার এই গোঁয়ার্তুমি..."

থেমে-থেমে ঢোলগোবিন্দ বলল, "তোর বুকে বাঘ-নখ ঝুলিয়েছি কেন ?"

"প্রতিহিংসা তো পরে, তোমাকে তো আর ফিরে পাব না।"

"আমার সব সম্পত্তি তো পাবি।"

আমার আর ইন্দ্রনাথের শোবার জায়গা হয়েছিল একটা শিব-ঘরে। তুহিন চাকী শুতে গেলেন অন্য ঘরে। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ইন্দ্রনাথ বলল, "মৃগ, আলোটা নিভিয়ে দাও।"

দিলাম।

ও বলল, "টর্চ নাও।"

নিলাম।

"আলমারির পাল্লা খোলো। নিয়ে চলো ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে।"

পাল্লা খুলে, টর্চ জ্বালিয়ে, সুড়ঙ্গে নামবার সিঁড়িতে পা দিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার মতলব কী ?"

"নাটক দেখা। ব্যস, আর প্রশ্ন নয়। চলো।"

ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে ঢুকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। সত্যিই আলমারির পাল্লায় তালা দেওয়া ছিল না। আমি আর ইন্দ্রনাথ যে-কোণে লুকিয়ে রইলাম আলনার জামাকাপড়ের আড়ালে, তার সামনাসামনি রয়েছে দেওয়াল-আলমারি। আলমারি আর আমাদের মাঝে রয়েছে খাট। ঢোলগোবিন্দ এর মধ্যেই অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে। শীতের রাতে জানলার ইস্পাত-পাল্লা বন্ধ।

ঘরে নিকষ অন্ধকার, কিন্তু রুমাল দিয়ে টর্চের মুণ্ড মুড়ে নিয়ে যখন ঢুকেছিলাম ঘরে, তখনই আবছা আলোয় দেখেছিলাম চাদর মুড়ি দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে রয়েছে ঢোলগোবিন্দ। মাথায় বালিশ নেই। তার কারণ একটু আগেই গল্পের আসরে শুনেছি। শিরদাঁড়ার তিনটে হাড় ক্ষয়ে গেছে ঢোলগোবিন্দর। বালিশ ছাড়া ঘুমোলে আরাম পায়।

ঘন্টাখানেক এইভাবেই বসেছিলাম। অন্ধকারে চোখ সয়ে গেছিল। আবছাভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম আলমারির পাল্লা।

খুব আস্তে খুট করে আওয়াজ হতেই লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলাম। টেনে ধরে রইল ইন্দ্রনাথ। টর্চ জ্বালাতেও পারলাম না। টর্চ রেখেছে নিজের হাতে। তাই উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে বসেই রইলাম।

একটু-একটু করে ফাঁক হচ্ছে আলমারির পাল্লা। পেন্‌সিল-টর্চের আলো এসে পড়ল খাটে। নিভে গেল। একতাল জমাট অন্ধকার বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। নিঃশব্দে যেন পিছলে এল খাটের মাথার দিকে। তারপরেই শব্দ হল, খ্যাচ।

সঙ্গে-সঙ্গে জ্বলে উঠল ইন্দ্রনাথের হাতের টর্চ। এখন আর টর্চের মুণ্ড জড়ানো নেই রুমাল দিয়ে। তিন ব্যাটারির জোরালো আলো সটান গিয়ে পড়ল নিশাচরের মুখের ওপর।

সেই ছেলেটা। মিশকালো নিগ্রো-নিগ্রো আকৃতি। টাট্টু মহারাজের চ্যালা। খালি গায়ে হাফপ্যান্ট পরেই সে এসেছে এই শীতের রাতে। হঠাৎ আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সাঁত করে সেই মুখ আর গোটা শরীরটা ছিটকে গেল আলমারির গহ্বরে। দ্রুত পায়ের শব্দ নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে।

আমি খাট ঘুরে দৌড়েছিলাম। ইন্দ্রনাথ শর্টকাট করেছিল। সময় এলে ও যে শরীরী বিদ্যুৎ হয়ে যেতে পারে, আবার সেই প্রমাণ দেখিয়েছিল।

এক লাফে খাট ডিঙিয়ে গিয়ে পড়ল আলমারির সামনে। আমি রইলাম তার পেছনে। সিঁড়িতে হাতড়ে-হাতড়ে যখন পা রাখলাম, টর্চ নিয়ে ইন্দ্রনাথ তখন উধাও।

নিঃসীম অন্ধকারে সুড়ঙ্গে পা দিয়ে কী করব যখন ভাবছি, ঠিক তখনই একটা আর্ত চিৎকার ভেসে এল সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে, ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যেতে-না-যেতেই শুনলাম পিস্তল নির্ঘোষ, মাত্র একবার। সেইসঙ্গে অস্ফুট কাতরানি। পরক্ষণেই ইন্দ্রনাথের হাঁক, "মৃগাঙ্ক, এইদিকে চলে এসো। নাটক শেষ হয়েছে।"

এখন আমরা সবাই ঢোলগোবিন্দর শোবার ঘরে। খাট ঘিরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, ইন্দ্রনাথ, তুহিনবাবু, মাধব আর....

ঢোলগোবিন্দ।

খাটেও শুয়ে আছে ঢোলগোবিন্দ। তার টুটি ছিঁড়ে দু'টুকরো। কিন্তু রক্ত-টক্ত কিছুই বেরোচ্ছে না। মুখও অবিকৃত। যেমন ঘুমোচ্ছিল, তেমনই ঘুমোচ্ছে।

কারণ, খাটের এই ঢোলগোবিন্দ মোম দিয়ে তৈরি। শুধু মুণ্ড আর টুটি। জ্যান্ত ঢোলগোবিন্দর মতোই মনে হচ্ছে। কুমোরটুলিতে একরাত থেকে মোম-শিল্পীকে দিয়ে তৈরি করেছিল ইন্দ্রনাথ। ঢোলগোবিন্দকে ও দেখে গিয়েছিল, শিল্পী দেখেনি। ইন্দ্রনাথের মুখের বর্ণনা শুনে তৈরি করে দিয়েছিল আশ্চর্য মুণ্ড—যা টর্চের আলোয় আচমকা দেখলে জ্যান্ত মুণ্ড বলেই মনে হয়।

মেঝেতে পড়ে কাতরাচ্ছে দুটো মূর্তি। মিশকালো সেই ছোকরা। আর টাট্টু মহারাজ। দু'জনেরই পায়ের ডিম থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। ছোকরার পায়ে রুমাল জড়িয়ে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছে ইন্দ্রনাথ। টাট্টু মহারাজের পায়ের ডিম থেকে ছুরিটা খোলেনি, মাস্‌ল এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে রয়েছে।

যন্ত্রণা জড়ানো গলায় টাট্টু বলল, "ছুরিটা খুলে নাও ঢোলগোবিন্দ, পুরো বাঁ দিকটা যে অসাড় হয়ে যাচ্ছে।"

ঢোলগোবিন্দ তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় বলল, "বাকি জীবনটা ওইভাবেই অসাড় হয়ে থাক। ইন্দ্রনাথবাবু গিয়ে না পড়লে ওই ছুরি তো আমার বুকে বিঁধত।"

খেঁকিয়ে ওঠে টাট্টু, "ওর ছুরি কখনও ফসকায় না, এই ডিটেকটিভটা পেছন থেকে লাফিয়ে না পড়লে...."

ব্যাপারটা ঘটেছিল সেইরকমই। মিশকালো জল্লাদকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে টাট্টু মহারাজ অপেক্ষা করছিল সুড়ঙ্গে। পেছন থেকে ঢোলগোবিন্দ এসে যেই তাকে জাপটে ধরেছে, ঠিক তখনই ইন্দ্রনাথের তাড়া খেয়ে ছোকরা এসে গিয়েছিল সামনে। ইন্দ্রনাথের টর্চের আলোয় দুই মূর্তিকে ঝটাপটি করতে দেখে নিমেষে প্যান্টের পকেট থেকে ছুরি বের করেছে, ফলা খুলেছে, মেরেছে ঢোলগোবিন্দর পিঠ লক্ষ্য করে। ইন্দ্রনাথের পদাঘাতে ছুরি বিঁধেছে টাট্টুর পায়ে।

তুহিনবাবু হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন বললেন, "ব্যাপারটা কী হল ইন্দ্রনাথবাবু?"

"নাটক," বলল ইন্দ্রনাথ, "গোয়েন্দাগিরিতে এ-জিনিসটা না থাকলে জমে না। আমার ঘরে বসে মাধব যখন রাশিচক্র আঁকছে তখনই লক্ষ করেছিলাম ও ন্যাটা। তারপর শুনলাম একই বাঘিনীর নখ মাধব আর টাট্টুর গলায়। স্বপ্নটা দেখেছে কিন্তু টাট্টু। অমনি কল্পনায় দেখতে পেলাম, টাট্টুর ফন্দি। ঢোলগোবিন্দ খুন হবে। ওরই বাঘ-নখে, কিন্তু দোষ চাপবে মাধবের ঘাড়ে। কারণ, পুলিশ দেখবে এ-খুনে লাভ কার? না, মাধবের। সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে সে। টাট্টু তাই স্বপ্নের কথা ছড়িয়েছে ফলাও করে, পুলিশ তা বিশ্বাস করবে না, তারা দেখবে প্রমাণ।"

"প্রমাণটাই তো আসল," বললেন তুহিনবাবু।

"এই দেখুন সেই প্রমাণ," মোমের মুণ্ডের টুটিতে আঙুল রাখল ইন্দ্রনাথ, "বাঘ-নখ বসেছে বাঁ দিকে। ন্যাটা হাতে ঠিক তাই হয়। আলমারি থেকে বেরিয়ে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে, মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লে বাঘ-নখ টুটির বাঁ দিক দিয়েই গলায় ঢুকত। কিন্তু আমি দেখেছি, ছোকরা খাটের পেছনে এসেছিল। ডান হাত শূন্যে তুলে বাঘ-নখ দিয়ে টুটি ছিঁড়েছে, যাতে মনে হয়, আলমারি থেকে বেরিয়েই হেঁট হয়ে সামনের দিক থেকে গলার বাঁ দিকে বাঁ হাতে বাঘ-নখ ঢুকিয়েছে মাধব।"

ফ্যাঁস করে উঠল টাট্টু মহারাজ, "এখনও আপনি কিছু প্রমাণ করতে পারবেন না। ঘোড়ার ডিমের ডিটেকটিভ! গুলি আপনিই চালিয়েছেন, আমার চ্যালার পা ফুটো করে দিয়েছেন।"

"না চালালে ওর আর-এক পকেট থেকে যে আর-একটা ছুরি বেরিয়ে আসত," বলে হেঁট হয়ে টাট্টু মহারাজের মিশকালো সাগরেদের হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা ছুরি বের করল ইন্দ্রনাথ, "ছোরার জাদুকর, তোমার খেল খতম, নাটকও শেষ। মাধব, ডাক্তার ডাকো, তিনিই খুলবেন ছুরি, বাঁধবেন ব্যান্ডেজ, নইলে রক্তপাতেই যে মরে যাবে টাট্টু, ওই তো চেহারা!"

দাঁত খিঁচিয়ে গর্জে উঠেছিল জীবন্ত কঙ্কাল।

এর কিছুদিন পরেই চার ঘড়া মোহর বেচার টাকা জমা পড়েছিল একটা বিখ্যাত সমাজকল্যাণ সংস্থায়। কে এত টাকা পাঠিয়েছে, তা কিন্তু জানা যায়নি।

জানি শুধু আমরা ক'জন।

ছবি : অনুপ রায়

২৬ মে ১৯৯৩

ভি. পি. সত্যেন

দীর্ঘদিন ভারতীয় দলে খেললেও এই প্রথম কলকাতার কোনও ক্লাবে খেলছেন ভি. পি. সত্যেন। দীর্ঘদেহী এই স্টপার প্রয়োজনে মাঝমাঠেও দায়িত্ব নিয়ে খেলতে পারেন। কেরলের কান্যানোরে জন্ম সত্যেনের। পি. টি. উষা যে সরকারি স্কুলে পড়তেন, সেখানকারই ছাত্র ছিলেন তিনি। বাবা গোপালন নায়ার ছিলেন অ্যাথলিট। কিন্তু ছেলেবেলায় সত্যেনের প্রিয় ছিল ফুটবল। অল্প বয়সেই সন্তোষ ট্রোফিতে খেলার জন্য কেরল দলে ডাক পান, তারপর কেরল পুলিশে চাকরি এবং খেলা। অত্যন্ত সেরিয়াস ধরনের ফুটবলার। শুটিং, ট্যাপিং, দৌড় সবই ভাল। নিঃসন্দেহে এ-মুহূর্তে ভারতের সেরা ডিফেন্ডার। এবারে ফেডারেশন কাপে মোহনবাগানের জয়ের সর্বাধিক কৃতিত্ব সত্যেনের। চমৎকার খেলেন তিনি। সম্প্রতি প্রি-ওয়ার্ল্ড কাপে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করে এলেন সত্যেন। কলকাতায় তিনি সফল হবেন বলেই বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

ফোটো : সন্তোষ ঘোষ

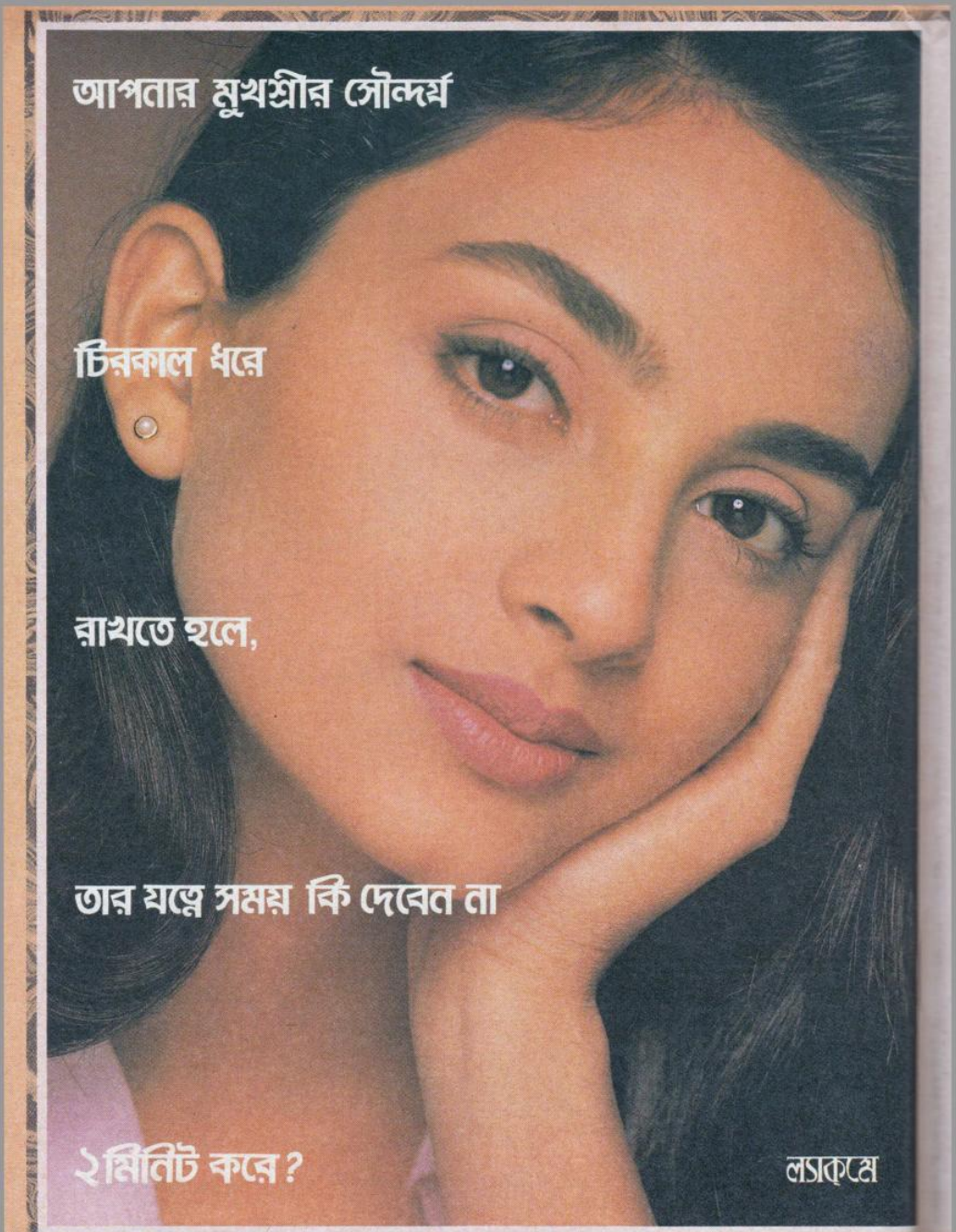
আপনার মুখশ্রীর সৌন্দর্য
চিরকাল ধরে
রাখতে হলে,
তার যত্নে সময় কি দেবেন না
২ মিনিট করে?
লাক্মে

ত্বকের যত্নের জন্য ম্যাক্সিমাম – স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও নিখুঁতসুন্দর ত্বকের জন্য সহজ অথচ সুফলদায়ক কর্মসূচী।

মুখশ্রীর ত্বক খুবই কমনীয় ও সংবেদনশীল। প্রতিদিনই এর সঠিক দেখাশোনার দরকার। তবে তার মানে এই নয় যে, ত্বক পরিচর্যা করতেই দিন কেটে যাবে, ক্লান্তি লাগবে। সত্যি বলতে, ম্যাক্সিমাম আপনাদের দেখাচ্ছে কত সহজে, কত কম সময়ে, এটি করা যায়।

আসলে ম্যাক্সিমাম কি?

ম্যাক্সিমাম হ'ল আপনার ত্বকের দেখাশোনায় এক সম্পূর্ণ এবং কার্যকরী কর্মসূচী। অথচ এটি করতে সময় লাগে সকালে ২ মিনিট আর রাতে ২ মিনিট– ব্যস্!

এটা কোনও ব্যাপারই নয় যে আপনি কমবয়সী, না বেশীবয়সী, আপনার ত্বকের প্রকৃতি কি ধরনের অথবা আপনি কি ধরনের জীবন যাপন করেন। ম্যাক্সিমাম আপনাদের নিবেদন করছে এক ব্যাপক শ্রেণীর সামগ্রীর সম্ভার, যা আপনার অনুপম ত্বকের সঠিক চাহিদাটি মেটাবে।

আপনার ত্বকের প্রয়োজনটি জানা ও বোঝা

ম্যাক্সিমাম এটা জানে ও বোঝে যে আপনার ত্বককে প্রতিদিন কত কি হামলার মোকাবিলা করতে হয়। ঘিঞ্জি শহরের ধূলোময়লা, ধোঁয়াকালির মুখোমুখী হতে হয়। এমনকি, ঝলসানো রোদের তেজ, ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপ্টা ও রুক্ষ শীতের প্রকোপ থেকেও নিজেকে বাঁচাতে পারে না।

আর বয়স যখন আরো বাড়তে থাকে, আপনার ত্বকের টান-টান ভাব ঢিলে হয়ে নিষ্প্রভ হতে থাকে। তাহলে, আপনার ত্বকের যত্ন নেবেন কি করে? নিচে দেয়া চার্টটি দেখে নিয়ে ঠিক করে নিন, ত্বক পরিচর্যার কোন কর্মসূচীটি আপনার জন্যে আদর্শ।

সহজ অথচ সুফলদায়ক ত্বক পরিচর্যার কর্মসূচী

ত্বক	তরুণী (১৫-১৯ বছর)	যুবতী (২০-৩০ বছর)	পূর্ণবয়স্কা (৩০- বছরের বেশী)
রুক্ষত্বক থেকে স্বাভাবিক ত্বক	• ম্যাক্সিমাম ক্লীন্জিং মিল্ক	• ম্যাক্সিমাম ক্লীন্জিং মিল্ক	• ম্যাক্সিমাম ক্লীন্জিং মিল্ক
		• ম্যাক্সিমাম ময়শ্চারাইজার	• ম্যাক্সিমাম স্কিন টনিক
			• ম্যাক্সিমাম ময়শ্চারাইজার
তেলতেলে ত্বক	• ক্লীঞ্জার - অয়েলি স্কিন	• ক্লীঞ্জার - অয়েলি স্কিন	• ক্লীঞ্জার - অয়েলি স্কিন
		• ম্যাক্সিমাম ময়শ্চারাইজার	• ম্যাক্সিমাম অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট
			• ম্যাক্সিমাম ময়শ্চারাইজার

সৌন্দর্যের কিছু বাড়তি পরামর্শ

- যদি আপনি তেলতেলে ত্বকের তরুণী হন, এবং প্রায়ই ব্রণ হয় তো শুধু ক্লীঞ্জার লাগিয়ে ক্ষান্ত থাকবেন না। আপনার ত্বক পরিচর্যার কর্মসূচীতে ম্যাক্সিমাম অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্ট অন্তর্ভুক্ত করে নিন।
- যদি আপনার বয়স ২৫ বছরের বেশী হয়, তাহলে সপ্তাহ-পিছু একবার করে ম্যাক্সিমাম পীল-অফ-ফেস মাস্ক ব্যবহার করুন।
- যদি আপনার দেহের কিছু অংশ প্রায় রুক্ষ হয়, তাহলে ম্যাক্সিমাম হ্যাণ্ড অ্যাণ্ড বডি লোশন মাখুন।
- উভয় মিশ্রিত ত্বকের ক্ষেত্রে তেলতেলে ত্বকের জন্য নির্দেশিত সামগ্রী নাসিকা ও কপালে লাগান আর রুক্ষ ত্বকের সামগ্রী মুখের বাকী অংশে মাখুন।

ম্যাক্সিমাম-এর সর্বাধিক সুবিধাগুণ

আপনাদের জন্যে আমাদের সম্ভারের সামগ্রীগুলি আধুনিকতম ফর্মুলেশনে বানানো, যেগুলি জগতের সামগ্রীগুলির সঙ্গে তুলনীয়। আর আমাদের সামগ্রীগুলি একে অপরটির সঙ্গে নিখুঁত মিশ্রণযোগ্য বলে, আপনি পাচ্ছেন এমন এক সম্পূর্ণ কর্মসূচী, যার সঙ্গে অন্যান্যের তুলনাই করা চলে না।

আরো কি, ম্যাক্সিমাম আপনাদের দিচ্ছে সুনামধন্য ল্যাক্মে – সৌন্দর্য ও ত্বকের যত্নের ব্যাপারে বিশারদ বলে যারা কত বছর ধরে ভারতের লক্ষ-লক্ষ নারীর অগাধ আস্থা অর্জন করেছে।

সুতরাং, এখনই তৈরী হয়ে, ম্যাক্সিমাম উপায়ে আপনার ত্বকের দেখাশোনায় লেগে পড়ুন। যে সুন্দর উপায় আপনাকে দেবে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, নিখুঁতসুন্দর ত্বক—চিরকাল।

ম্যাক্সিমাম পরিষেবা

যদি আপনার ত্বকের জন্য কোনটি সেরা হবে জানতে চান, বা ত্বক পরিচর্যা বিষয়ে আপনার যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে এখানে লিখুন! কুমারী সঙ্গীতা যোশী, পোঃ অঃ বক্স নং ৬০৮৭, বম্বে-৪০০ ০০৫। আমরা আপনাকে সাহায্য করবো।

AXIMUM

নিখুঁত সুন্দর ত্বকের জন্য

Enterprise/MR/29 Bn

HOTEL GUESTLINE DAYS - TIRUPATI
CLEANSE YOUR BODY, BEFORE YOU PURIFY YOUR SOUL.

Revel in the new world of hospitality brought to you by the Mahindra Group and Days Inns of America. Hotel Guestline Days, Tirupati is like no other hotel in Tirupati, international standards of comfort, cleanliness and efficiency come to you at a very sensible price. Nestling in the foothills of Tirumala, far from the madding crowd, Hotel Guestline Days is so situated that it offers you easy access to the holy shrine. The hotel is an oasis of comfort. Pleasant airconditioning provides you relief from the sweltering heat. A choice of restaurants-Plantain Leaf is a vegetarian's delight, it has a spotlessly clean independent kitchen. For others there is Wayfarer, a multi cuisine restaurant, and Hideout, the bar. The swimming pool is a balm to your tired body, a suite relieves your aching bones. We, at Hotel Guestline Days have made it far more than a mere hotel because a clean body is the beginning to a pure soul.

GUESTLINE DAYS
HOTELS & RESORTS

S I M P L Y D I V I N E

Hotel Guestline Days
14-37, Karkambadi Road, Tirupati 517507.
Phone (08574) 20366, 22246.
Telex: 0403-248 DAYS IN, Fax: 08574-21774

Corporate office Bangalore: 531696, 532882.
General Sales Agents: Ahmedabad 420440, 402084, 427428, Madras 474942, 474939
Hyderabad 235885, 241167.
Bombay 231346, 231337.

Write to us and we'll send you details on Pilgrimage and Conference.

Name: ____________
Address: ____________
____
Phone: ____________
I would like to know more about....
☐ Pilgrimage ☐ Conference
AM

ROOMS: SINGLE Rs. 395/- DOUBLE Rs. 595/-

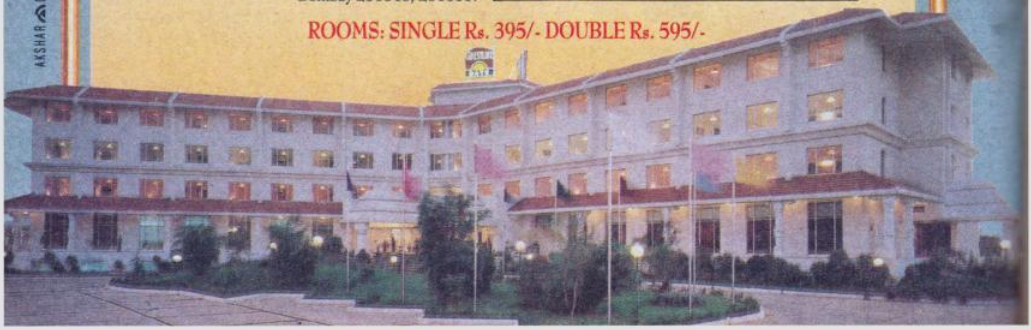

AKSHAR GD/93050

ওয়েস্ট ইন্ডিজই এখন ক্রিকেটে বিশ্বসেরা

ওয়েস্ট ইন্ডিজ বরাবরই ক্রিকেটে প্রধান শক্তি বলে বিবেচিত। এখন তারা প্রায় অপ্রতিরোধ্য।
লিখেছেন **তানাজি সেনগুপ্ত**

ফুটবলে যেমন ব্রাজিল, ক্রিকেটে তেমনই ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ব্রাজিলের ফুটবলে আছে শাম্বা নাচের ছন্দ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ক্রিকেটে পাওয়া যায় ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ক্যালিপ্‌সো সঙ্গীতের মূর্ছনা। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানদের ক্রিকেটের প্রতি আকর্ষণ জন্মগত। এঁদের খেলায় তাই পাওয়া যায় আনন্দ আর রোমাঞ্চ। কী টেস্ট ক্রিকেটে, কী একদিনের ম্যাচে, সব কিছুতেই বেশির ভাগ সময়ই আমরা লক্ষ করেছি ওয়েস্ট ইন্ডিজের আধিপত্য। এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজই নিঃসংশয়ে বিশ্বের সেরা ক্রিকেট-শক্তি। কিছুদিনের মধ্যেই তাদের কাছে একে-একে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং সম্প্রতি পাকিস্তান। শুধুমাত্র খেলার ফলাফলেই নয়, যে-পরিমাণ আধিপত্য নিয়ে রিচি রিচার্ডসনের দল একের-পর-এক ম্যাচ খেলেছে, তাতেই বোঝা যায়, দক্ষতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজই এক নম্বর। যদিও গত বিশ্বকাপ ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিততে পারেনি, তা সত্ত্বেও এখন তাদের চ্যালেঞ্জ জানাবার শক্তি কোনও দেশেরই নেই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সরকারিভাবে টেস্ট ক্রিকেট খেলা শুরু করে ১৯২৮ সালে, ইংল্যান্ড সফর দিয়ে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত তারা ২৯৯টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছে (পাকিস্তানের সঙ্গে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচ পর্যন্ত), জয় ১১৬টিতে, হার ৭১টি এবং ড্র ১১১টিতে। পরিসংখ্যানেই বোঝা যায়, হারের চেয়ে জয়েই তারা বেশি অভ্যস্ত। ফ্র্যাঙ্ক ওরেল থেকে গ্যারি সোবার্স, ভিভ রিচার্ডস থেকে এখনকার রিচি রিচার্ডসন পর্যন্ত প্রত্যেকেই অধিনায়ক হিসেবে সফল। সাফল্যের বিচারে অবশ্য সেরা—ক্লাইভ লয়েড। ১৯৮৪ মরসুমের শুরু থেকে টানা ১১টি টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতেছে, ২৬টি টেস্টের একটিতেও তাদের কেউ হারাতে পারেনি, ১৭টি জয় এবং সাতটি ড্র হয়। এবং প্রত্যেকটি জয়ই অত্যন্ত সাবলীলভাবে, বিপক্ষকে বিধ্বস্ত করে। লয়েডের নেতৃত্বেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ তিনটি বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠে, তার মধ্যে দুটিতে জয়। ১৯৮৩ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে হারে ভারতের কাছে। এখন পর্যন্ত পাঁচটি বিশ্বকাপে দু'বার জয়ের

ল্যারি নিকোলাই কনস্টানটাইন

ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

গ্যারি সোবার্স

ভিভ রিচার্ডস

রিচি রিচার্ডসন

ডেসমন্ড হেন্স

ব্রায়ান লারা

কার্টলে অ্যাম্ব্রোজ

কার্ল হুপার

ফিল সিমন্স

নজির একমাত্র ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে প্রতিভাবান ব্যাটস্ম্যানের সংখ্যা কোনওদিনই কম ছিল না। ল্যারি নিকোলাই কনস্টানটাইন হলেন প্রথম ক্রিকেট 'হিরো'। ব্যাটে, বলে, ফিল্ডিং-এ তিনি চৌকস ছিলেন। প্রখ্যাত ক্রিকেট-লেখক নেভিল কাডর্স লিখেছেন, "যথার্থ ক্রিকেট প্রতিভা ছিলেন তিনি।" প্রতিভার দিক থেকে কিছু কম ছিলেন না জর্জ হেডলি। পৃথিবীর সেরা ব্যাটস্ম্যানদের তালিকায় সর্বদাই তিনি থাকবেন। কাট এবং ড্রাইভে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। অনেকে তাঁকে বলতেন 'কৃষ্ণকায় ব্রাডম্যান'। হেডলি মাত্র ২২টি টেস্টে ১০টি সেঞ্চুরি করেছিলেন, এখনকার দিনে অকল্পনীয় বলা যায়। কনস্টানটাইন এবং হেডলি যত বড় ব্যাটস্ম্যানই হোন না কেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিন্তু প্রথমদিকে দল হিসেবে তেমন সাফল্য পায়নি। সেই স্বাদ আনলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। ১৯৬০-এর দশকে অধিনায়ক হিসেবে চমকপ্রদ সাফল্য এনেছিলেন ওরেল। তারও আগে ওরেলের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেয়েছিল আরও দুই 'ডব্লু'কে। ক্লাইভ ওয়ালকট এবং এভার্টন উইকসকে, একই দ্বীপ থেকে এই তিনজন এসেছিলেন এবং এক মাইলের মধ্যে ছিল এই তিনজনের বাড়ি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের গৌরবময় উত্থানের মূলে এই তিনজনের অবদান অবিস্মরণীয়। ইংল্যান্ডের অধিনায়ক লেন হাটন আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "এঁরা যখন ব্যাট হাতে উইকেটে জমে যেতেন, আমি শুধু ভাবতাম যদি আর চার-পাঁচজন অতিরিক্ত ফিল্ডার পাওয়া যেত!" ওরেল ছিলেন অত্যন্ত স্টাইলিস্ট ব্যাটস্ম্যান, ওয়ালকট প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক এবং উইকসের রানক্ষুধা ছিল অদম্য। ১৯৬০-'৬১ মরসুমে ওরেলের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অস্ট্রেলিয়ায় দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে। সিরিজ-শেষে অভিভূত দর্শকরা চোখের জলে ক্যারিবিয়ানদের বিদায় জানান।

ওরেলের পর আসেন সোবার্স। পৃথিবীর সেরা অলরাউন্ডারদের অন্যতম সার গ্যারি সোবার্স ন' নম্বর ব্যাটস্ম্যান হিসেবে টেস্ট-জীবন শুরু করেন, আস্তে-আস্তে নিজেকে ব্যাটিং-অর্ডারের প্রথমদিকে অপরিহার্য করে তুললেন। বোলার হিসেবেও দলকে প্রভূত পরিমাণে সাহায্য করেছেন সোবার্স। তাঁর ফিল্ডিং ছিল চমৎকার। ৯৩টি টেস্টে সোবার্স রান করেছেন ৮০৩২, তাঁর উইকেটের সংখ্যা

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়কের মধ্যে সবচেয়ে সফল ক্লাইভ লয়েড। ১৮টি সিরিজে অধিনায়ক থেকে তাঁর পরাজয় হয়েছিল মাত্র দুটিতে। ৭৪টি টেস্টে তিনি অধিনায়ক ছিলেন। মাত্র ১২টিতে পরাজিত হয়েছিলেন।

২৩৫। ১৯৬৩-'৬৪ মরসুমে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের অধিনায়ক হন সোবার্স। ৩৯টি টেস্টে তিনি অধিনায়কত্ব করেন। সোবার্সের সময়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ অনেক টেস্টে অসাধারণ জয় পায়। রোহন কানহাই ছিলেন এই সময়ের দুর্দান্ত প্রতিভাবান ব্যাটস্ম্যান। সোবার্সের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের জয়ের হাল ধরেন ক্লাইভ লয়েড। লয়েডের প্রধান শক্তি অবশ্যই ছিল বিখ্যাত পেস ব্যাটারি। অবশ্য বরাবরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মূল শক্তি এই ফাস্ট বোলিং আক্রমণ। রয় গিলক্রিস্ট, ওয়েস হল, চার্লি গ্রিফিথ-এর পর '৭০-এর দশকে মাইকেল হোল্ডিং, হোল্ডার, অ্যান্ডি রবার্টস, জোয়েল গানরি, কলিন ক্রফট এবং পরে ম্যালকম মার্শাল, বর্তমানে কোর্টনি ওয়াল্স এবং কার্টলে অ্যাম্ব্রোজ—যে-কোনও ব্যাটস্ম্যানের কাছেই আতঙ্কের মতো। এই ফাস্ট বোলারদের মাঝেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে খেলে গেছেন তিন বিশ্বসেরা স্পিনার—সোনি রামাধীন, অ্যালফ ভ্যালেন্টাইনএবং ল্যান্স গিব্স। লয়েড তাঁর দলে সেরা পেসারদের সঙ্গে-সঙ্গে পেয়েছিলেন গর্ডন গ্রিনিজের মতো ওপেনার এবং ভিভ রিচার্ড্সের মতো প্রতিভাবান ব্যাটস্ম্যান। ব্যাটস্ম্যান লয়েড ছিলেন আক্রমণাত্মক; কিন্তু অধিনায়ক লয়েড চূড়ান্ত সতর্ক, কূটকৌশলী এবং বুদ্ধিমান। সেরা ক্রিকেটারের সমাবেশে এবং অধিনায়কত্বের গুণে লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। ক্যারিবিয়ানদের সেরা সাফল্য এই সময়েই। ভিভ রিচার্ড্সের নেতৃত্বেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয়ের স্বাদ পেয়েছে, কিন্তু কিছু ম্যাচে তাঁকে হারতেও হয়েছে বিশ্রীভাবে।

রোহন কানহাই

কিথ আথারটন

কোর্টনি ওয়াল্‌শ

উইনস্টন বেঞ্জামিন

অ্যাভারসন কামিংস

ইয়ান বিশপ

লয়েডের নেতৃত্বের গুণ এখন আবার দেখা যাচ্ছে রিচি রিচার্ডসনের মধ্যে। রিচি এই মরসুমে বিশ্বের সেরা ব্যাটস্‌ম্যানের স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্রিনিজ ও লয়েডের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম দিকের ব্যাটিংয়ে নির্ভরতা দিয়েছেন রিচার্ডসন। ভিভ রিচার্ডসকে সরিয়ে তাঁকে যখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক করা হয় দু' বছর আগে, তখন অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবে সফল হলেও রিচার্ডসন অধিনায়ক হিসেবে সাফল্য পাবেন না। কিন্তু সে-ধারণা যে ভুল, তা এখন প্রমাণ করে দিয়েছেন রিচি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে জিততে পারেনি ঠিকই, কিন্তু তারপরই তাদের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তানকে, কিছুদিন আগে দুর্ধর্ষ শক্তিশালী অ্যালান বর্ডারের অস্ট্রেলিয়াকে এবং বিশ্ব ক্রিকেটের 'ডার্ক হর্স' দক্ষিণ আফ্রিকাকে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তাদের হারিয়ে অভিজ্ঞ অধিনায়ক বর্ডারের সিরিজ জয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন রিচি। এই সিরিজেই রিচির অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পেয়েছে এক ঐতিহাসিক জয়। চতুর্থ টেস্টে মাত্র এক রানে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে রেকর্ড করেছেন তাঁরা। এর আগে কোনও টেস্ট ম্যাচের নিষ্পত্তি এত কম রানে হয়নি। রিচার্ডসনের দলের এই একের-পর-এক জয়ের কারণ কী ? প্রধান কারণ, রিচার্ডসনের এই দলে

কুথবার্ট গর্ডন গ্রিনিজ শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজেরই নন, বিশ্বের অন্যতম সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে স্বীকৃত। বার্বাডোজের এই ক্রিকেটার ছিলেন অত্যন্ত আক্রমণাত্মক।

একটি চমৎকার ভারসাম্য আছে। রিচার্ডসনকে বাদ দিয়ে বিশ্বের দুই সেরা ব্যাটস্‌ম্যান এবং দুই ফাস্ট বোলার এখন দলে আছেন। এঁরা প্রত্যেকেই এখন দারুণ ফর্মে। ৩৭ বছর বয়স্ক অভিজ্ঞ ওপেনার ডেসমন্ড হেনস ৭০০০ রান পূর্ণ করলেন পাকিস্তানের বিপক্ষে। দুটি টেস্টে সেঞ্চুরি করেন ও প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে দলকে টেনে নিয়ে গেলেন শেষপর্যন্ত। তাঁকে দুনিয়াকাঁপানো দুই ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আক্রম ও ওয়াকার ইউনুস আউট করতে পারেননি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে এখন আছেন '৯০ দশকের অন্যতম সেরা ব্যাটস্‌ম্যান তরুণ ব্রায়ান লারা। বাঁ-হাতিদের মধ্যে অবশ্য তিনিই সেরা। কঠিন পরিস্থিতিতে যেভাবে ফাস্ট ও স্পিন বোলিংকে তিনি আক্রমণ করতে পারেন, আর কারও মধ্যেই সেরকম দেখতে পাওয়া যায় না। দুর্দান্ত বোলিংকে একমাত্র তিনিই পারেন মেরে তছনছ করে দিতে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বেশ কয়েকটি জয়ের নায়ক লারা।

রিচার্ডসনের দলের এখন প্রধান অস্ত্র বিশ্বের সেরা ফাস্ট বোলার কার্টলে অ্যাম্‌ব্রোজ। তাঁর মতো বিধ্বংসী বোলার বিশ্ব-ক্রিকেটে আর কেউই নেই। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে পঞ্চম টেস্টে এই কিছুদিন আগে মাত্র এক রানে সাতটি উইকেট নিয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিলেন অ্যাম্‌ব্রোজ। এই সাতটি উইকেট নেন মাত্র ৩২টি বলের মধ্যে। তাঁর ইয়র্কার এবং দু' দিকের সুইংকে ভয় পায় না, এরকম ব্যাটস্‌ম্যান নেই বলা চলে। অ্যাম্‌ব্রোজের সঙ্গে আছেন আর-এক দুর্দান্ত ফাস্ট বোলার কোর্টনি ওয়াল্‌শ। এঁদের সঙ্গে আছেন ইয়ান বিশপ এবং প্যাট্রিক প্যাটারসন। যেমন এঁদের বলের জোর, তেমনই এঁদের অভ্রান্ত বলের নিশানা। রিচার্ডসন এঁদের সঙ্গেই দলে পেয়েছেন অফ স্পিনার কার্ল হুপারকে। সদ্য অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে পাকিস্তানকে একাই শেষ করে দেন হুপার। অর্থাৎ, সব মিলিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলে এখন একটি চমৎকার ভারসাম্য এসেছে। সেজন্য দলটি টেস্ট এবং একদিনের ম্যাচ—দুটিতেই সাফল্য পাচ্ছে। এর প্রধান কৃতিত্ব অবশ্যই রিচি রিচার্ডসনের।

ওয়েসলি হল

অ্যান্ডি রবার্টস

গোয়েন্দা গল্প

একটি টিকিটের সূত্রে

শিবায়ন ঘোষ

শেষ পর্যন্ত রবি পুলিশে চাকরি পেল। অথচ চাকরির আগে পর্যন্ত ও বলত, "পুলিশের চাকরিতে আমি নেই, ভাই। দরকার হলে কালুমুদির দোকানের দাঁড়িপাল্লায় বসে তেল, নুন, ডাল, পোস্ত, চিনি মাপতেও রাজি আছি।"

এই বাল্যবন্ধুটার স্বভাবচরিত্র আমাদের আদ্যোপান্ত জানা। একে খুব নরম মনের ছেলে, মজবুত শরীর-স্বাস্থ্য নিয়েও কেমন যেন কুঁকড়ে থাকে, তার ওপর ওর বাবা স্কুলের শিক্ষক। কাজেই ওর স্বপ্ন থাকতেই পারে অধ্যাপনা করার। অথচ হল উলটো। দেখা গেল, এক ঝকঝকে শরতের সকালে রবি হুট করে কলকাতায় চলল পুলিশের চাকরি করতে।

আমরা তো, যাকে বলে, একদম হাঁ হয়ে গেলাম।

বছর ছয়েক পরে ফিরে এসে রবি অন্যরকম ভাষায় বলতে শুরু করল, "আসলে কী জানিস, বাঁচার জন্যে একটা কিছু তো করতে হবেই, একটু তো লেখাপড়া শিখেছি। নিছক কালুমুদির দোকানে তো আর বসতে পারি না, তাই।"

আমরা মজা করে বলতাম, "শেষে না আবার খুন দেখে মূর্ছা যাস, দেখিস। তুই তো আবার ভয় পেয়ে কুঁকড়ে কেন্নো হয়ে যাস।"

কথাটা বোধ হয় রবির গায়ে লাগল। ও বলল, "এখন আর আমি আগের রবি নেই। যে চাকরির যা শর্ত। আসলে আমাদের ট্রেনিংটা বড্ড কড়া। সাধারণ লোককেও পুলিশ করে দেয়। আর তা ছাড়া, খাকি পোশাকটার একটা মন্ত্রশক্তি আছে।"

"গায়ে চড়ালেই মেজাজ চড়ে, তাই না?"

বড় ভাল বলল কথাটা শিশির।

নৌকোর পাটাতনে বসে প্রতিদিনের মতো বিকেলের আড্ডা চলছিল আমাদের। সবাই তো গ্রামছুট। পুজোর ছুটিতে এই যা কয়েকদিনের জন্য বন্ধুদের দেখাসাক্ষাৎ। তাও পুজোর ছুটির অনেক আগে থেকে বন্ধুদের মধ্যে চিঠি-চালাচালি হয়। শেষ অবধি দেখা যায় তবুও দু-একজন এসে পৌঁছয় না। যেমন, এবারে অনিমেষ এল না। গত বছর আমিও আসিনি।

তো পুজোয় এসে যে ক'দিন থাকি আমরা, রোজ বিকেলটা এই নদীর ধারে ছিপ নৌকোগুলির ওপরে বসে গল্পে-গানে কাটাই। সুখ, দুঃখ, চাকরিবাকরি নিয়ে কথাবার্তা হয়।

একমাত্র রবি ছাড়া আমরা বিশাল কেরানিকুলের এক-একজন। সেদিক থেকে আমাদের চোখে ওর চাকরির একটা আলাদা মেজাজ, তেজ, গাম্ভীর্য ও রহস্য আছে।

কথাটা আমিই তুললাম। বললাম, "আচ্ছা রবি, তোদের চাকরিতে তো অনেক রহস্য, রোমাঞ্চ, খুন, রাহাজানি, লুটতরাজ, ডাকাতি আছে?"

রবি চট করে কথাটা গায়ে মেখে নিয়ে বলল, "অনেক, অনেক। শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবি। এখন চাকরিটায় আমি বেশ মজা পাই। এমন এক-একটা ঘটনা ঘটে, শুনলে তোদের দমবন্ধ হয়ে যাবে। এই তো কয়েকদিন আগেই একটা অদ্ভুত খুনের তদন্ত করলাম।"

রবিকে এতক্ষণে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পেরে আমি নিজেকে নিজেই বাহবা দিচ্ছি। শিশির গল্পের গন্ধ পেয়ে চোখ নাচাল। পরিতোষ ও গৌতম টানটান হয়ে উঠে বসল।

রবি এখন চায়ের বদলে কফি খায়। সবাই চা আর কফির কাপে চুমুক দিচ্ছি। রবি বলল, "পুলিশকে ছোট ভাববি না।"

"উহু, কাগজে লেখে বটে একটু আধটু—"

সেই মুখফোঁড় শিশির। আমার হাতের কড়া একটা চিমটি খেয়ে বলল, "দুঃখিত ! সরি ফর ইন্টারাপশন !"

গৌতম উৎসাহ দিতে রবি বলল, "পুলিশ পারে না এমন কাজ নেই। হঠাৎ একটা তদন্তের ভার মাথায় চেপে বসলে প্রথমে একটু বিরক্তির বোঝা মনে হয়, কিন্তু এগোতে-এগোতে যখন অদ্ভুত একটা কিনারা পাওয়া যায়, তখন যে কত আনন্দ ! শোন, আমার এই ছোট্ট চাকরিজীবনের সেরা একটা তদন্তের কথা বলি।

"এটা ধর অক্টোবর, সেটা হচ্ছে চোদ্দই অগস্ট। সারারাত ডিউটি করে ক্লান্ত, চোখ টেনে আসছে ঘুমে। থানায় ফিরে ভাবছি, কোয়ার্টারে গিয়ে স্নানটান করে একপ্রস্থ নাক ডাকিয়ে ঘুম দেব। ঠিক এমনই সময়ে টেলিফোন বেজে উঠল।

"রিসিভার কানে দিয়ে চমকে উঠলাম।

"'হ্যালো ? হ্যাঁ, কী বলছেন ? বুবু সেন ? বুবু সেন খুন হয়েছেন ? আশ্চর্য ? কী নাম বললেন ? হ্যাঁ, আপনার নাম ? হ্যাঁ, ক্ষুর দিয়ে কাটা মনে হচ্ছে ?'

"নামটা বলল না।

"চটপট বেরোতে হল। দু'জন কনস্টেবল নিয়ে জিপ ছুটল বুবু সেনের বাড়ি। কাছেই। ভাল কথা, বুবু সেন সম্বন্ধে তোদের দু-চার কথা বলা দরকার।

"বুবু সেন হচ্ছেন ওখানকার নামী ক্লাবের সেক্রেটারি, তার ওপর অত্যন্ত প্রভাবশালী যুবক। বুঝতেই পারছিস, কী কঠিন দায়িত্ব এসে পড়ল হুড়মুড় করে, কাঁধের ওপরে। আমি ঠিক তাল পাচ্ছি না।"

পরিতোষের মধ্যে চাঞ্চল্য, পরের রহস্যের জন্য। গল্পের গন্ধ পেয়ে শিশির, গৌতম নড়েচড়ে বসল, আর আমি তো বলতে গেলে উদ্যোক্তা। বললাম, "তারপর ?"

"হুঁ, তারপরটাই আসল।"

বলে, রবি যেন এই এখনই তদন্তে এসেছে এমনভাবে বলল, "বুবু সেনের ঘরের বাইরে অনেক লোক। কলেজ, স্কুলের ছেলেমেয়েরাও ভিড় করে আছে। জোর স্লোগান চলছে, 'বুবু সেনের খুনি। পাকড়াও এক্ষুনি' ইত্যাদি।

"এই সময় পুলিশের নুয়ে পড়লে চলে না। আমি বেশ কঠিন হয়ে আছি। ভিড় কাটিয়ে ঘরে ঢুকলাম। মেঝেতে পড়ে আছেন বুবু সেন। উপুড় হয়ে, গায়ে কোনও জামা নেই, পরনে পাজামা। হাত দুটি দু' দিকে ছড়ানো। আমার নির্দেশে এক কনস্টেবল দেহটা বন্দুকের কুঁদো দিয়ে চিত করে দিতেই, বুকটা, কী বলব, ছ্যাঁত করে উঠল। ভীষণ, মর্মন্তুদ দৃশ্য। পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে গেছে। জমাট বেঁধে গেছে রক্ত। ইঞ্চি আটেক তো হবেই। ধারালো ছুরি দিয়ে আড়াআড়ি পেটের এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত চিরে দিয়েছে। কী নির্মম ! মুখে বাঁধা বুবু সেনের পাশবালিশের ওয়াড়। বোঝা যায়, ছুরি মারার পরেও খুনি ওর ওপর প্রাণপণ শক্তিতে চেপে বসে ছিল, তেমন নড়াচড়া করতে দেয়নি। নইলে রক্তটা মেঝেতে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। কাজ শেষ করে তবেই খুনি পালিয়েছে।"

"বলিসনি, বলিসনি, আমার কেমন বমি-বমি পাচ্ছে, রক্ত আমি একদম চোখে দেখতে পারি না।"

গৌতম কথাটা বলামাত্র, পরিতোষ কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলল, "উঠে যা, তোর থেকে কাজ নেই ! তবু তো গল্প শুনছিস, সত্যি-সত্যি হলে যে কী করতিস !"

খোঁচা খেয়ে গৌতম চুপ হয়ে গেল।

রবি বলতে শুরু করল, "অর্থাৎ, একটা ব্যাপার নিয়ে আমাদের সন্দেহ রইল না। এটা বোঝা গেল যে, পরিষ্কার একটা খুন, এটা কোনও আত্মহত্যা নয়। তারপর তো যা হয়ে থাকে। ফরেনসিক রিপোর্টের জন্যে অনেক কিছু নেওয়া হল। লাশটা পাঠানো হল মর্গে। মর্গের গুমোটে মর্গের আর কী !"

রবির মধ্যে এখনও কবিতার চোরা ঢেউটা একটু-আধটু আছে, তা বোঝা গেল !

রবি খুব বেশি কফি খায় এখন। বোধ হয় টেনশনে থাকলেই বেশি খায়। ও কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, " শেষে মুশকিল হল তদন্তে। কোনওভাবেই খুনের কিনারা পাওয়া যাচ্ছে না। ওপর থেকে বারবার ফোন আসছে তদন্তের ফলাফল জানতে চেয়ে। আর ওখানকার আর-এক যুবক পলু মিত্তিরের নেতৃত্বে প্রায় রোজ রুটিনমাফিক থানা ঘেরাও হচ্ছে, বুবু সেনের হত্যাকারীকে ধরার জন্যে চাপ দিয়ে। চিন্তা কর, পুলিশের চাকরির কী সাঙ্ঘাতিক হ্যাপা !"

বর্ষায় তখন নদীতে ইলিশ ধরা চলছে। আমাদের খুব কাছেই ইলিশের জালে অনেক ইলিশ আটকেছে দেখে, শিশির বলল, "দ্যাখ, দ্যাখ, কী সুন্দর সব ইলিশ, আঃ, ডিম আর তেল খেতে যা লাগবে না ?"

শিশির কথার মধ্যে বড্ড কথা বলে। একটা প্রসঙ্গে কথা হচ্ছে, ও হঠাৎ করে আর-একটা প্রসঙ্গ এনে মূল সুরটাই কেটে দেয়।

রবিও হয়েছে তেমন ! কোথায় হবে

বাংলার অধ্যাপক, হয়ে বসল পুলিশ। সেও শিশিরের কথায় তাল দিয়ে বলল, "জলের রুপোলি আকাঙ্ক্ষা।"

আমি আর পরিতোষ আবার রবিকে কবিতার ভাবরাজ্য থেকে তদন্তের রাজ্যে টেনে নামালাম।

আমি বললাম, "তারপর কী হল, সেইটে বল। শেষপর্যন্ত ধরতে পারলি ?"

"না ধরে উপায় আছে ? তবে ভাগ্যের জোরে।"

"তোরা ভাগ্যটাগ্য মানিস ?"

এটি পরিতোষের গলা। গলাটা আমারও হতে পারত। আসলে রবি একটু নাস্তিক গোছের। বন্ধুরা মজা করে বলি 'হাফ-নাস্তিক', 'ওয়ান-থার্ড আস্তিক'— এইরকম। এমনিতে ভূত, ভগবান, ভাগ্য-ভবিষ্যৎ সেরকম মানে না, কিন্তু ঘোরতর বিপদে পড়লে বা আশঙ্কা করলে চুপিচুপি মন্দিরে গিয়ে গড় হয়ে আসে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে শ্বেতবেড়েলার মূল-শেকড় ডান হাতের অনামিকায় পরে নেয়। স্বভাবতই যে বন্ধুর নাড়ি-নক্ষত্র আমাদের জানা আছে, তার সম্বন্ধে এরকম প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

রবি কথাটার পাশ কাটাল। বলল, "ভাগ্য মানে ঠিক তোরা যে-ভাগ্য ভাবছিস, সেরকম নয়। তোদের বোঝার সুবিধে হবে বলে ভাগ্য কথাটা ব্যবহার করলাম।"

বলে, বেশ উত্তর দিতে পারা গেছে ভেবে নিজে একটু মুচকি-মুচকি হেসে নিল। এবং তারপর বলতে শুরু করল বাকি ঘটনাটা :

অনেক খুনের ঘটনা বইয়ে পড়েছি বটে, কিন্তু এটি হচ্ছে একদম নতুন।

বুবু সেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল পলু মিত্তির। বুবু সেন সেক্রেটারি, তো পলু মিত্তির ক্যাশিয়ার। একজনকে ছাড়া অন্যের চলে না। দু'জনেই বেকার। দু'জনের মধ্যেই অদ্ভুত বনিবনা। বললে কিংবদন্তি মনে হবে।

দু'জনে হঠাৎ কী খেয়ালে লটারির টিকিট কাটল। কথা রইল, যার টিকিটেই লাগুক, দু'জনে আধাআধি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে।

বিড়ালের ভাগ্যেও শিকে তো ছেঁড়ে, অতীতে কখনও নিশ্চয়ই ছিঁড়েছিল, অন্তত একবারও, নইলে কথাটা চালু হত না। তো সেরকম কতকটা কাকতালীয় ভাবে দেখা গেল, পলু মিত্তিরের টিকিটে লটারির প্রথম পুরস্কার পাঁচ লাখ টাকা লেগে গেল। ট্যাক্স ফ্যাক্স বাদ দিলেও লাখতিনেক থাকবে। অর্থাৎ পলু দেড় লাখ, বুবু সেন দেড় লাখ।

কী আনন্দ তখন দু'জনের। এতদিনের দীর্ঘ বেকারত্ব ঘুচল। দিনে অন্তত বার দশ-বারো শলাপরামর্শ হচ্ছে, কী করবে টাকা দিয়ে ! পলু মিত্তির প্রস্তাব দিল, "স্রেফ ব্যবসা ! ভাবছি, শিলিগুড়ির দিকে একটা কাপড়ের দোকান খুলব, পাইকারি। ওখানে আমার বড় মেসো থাকে। দোকান-টোকান পাওয়া কঠিন হবে না।"

"এই কয়টা টাকায় পাইকারি ব্যবসা ? তোর মাথা খারাপ ?"

বুবু সেন উৎসাহ দিচ্ছে না।

"আরে বাবা, মাথা আমার খুব সাফ। তিন লাখ টাকা মূলধন হিসেবে লগ্নি করলে, বড়বাজারে এমন ব্যবসায়ী আছে, তোকে দশ লাখ টাকার কাপড় দেবে। তিন লাখ ক্যাশ থাকলে, আরও সাত লাখ বিশ্বাস কেনা যায় ?"

চোখেমুখে আনন্দ ফুটে উঠল বুবু সেনের। বলল, "বেশ তো, তুই কাল-পরশুর মধ্যে শিলিগুড়ি রওনা হয়ে যা, আমি বড়বাজারে যোগাযোগ করছি।"

যেদিন এ-কথা হল, তার দিন দুয়েকের মধ্যেই খুন হয়ে গেলেন বুবু সেন, অর্থাৎ, ওদের দুই প্রাণের বন্ধুর স্বপ্ন সত্যি হল না।

এমনকী কাজটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল পর্যন্ত। নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনের পোস্ট অফিসের সিলমোহর নিয়ে বুবু সেনের নামে একটা চিঠিও এল। তাতে লেখা :

প্রিয় বুবু,

তোর কথামতো শিলিগুড়ির এদিকে এসে একটা ভাল দোকানের খোঁজ পেয়েছি, বড় মেসো খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। দোকানটা চলবে বলেই বিশ্বাস। তুই কথাবার্তা বলে পাকা ব্যবস্থা করে রাখিস। আমি দু-একদিনের মধ্যেই ফিরছি। ভাল থাকিস। ব্যস্ত আছি। শুভেচ্ছা।

পুলিশ যে পুলিশ, সেও আফসোস করল চিঠিটা পেয়ে। ইস্, দুটো বন্ধুর এত সুন্দর একটা স্বপ্ন এভাবে মাটি হয়ে গেল !

বাকি কথা শোনা যাক রবির নিজের মুখে, নিজের ভাষায়।

"আমি তখন উঠেপড়ে লেগেছি। ঘুম নেই, খাওয়া নেই। আর-সব ফাইল একপাশে করে বুবু সেনের কেস নিয়ে সময় কাটছে। একটিই প্রশ্ন। কে খুন করল ? কে আততায়ী ? উদ্দেশ্যই বা কী ? বিশেষ করে পৃথিবীতে যার এখনও ভালমতো শত্রু তৈরি হওয়ারই বয়স হয়নি ?

"সঞ্জয় বসুকে ধরে আনা হল। গত বছর

ক্লাবের নির্বাচনে বুবু সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। এ-বছর নির্বাচনের আগেই তাঁর পথের কাঁটা সাফ করতে তাঁর ছোরা নিয়ে ফুঁসে উঠতেই পারে।

"কিন্তু লাভ হল না। সঞ্জয় বসু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, 'এসব ভুল সন্দেহ দারোগাবাবু, হাজার হোক, বুবু তো আমারও বন্ধু, ক্লাস নাইন পর্যন্ত একই স্কুলে পড়েছি। ভেতরে আমাদের কখনও অমিল নেই। ওর জন্ডিস হলে আমিই বিছানার কাছে কাটিয়েছি।'"

"'টেলিফোন করেছিলেন কেন ?'

"'কাকে দারোগাবাবু ?'

"'চোপ ! গলা চিনতে পারিনি ভাবছেন ?'

"'আমি টেলিফোন করিনি ! নেভার। টেলিফোন— টেলিফোন— এসব কী বলছেন ?'

"সঞ্জয় বসু প্রায় কেঁদেই ফেললেন। ছলছল চোখ, কাঁদো-কাঁদো মুখ। এমনকী, বুবু সেনের মা এবং বাবাও একযোগে জানালেন, 'সঞ্জু আমাদের ছেলের মতন, ওকে অপদস্থ করবেন না।'

"'বেশ, আপনার কাকে সন্দেহ হয় ?'

"সঞ্জয় বসু চুপ করে থাকলেন।

"'বলুন শিগগির ?'

"'কাউকেই না।' সঞ্জয় বসু খুব স্পষ্ট

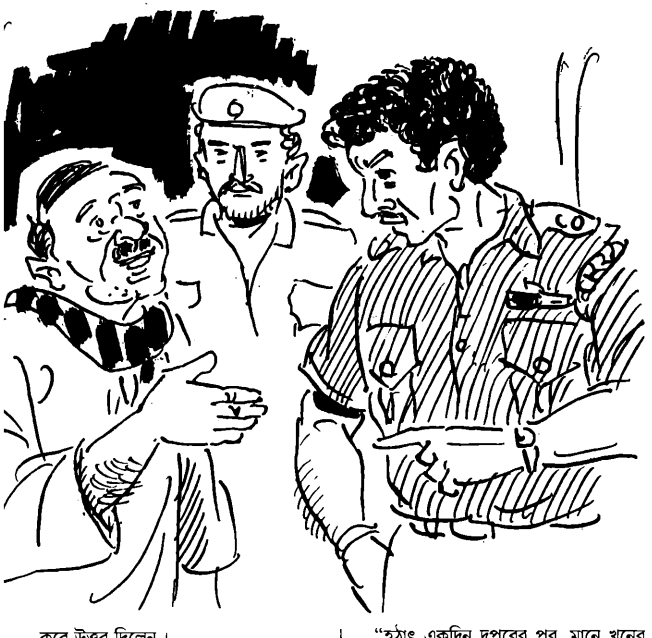

করে উত্তর দিলেন।

"মাথায় অবশ্য আমাদের অনেক নাম ছিল। তাদের প্রত্যেককেই জেরা করা হল। বিশেষ করে, নটরাজ টোবাকো ফ্যাক্টরির মালিক নিত্যগোপাল পালকে পাকড়ে আনা হল। লোকটার নাকি অনেক কাঁচা টাকা আছে। লোকমুখে প্রকাশ, পলু মিত্তির টিকিটে টাকা পাওয়ার পর কালো টাকাটাকে সাদা করার জন্যে প্রিমিয়াম দিয়ে টিকিটটা কিনতে চেয়েছিল। পলু রাজি ছিল, কিন্তু বুবু সেন আদর্শের প্রশ্ন তুলে নাকচ করে দেয়। তার পক্ষে রাগবশত কিছু করে থাকা সম্ভব।

"কিন্তু সেটিও মিস-ফায়ার। সেও শোনামাত্র ভয়ে যাকে বলে হকচকিয়ে গেল। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, 'এ অধমের কাজ আমাকে দিয়ে হতে পারবে না দারোগাবাবু। বুবু সেন আমাকে যে কাকাবাবু বলে ডাকত!'

"অর্থাৎ সুবিধে হল না।

"ইতিমধ্যে ফরেনসিক রিপোর্ট এল, জানা কথা, কী থাকতে পারে। চেনা পরিচিত কারও সম্বন্ধে কোনও হদিস মিলছে না।

"চোখে তখন আমার ঘুম নেই। রাতগুলি কাটছে যেন দিন।

"হঠাৎ একদিন দুপুরের পর, মানে খুনের দিন ছয়েকের মাথায় জেল সদর থেকে খবর এল, শিলিগুড়ি থেকে নাকি রেডিয়োগ্রামে বার্তা এসেছে, পলু মিত্তির সম্বন্ধে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে। প্রয়োজনে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হল, ওর বাড়ি সার্চ করতে।

"দ্যাখ, ঘটনা কোনদিকে গড়ায়। সার্চ করা হল প্রায় তখনই। কিন্তু কিছু নেই। নো ক্লু!"

"কিন্তু পলু মিত্তিরকে সার্চ করা হল কী ব্যাপারে?"

শিশির উৎসাহিত, আমিও। আমরা সবাই।

রবি রহস্য খেলিয়ে বলল, "আছে, আছে। রিজন হ্যাজ।"

বলেই ফের জানাল, "প্রথমেই যা করলাম, শুনলে অবাক হয়ে যাবি? হঠাৎ আমার মাথায় একটা খটকা লাগল। তখুনিই শিলিগুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। জানালাম, 'হ্যালো, সার্চ তো বিফল হয়ে গেল। নো রেজাল্ট! আমাকে নিশিকান্তের ঠিকানাটা দিন।'

"'লিখুন, কেয়ার অব সম্রাট সেলুন।'

"'সম্রাট সেলুন?'

"ভাল শোনা যাচ্ছিল না, আমি আবার প্রশ্ন করলাম। 'সেলুন? মানে...'

"'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুল-দাড়ি কাটে যে সেলুনে!'

"ও-প্রান্তের উত্তর পাওয়ার পর, বাকি আর কিছু শুনিনি পর্যন্ত। সঙ্গে-সঙ্গে একাই জিপ হাঁকড়ে হাজির হলাম সম্রাট সেলুনে। নিশিকান্ত ধাড়া ওখানকার বয়স্ক কর্মচারী। কথামতো মেয়ের বিয়ের পাত্র দেখতে দিন কয়েক ছুটি নিয়ে মুর্শিদাবাদ গেছে।

"সেলুনের মালিককে জেরা করলাম। বললাম, 'বলতে পারেন, নিশিকান্ত ক'টা ক্ষুর ব্যবহার করত?'

"সেলুনের মালিক চোখ বড় করে বলল, 'দাঁড়ান দারোগাবাবু, এক মিনিট।'

"বলে, সেলুনের মালিক নয়ন পাত্র ডাক দিল, 'মদনা আছিস? হেই মদনা?'

"রোগামতো কমবয়সী একটা ছেলে এসে ভয়ে-ভয়ে নমস্কার করে দাঁড়াল।

"আমাকে কিছুই বলতে হল না, নয়ন পাত্রই বলল, 'নিশিকান্তর ক'টা ক্ষুর পাওয়া যাচ্ছে না?'

"'নতুনটা।'

"'আমি উঠছি নয়নবাবু। একটু কষ্ট দিলাম। পরে আপনাকে দরকার হতে পারে, আর হ্যাঁ, ওই ছেলেটিকে থাকতে বলবেন।'

"'তা হলে তুই বলছিস, খুনটা নিশিকান্তই করেছে?'

"হান্ড্রেড পারসেন্ট। তোদের বোধ হয় মনে আছে, প্রথম যখন টেলিফোনে বুবু সেনের খুনের খবর পাই, তখন ও-প্রান্তের লোকটি 'ক্ষুর দিয়ে কাটা হয়েছে' বলে সন্দেহ করেছিল।"

"হুঁ, তাই তো।"

গৌতম এতক্ষণে একটা কথা বলল।

পরিতোষ মজা করল, "বোবা কথা বলছে, আহা রে!"

শিশির পরিতোষকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "কিন্তু নিশিকান্ত যে খুন করেছে, কারণ কী?"

"দাঁড়াও পথিকবর! জন্ম যদি তব বঙ্গে। বলছি, অধৈর্য হোয়ো না।

"নিউজলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে সেদিন টিকিটের জোর চেকিং হচ্ছে দুর্নীতির নানা অভিযোগে।

"চেকারের হাতে টিকিট দিয়ে প্রায় গেট পেরিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল সম্রাট সেলুনের বয়স্ক কর্মচারী নিশিকান্ত ধাড়া, কিন্তু টিকিটের দিকে এক পলক দেখেই চেকার খপ করে ওর হাত পাকড়ে ধরল। শুধু তাই নয়, সোজা শ্রীঘরে। টিকিটে বয়স লেখা ছাব্বিশ, অথচ নিশিকান্তের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি।

"জেরার উত্তরে ফাঁস করে দেয়, সে আসলে পলু মিত্তিরের কাছ থেকে টিকিটটা নিয়েছিল।

"শিলিগুড়ি পুলিশের তখন আনন্দ অনেক। এই বুঝি জাল টিকিট-চক্রের খোঁজ পেয়েছে তারা। আর তখনই তো জেলা সদরে রেডিয়োগ্রামে খবর পাঠিয়ে পলু মিত্তিরের বাড়ি রেইড করতে বলল।"

রবি একটু থামতেই আমরা চারজন প্রায় সমস্বরে বললাম, "তারপর কী হল ? খুনটা কে করেছে ? পলু মিত্তির, না নিশিকান্ত ?"

"ধীরে বৎস, ধীরে।"

একটু থেমে বলল রবি, "পলু মিত্তিরও তো প্রভাবশালী। তাকে গ্রেফতার করতে হলে পুলিশের নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। "পলু মিত্তিরও খুব জনপ্রিয়। সেও অনেক লোককে ঘোল খাইয়েছে এ-পর্যন্ত। একটুও দমে গেল না, বাজের শব্দ বলে বোমার শব্দ উড়িয়ে দিতে পারে। পালটা ধমক দিয়ে বলল, 'এটা অন্যায়, নিছক সন্দেহবশত কাউকে গ্রেফতার করার অর্থ তার সাংবিধানিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। নো মিস্টার দারোগা, কোর্টে নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে ফিরে এলে, ফলটা টের পাবেন।'

"'ইয়েস, আই নো দ্যাট। আপাতত...।'

"রিভলভার তেমনই তাক করা, আমি চোখের মুদ্রায় জিপটা দেখালাম।"

"সত্যি চমকপ্রদ ব্যাপার।"

আবার সেই শিশিরের মন্তব্য। পরিতোষ ওকে একটু ধমকের সুরে বলল, "ফুট কাটবি

টিকিটটা একটা বড় সূত্র, কিন্তু একমাত্র নয়।"

"কেন, কেন ?"

"পলু মিত্তির যে চিঠিটা লিখেছে শিলিগুড়ি থেকে। সেটিও একটা রেলেভেন্ট ডকুমেন্ট। একজন লোক মেটেরিয়াল টাইমে এখানে এবং শিলিগুড়িতে তো আর থাকতে পারে না!"

সবাই আমরা হকচকিয়ে গেলাম, তাও তো বটে! এটা একটা কথা।

শেষে রবিই বলল, "তো হ্যাঁ, পালটা রেডিয়োগ্রাম করে শিলিগুড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পলু মিত্তিরের মেসোর সঙ্গে পলু মিত্তিরের দেখাই হয়নি। অর্থাৎ, পলু মিত্তির কাছাকাছি কোথাও আত্মগোপন করে ছিল।

"আমি তখন সময় নষ্ট না করে, একদম বুকের কাছে রিভলভার তাক করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, 'হুঁ, এতদিনে একজন আসল বন্ধু চেনা গেল।' না।"

রবি বেশ পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, "আরও কী আশ্চর্য দ্যাখ, নিশিকান্তকে সার্চ করে যা-যা পাওয়া গেল, তার তালিকাও করা হল। পুলিশ ওকে ডাকাতও ভেবেছিল।"

আমাদের প্রশ্ন করার আগেই বলল, "ঝকঝকে তাজা কারখানার গন্ধে ভরপুর প্রায় হাজার চব্বিশ টাকা পাওয়া গেল নিশিকান্তের কাছ থেকে।"

"রিয়েলি ?"

এবার কিন্তু আমিই বলে ফেললাম।

"কোথাকার টাকা জানিস ?"

"ব্যাঙ্ক-ডাকাতির ?"

"সত্যি ? তোরা হতাশ করলি, তোরা ওই যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, লসাগু, গসাগু করগে যা। একটুও যদি খুপরিতে কিছু থাকে ?"

রবি কার্যত আমাদের সবাইকে এক পাল্লায় ওজন করে ফেলল। তারপর বলল, "লটারির টাকা। পলু মিত্তিরের টাকার সিরিয়াল নম্বর আর নিশিকান্তের কাছে পাওয়া টাকার সিরিয়াল নম্বর ক্রম-অনুযায়ী। ব্যস, গ্রেট সাকসেস। পুলিশকে বোকা বানানোর জন্যে নিজের নামের টিকিটটা দিয়ে নিশিকান্তের মতো গবেটকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়েছে, আবার একটা চিঠিও লিখে দিয়েছে বুবু সেনের নামে। বেচারা নিশিকান্ত! কথামতো ট্রেন থেকে নেমেই চিঠিটা পোস্টও করেছিল, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বেরোতে গিয়ে বিপদ ঘটাল।"

"তুই হলে কী করতিস ?"

শিশির নয়, এবারে মৌনমুখর সেই গৌতম বলল।

"আমি হলে টিকিট না দিয়ে অন্য একটা ট্রেনে চেপে ঘুরে বেড়াতাম, পকেটে টাকা আছেই। কোনও এক কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার গিয়ে নামতাম।"

"চমৎকার ফন্দি করেছিল, যা হোক!"

"হুঁ, উদ্ভাবনী ক্ষমতা বটে! ভাল পথে লাগালে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেত!"

যথাক্রমে শিশিরের এবং আমার কথা দুটোকে টেনে নিয়ে রবি বলল, "এমনি-এমনি কি আর হয় ? গাড্ডায় পড়লে হয়। তখন মগজের কোষগুলো বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। আবার কী জানিস, কয়েকদিন আগে পলু মিত্তির বেশ আচ্ছা করে বাবু-ছাঁট দিয়ে এসেছে চুলে। কেটেছে ওই নিশিকান্ত। বেচারার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, হাজার হোক বাবা তো!"

নদীর জল ভাটার টানে অনেক নীচে নেমে গেছে। নৌকো আটকে গেছে পলিতে। চাঁদের হালকা আলো পড়েছে জলে। এখন ডাঙায় উঠতে আমাদের চটিজুতো হাতে নিতে হবে।

যে-যার মতন পাড়ে উঠেছি, পরিতোষ প্রশ্ন করল, "সত্যি, এখন বল, চাকরিটা কেমন লাগছে ?"

"ভেরি থ্রিলিং। কালকে আর-একটা ঘটনা বলব, সেটাও প্রায় এরই কাছাকাছি জটিল। পুলিশে ঢুকে এখন বুঝছি, এ-চাকরিতে একটা চ্যালেঞ্জ আছে। একজন ক্রিমিন্যালের সন্ধান পেলে যে কেমন আনন্দ হয়, কী বলব ? এখন তো আমি কোনও কঠিন তদন্ত পেলে খুব খুশি হই, বেশ খোরাক হয়। আগ বাড়িয়ে টেনে নিই হাতে। চাকরি বলিস, জীবন বলিস, চ্যালেঞ্জ, শুধু চ্যালেঞ্জ।"

ছবি : দেবাশিস দেব

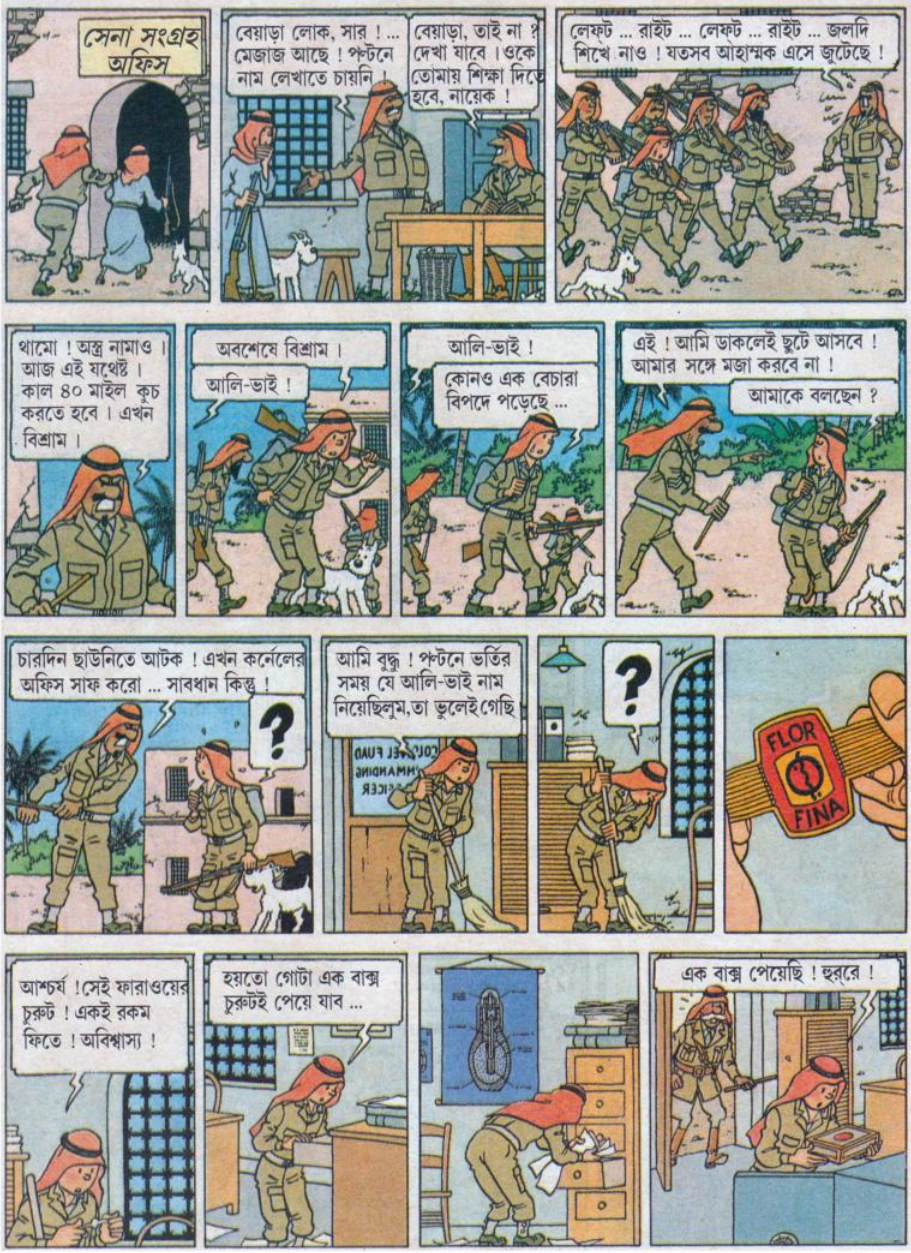
সেনা সংগ্রহ অফিস
বেয়াড়া লোক, সার ! ... মেজাজ আছে ! পল্টনে নাম লেখাতে চায়নি !
বেয়াড়া, তাই না ? দেখা যাবে । ওকে তোমায় শিক্ষা দিতে হবে, নায়েক !
লেফট ... রাইট ... লেফট ... রাইট ... জলদি শিখে নাও ! যতসব আহাম্মক এসে জুটেছে !
থামো ! অস্ত্র নামাও । আজ এই যথেষ্ট । কাল ৪০ মাইল কুচ করতে হবে । এখন বিশ্রাম ।
অবশেষে বিশ্রাম ।
আলি-ভাই !
আলি-ভাই !
কোনও এক বেচারা বিপদে পড়েছে ...
এই ! আমি ডাকলেই ছুটে আসবে ! আমার সঙ্গে মজা করবে না !
আমাকে বলছেন ?
চারদিন ছাউনিতে আটক ! এখন কর্নেলের অফিস সাফ করো ... সাবধান কিন্তু !
?
আমি বুদ্ধু ! পল্টনে ভর্তির সময় যে আলি-ভাই নাম নিয়েছিলুম, তা ভুলেই গেছি
?
FLOR
FINA
আশ্চর্য ! সেই ফারাওয়ের চুরুট ! একই রকম ফিতে ! অবিশ্বাস্য !
হয়তো গোটা এক বাক্স চুরুটই পেয়ে যাব ...
এক বাক্স পেয়েছি ! হুররে !

ফারাওয়ের চুক্তি

গুপ্তচর ! রক্ষীকে ডাকো !
COLONEL FUAD
COMMANDING OFFICER
যাও, ওকে গ্রেফতার করে ঘরে তালা দিয়ে রেখে দাও !
এই আমার ভাগ্য ! ঠিক যখন রহস্যের কিনারা করতে যাচ্ছিলুম ...
গুপ্তচরবৃত্তি ... যুদ্ধের সময় ... এবার আমি সত্যিই বিপদে পড়েছি ...
... আদালতের রায় হল— কাল সকালে সিপাই আলি-ভাইকে গুলি করে মারা হবে ... শাস্তির কথা বন্দিকে জানিয়ে দেওয়া হোক !
আমাকে গুলি করে মারা হবে ... কুট্টুস রে... এই তা হলে শেষ !
একটা চিঠি ... "সাহস রাখো— সাহায্য আসছে। জনৈক বন্ধু।" জনৈক বন্ধু ? ... এখানে ? ...
পৃথিবীতে আমার শেষ দিন, যদি না ...
টিনটিন ! ... টিনটিন ! ...
?
কে ... তুমি কে ?
শশ্ ! ... এই নাও উখা। গরাদে কেটে ফ্যালো।
জলদি করো ! ভোর হয়ে এল ...
খস্স্ খস্স্ খস্স্
হয়ে গেছে !
জলদি এসো !
সময় নেই !
আসছি !
মুক্ত !
থামো ! নইলে গুলি করব !
!

গোয়েন্দা গল্প

জুহু বিচে তদন্ত

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

সকালে ঘুম থেকে উঠে বাগানে একটু পায়চারি করে যখন কেয়ারি-করা রঙ্গন গাছগুলোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছি, ঠিক তখনই রাখহরি এসে খবরের কাগজটা হাতে দিল। কাগজের প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর একটি সংবাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চমকে উঠলাম। এক অদ্ভুত প্রতারণার খবর।

রাখহরি বলল, "আপনার চা কি এখানে নিয়ে আসব ?"

আমি রাখহরির মুখের দিকে একটুক্ষণ স্থিরভাবে চেয়ে থেকে বললাম, "নাঃ, থাক। আমিই ভেতরে যাচ্ছি।" বলে ঘরে এসেই ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম। যেখানে ফোন করলাম, সেখানে লাইন ঠিকমতো পাওয়া গেলেও ফোন ধরল না কেউ। অর্থাৎ সোনালি অ্যাপার্টমেন্টের ওই ঘরটিতে এখন কেউ নেই।

ফোন নামিয়ে রেখে আমি যখন ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে খবরের বিষয়বস্তুর ওপর মন রেখেছি, রাখহরি তখন চা নিয়ে এল। সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

আমি বিস্কুট খেয়ে চায়ে চুমুক দিলাম। যে খবরটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে, তা এইরকম, গতকাল দুপুরে বউবাজার অঞ্চলে একটি গয়নার দোকানে অভিনব কায়দায় প্রতারণা করা হয়েছে। দুপুর একটা নাগাদ এক দম্পতি একটি দোকানে এসে লক্ষাধিক টাকার গয়না কেনেন। তারপর সেল ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য রসিদ না নিয়েই চলে যান। দোকানদারও টাকা গুনে সিন্দুক ভর্তি করে খদ্দেরকে বিদায় দেন। এইরকম খদ্দের যে এই প্রথম তা নয়, মাঝেমধ্যেই এইরকম দু-একজন আসেন। সম্পত্তি কেনাবেচার ব্যাপারেও এইরকম ফাঁকিবাজি চলে। তিন লাখ টাকার সম্পত্তিকে দু'লাখ টাকা দেখিয়ে দলিল করা হয়। এতে অনেক টাকার স্ট্যাম্পপেপার বেঁচে যায়। সে যাক, রহস্য ঘনাল এর পরেই। ওই দম্পতি গয়না নিয়ে চলে যাওয়ার পরই আরও দু'জন খদ্দের আসেন। এ-ক্ষেত্রেও একজন পুরুষ, অন্যজন মহিলা। তাঁরাও ওই একই দামের গয়না কিনে নিয়ে রসিদ নিয়ে যখন উঠে আসতে যান, নাটক তখনই জমে। দোকানদার বিনীতভাবে বলেন, "আমার টাকাটা ?"

দম্পতি বলেন, "টাকা তো আপনাকে দিয়ে দিয়েছি।"

দোকানদারের চোখ কপালে উঠে যায়, "সে কী মশাই, কখন আমাকে টাকা দিলেন ?"

দম্পতি শুরু করেন চেঁচামেচি, "ঠগ, জোচ্চোর, মিথ্যেবাদী।" সে এক মহা কেলেঙ্কারি। খদ্দের ও দোকানদারের চেঁচামেচিতে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। পুলিশ আসে। পুলিশ এসে দম্পতিকে বলে, "আপনারা যে টাকা দিয়েছেন, তার কোনও প্রমাণ আছে?"

দম্পতি বলেন, "আছে বইকী। প্রতিটি নোটের নম্বর আমাদের কাছে নোট করা আছে। এই দেখুন।" পুলিশ তখন দোকানদারের সিন্দুক খুলিয়ে টাকা বের করে নোটের নম্বর মিলিয়ে দেখে। প্রতারকরা সসম্মানে তাঁদের গয়না নিয়ে চলে যান। আর দোকানদার? মাথা হেঁট করে বসে থেকে জনসাধারণের ধিক্কার এবং বিদ্রূপাত্মক বাক্যবাণ হজম করতে থাকেন।

চাঞ্চল্যকর এই সংবাদটা পড়ে দেখলেই বোঝা যায় প্রতারণার ব্যাপার সুপরিকল্পিত। অর্থাৎ দুই দম্পতি একই চক্রের হয়ে কাজ করেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে দোকানকার এই প্রতারণার বলি হয়েছেন তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। নাম গুণধর পাইন। ফরসা রং। মাঝারি চেহারা। সব সময় মুখে পান আর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। এ হেন লোক যে খদ্দেরকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে কেন এমন ভুল করলেন, তা ভেবে পেলাম না।

কাগজটা নামিয়ে রেখে যখন বিষয়টা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করছি সেই সময় রাখহরি এসে বলল, "এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।"

"উনি কি একাই, না সঙ্গে কেউ আছেন?"

"বারো-চোদ্দ বছরের একটি ছেলেও আছে।"

"ওঁদের ভেতরে আসতে বলো। আর চা করো সকলের জন্য।"

একটু পরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। চেহারা না দেখেই বললাম, "আসুন, গুণধরবাবু, আসতে আজ্ঞা হোক।"

গুণধরবাবু বিনয়ের হাসি হেসে বললেন, "কী করে জানলে আমি এসেছি?"

"আজ সকালে আপনার গুণের খবর কাগজে ফলাও করে ছাপা হয়েছে দেখেই অনুমান করেছি, এইবার আমার কথা আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়বে।"

গুণধরবাবু নিজে থেকেই আসন গ্রহণ করলে বললাম, "এই ছেলেটি কে?"

"আমার একজন কর্মচারী।"

রাখহরি চা দিয়ে গেলে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বেশ ভাল করে শুনলাম গুণধরবাবুর মুখ থেকে। শুনে বললাম, "এখন আমাকে আপনি কী করতে বলেন?"

গুণধরবাবু বললেন, "শোনো ভাই, আমার তো যা হওয়ার তা হয়েইছে। এই ব্যাপারে আইন আদালত করতে গেলে কর ফাঁকি দেওয়ার অপরাধে আমিই ফেঁসে যাব। বহু কষ্টে পুলিশি ঝামেলার হাত থেকেও রেহাই পেয়েছি। এখন আমি চাই, এই প্রতারকদের তুমি খুঁজে বার করো।"

"তাতে লাভ? আপনার গয়না কি আপনি ফেরত পাবেন?"

"না। গয়নাও পাব না। টাকাও না। তবু চাই এই জাল ছিঁড়ে যাক। অপরাধী ধরা পড়ুক।"

আমি বললাম, "এই ধরনের অপরাধীর শাস্তি পাওয়া অবশ্যই দরকার, কিন্তু এই জনবহুল শহরে কোথায় কোনখানে যে রয়েছে তারা, কোন সূত্র ধরে তা আবিষ্কার করব? এই মুহূর্তে তারা যে পুনে কিংবা বাঙ্গালোরের কোনও কফি হাউসে বসে নেই তাই বা কে বলতে পারে?"

"তা হলে?"

"চেষ্টা অবশ্যই করব। করছিও।" বলেই আর একবার উঠে গিয়ে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম।

এবারে সাড়া এল, "হ্যালো!"

"ইনস্পেক্টর ভদ্র? আমি অম্বর বলছি। অম্বর চ্যাটার্জি।"

"হ্যাঁ বলুন। কী ব্যাপার?"

"একটু আগে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করেছিলাম।"

"আমি মার্কেটিংয়ে গিয়েছিলাম।"

"আপনার ঘরে কেউ নেই? ফোন ধরল না কেন?"

"জানেন তো আমি ব্যাচিলর মানুষ। আর কাজের লোকটির আন্ত্রিক দেখা দেওয়ায় তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"বেশ করেছেন। একটা ব্যাপারে আমি আপনার একটু হেল্প চাইছি। কাল বউবাজারে একটি গয়নার দোকানে...।" লাইনটা হঠাৎই কেটে গেল।

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "আপনার গাড়ি আছে?"

"গাড়ি নিয়েই এসেছি আমি।"

"তা হলে ড্রাইভারকে বলুন, একবার সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে আমাদের নিয়ে যেতে।"

"সেটা কোথায়?"

"কোলার স্বর্ণখনির কাছে নয়, এই কলকাতার মধ্যেই।"

রাখহরিকে আজকের জন্য একটু মাংস-ভাত করে রাখতে বলে গুণধরবাবুকে নিয়ে সোনালি অ্যাপার্টমেন্টে এলাম।

ইনস্পেক্টর ডি.কে. ভদ্র একজন সুদর্শন যুবক। পুলিশের চাকরিতে ওঁর মতো ভদ্র যুবকের সত্যিই প্রয়োজন। খুব শান্ত প্রকৃতির কিন্তু রাগলে ভীষণ।

আমরা যেতে সাদর অভ্যর্থনা করে বসালেন আমাদের। তারপর ধীরেসুস্থে গুণধরবাবুর মুখ থেকে সবকিছু শুনে বললেন, "দেখুন, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ না বের হয়। তবে কলকাতা শহরের বুকে দিনদুপুরে এইরকম প্রতারণা সত্যিই নজিরবিহীন। এখন আমাকে কী করতে হবে বলুন?"

গুণধরের হয়ে আমি বললাম, "দেখুন, কেসটা যেরকম তাতে দোকানদারকে যে ব্ল্যাকমেল করা হচ্ছে এটা কি আপনি বুঝতে পারেননি? ওই দম্পতিকে চলে যাওয়ার সুযোগ না দিয়ে আপনি যদি ওদের জেরা করতেন, এত টাকা কোথা থেকে পেলেন সে-কথা জানতে চাইতেন বা ওদের পেছনে ধাওয়া করে ডেরাটা দেখে আসতেন তা হলে কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ত চক্রটা।"

ভদ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "এই কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়। এবং এই ভুলটা যে মারাত্মক তা আমিও স্বীকার করছি। কিন্তু মুশকিল হল গুণধরবাবু তখন চোখ-মুখের ভাব এমন করলেন যে, মনে হয়েছিল উনিই আসলে খদ্দেরকে ব্ল্যাকমেল করতে চাইছিলেন। তাই আমরা ওঁকেই ভর্ৎসনা করছিলাম। ইতিমধ্যে পাখি ফুড়ুত।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "ওই দম্পতি দু'জনকে এর আগে আপনি আর কখনও দেখেছিলেন?"

হতাশ গুণধরবাবু বললেন, "না ভাই। মনে তো পড়ছে না।"

গুণধরবাবুর সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল তাকে প্রশ্ন করলাম এবার, "তোমার নাম কী ভাই?"

"আমার নাম নন্দ।"

"তোমার বাড়ি কোথায়?"

নন্দর হয়ে গুণধরবাবুই বললেন, "ওর বাড়ি হরিপালের কাছে এক গ্রামে। বাপ-মা মরা ছেলে। আমার কাছেই মানুষ।"

নন্দকে বললাম, "ওই মুখগুলো আর একবার দেখলে তুমি চিনতে পারবে?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ পারব।"

"আচ্ছা, ওঁদের কাউকে আর কখনও এই দোকানে তুমি আসতে দেখেছিলে?"

"মনে হচ্ছে একবার যেন দেখেছিলাম।

দু-তিন মাস আগে এক মহিলা দুপুরবেলা এসে আমার কাছ থেকে ডিজাইনের বইটা চেয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কী সব দেখে ব্রজদার সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন।"

"ব্রজদা! ব্রজদা কে?"

"আগে কাজ করত আমাদের দোকানে।"

"এখন করে না?"

"না।"

আমি গুণধরবাবুকে বললাম, "সেদিন দুপুরে আপনি কোথায় ছিলেন?"

গুণধরবাবু বললেন, "আমি বরাবরই বিকেলের দিকে আসতাম এবং রাত অবধি থেকে ক্যাশ নিয়ে বাড়ি যেতাম। এখন ব্রজ চলে যাওয়ায় সব সময়ই আমাকে দোকানে থাকতে হয়।"

"আপনার সেই ব্রজ এখন কোথায়?"

"ও পাথর সেটিং-এর কাজ জানত। শুনেছি সেই কাজ নিয়ে ও এখন বম্বের জাভেরি মার্কেটে ভাল রোজগার করছে।"

"ওর বাড়ি কোথায় জানেন?"

"ডোমজুড়ের কাছে নিবড়ে নামে একটা গ্রাম আছে, সেইখানে। তবে ও বউবাজারেই মেসে থাকত। সেই ঠিকানাটা আমি জানি। কিন্তু ব্রজ অত্যন্ত ভাল ছেলে। ওকে সন্দেহ করার কোনও কারণ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

"সন্দেহ করছি না তো। তবে একেবারে হাল ছেড়ে না দিয়ে ভাই একটু ফুঁ দিয়ে দেখছি ছাইচাপা কিছু যদি থাকে।"

ইনস্পেক্টর ভদ্রর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বউবাজারের মেসে এসে ব্রজর বম্বের ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। ওর দু-একটা চিঠিপত্তর যা বন্ধুদের লিখেছিল, তা পড়ে দেখলাম। বম্বে থেকে পাঠানো ওর দু-একটা ফোটোও সংগ্রহ করলাম বন্ধুদের কাছ থেকে। যা গুণধরবাবুর কাছে নেহাতই অথহীন বলে মনে হল।

সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম দুপুর তখন দেড়টা। রাখহরি আমার জন্য হানটান করছিল। বলল, "আপনি এত দেরি করলেন দাদাবাবু! একটু আগে অশোকবাবু এসেছিলেন। আপনার জন্যে অপেক্ষা করে চলে গেলেন।"

"অশোকবাবু! মানে অশোক পালিত! সেই প্রেস ফোটোগ্রাফার ছেলেটি?"

"হ্যাঁ। বলে গেছেন আবার আসবেন সন্ধের সময়। আপনি যেন কোথাও যাবেন না। বিশেষ দরকার।"

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কী এমন দরকার যে, এইভাবে থাকতে বলল?"

"তা জানি না। তবে একটা কাগজ রেখে গেছেন। আপনাকে দেখতে বলেছেন।"

আমি ভেতরে ঢুকে পোশাক পরিবর্তন না করেই অশোকের রেখে যাওয়া কাগজের পাতায় চোখ বোলালাম। নতুন বেরিয়েছে কাগজটা। লোকের হাতে-হাতে না ঘুরলেও হকাররা রাখে। বিক্রিও হয়। সেই কাগজের প্রথম পাতায় বউবাজারের প্রতারণার বিবরণটা ফলাও করে ছাপা তো হয়েইছে, সেই সঙ্গে রয়েছে অশোকের তোলা একটি সুন্দর আলোকচিত্র। যাতে দেখা যাচ্ছে গয়নার বাক্স নিয়ে সেই দম্পতি অপেক্ষমাণ একটি মারুতিতে উঠছেন। এই ছবি একমাত্র এই একটি দৈনিকেই ছাপা হয়েছে।

কাগজটা রেখে মনের আনন্দে স্নান-খাওয়া সেরে বারবার সেই ছবির মুখগুলো দেখতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম এ জগতে কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়, অশোক পালিতও নয়, আর এই কাগজটাও নয়। সবারই কিছু-না-কিছু অবদান থাকে।

অশোকের কথামতো আমি সারাটা দিন ঘরে রইলাম। কিন্তু না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধে পার হয়ে গেল তবুও অশোক এল না। রাত্রিবেলা ওর কাগজের অফিসে ফোন করলাম। সেখান থেকেও ওর কোনও খোঁজখবর দিতে পারল না কেউ।

সে রাত্রে অশোকের জন্য অপেক্ষা করে করে আমি নিজেও কোথাও গেলাম না। পরদিন সকালে কাগজেই খবর পেলাম, অশোকের মৃতদেহ মধ্যরাত্রে কে বা কারা যেন ওদের অফিসের সামনে রাস্তার ওপর শুইয়ে রেখে গেছে।

শিউরে ওঠার মতো খবর। চক্রটি যে শুধু প্রতারণা করে, তাই নয়। খুন করতেও পিছপা হয় না। সামান্য একটি আলোকচিত্র প্রকাশ করার অপরাধে যারা একজন নিরীহ ফোটোগ্রাফারকে হত্যা করতে পারে তা যে কী সাঙ্ঘাতিক তা যে-কেউ ধারণা করতে পারবে। আমি সেই কাগজের কাটিং সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই গেলাম গুণধর পাইনের ওখানে। নন্দকে ছবিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এঁদের চিনতে পারো?"

নন্দ বলল, "হ্যাঁ। এরাই তো এসেছিল কাল।"

আমি সেই মহিলার ছবি দেখিয়ে বলেছিলাম, "ইনিই কি তোমার ব্রজদার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?"

"না। সে ছিল প্রথমজন।"

তারপর সোজা চলে এলাম সদর দফতরে। সেখানেও পুলিশের সংগ্রহে থাকা অপরাধীদের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে এই ছবির দু'জনের একজনেরও কোনও মিল পেলাম না। অবশেষে হতাশ হয়েই বাড়ি ফিরে এলাম।

কীভাবে যে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব, তা ভেবে পেলাম না। রহস্যের জট খুলতে পারি এমন কোনও সূত্রও খুঁজে পেলাম না কোথাও।

এখন একমাত্র ভরসা ব্রজগোপাল। তবে সেখানেও যে খুব একটা আশার আলো আছে, তা নয়। সে বেচারা নির্দোষও হতে পারে। দোকানে কত কাস্টমার আসে, তাদের সঙ্গে কথাও বলতে হয়। তবু...

তবু চেষ্টা একটু চালিয়ে যাই। সারাদিন অনেক চিন্তাভাবনা করার পর একটা উপস্থিত বুদ্ধি মাথায় এল। কাগজের কাটিংটা সঙ্গে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে খোঁজখবর শুরু করলাম। বেশি খুঁজতে হল না, শিয়ালদহেই উড়াল পুলের পাশে সাধারণ একটি লজের ম্যানেজার ছবি দেখেই বললেন, "কী আশ্চর্য! এঁরা তো আমাদেরই অতিথি। প্রায়ই আসেন এখানে।"

"আমি একটু দেখা করতে চাই।"

ম্যানেজার ঘাড় নেড়ে বললেন, "সরি। কাল রাতেই এঁরা চলে গেছেন ঘর ছেড়ে দিয়ে।"

"সেই ঘরে নতুন কেউ কি এসেছেন এখনও?"

"না। ঘর খালি আছে।"

"একবার দেখতে পারি ঘরটা?"

"আপনার পরিচয়?"

পরিচয় দিলাম। ম্যানেজার নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ওপরের ঘরে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও কিছুই যখন পেলাম না তখন হঠাৎ ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের মধ্যে কিছু বাজে কাগজের সঙ্গে একটা ট্রেনের টিকিট উদ্ধার হল। টিকিটটা বম্বে ভিটি টু হাওড়ার, পাঁচদিন আগেকার। টিকিটও দু'জনের। মিঃ পি কে সিনহা এবং মিসেস মিরার। ছবির বয়সের সঙ্গে বয়সও মিলে যাচ্ছে। আমি উৎফুল্ল চিত্তে টিকিটটা পকেটে নিয়ে সহযোগিতার জন্য ম্যানেজারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম হোটেল থেকে। কী ভাগ্যিস চাপরাশি কাগজগুলো ঘর ঝাঁট দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়নি।

পরদিন দুপুরেই গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে ভি.আই.পি কোটায় দুটো বার্থ নিয়ে চলে

এলাম বম্বেতে। অবশ্য একা আসিনি। ইনস্পেক্টর ভদ্রও সিভিল ড্রেসে সঙ্গে এসেছেন। কলকাতা থেকে একটা হোটেলে জানিয়ে এসেছিলাম। তাই আমাদের থাকার জন্য ঘরও রেডি ছিল।

যথাসময়ে বম্বে পৌঁছে হোটেলে খাওয়াদাওয়া করে রেস্ট নিলাম। প্রথমেই বম্বে পুলিশের সাহায্য নিয়ে আমরা রিজার্ভেশন টিকিট দেখিয়ে রেল দফতর থেকে উদ্ধার করলাম মিঃ সিনহার ঠিকানাটা। তারপর গেলাম ব্রজর খোঁজে।

পায়ধনির একটি তিনতলার ফ্ল্যাটে ব্রজগোপাল এম. কে. নম্বরির দোকানে কাজ করে। আমরা ওপরে উঠে খোঁজ নিতেই ওর শেঠ এসে বললেন, "ওকে তো আজ পাবেন না আপনারা। পেলেও ফিরতে অনেক রাত হবে।"

"কোথায় গেছেন উনি।"

"আন্ধেরিতে ওর দিদির বাড়ি। আপনারা?"

"আমরা ওঁকে দিয়ে কিছু কাজ করাব। তাই।"

"এ কাজে দায়িত্ব আমিও তো নিতে পারি?"

"আমরা কাল ওঁর সঙ্গে দেখা করব।"

আমরা সকালের দিকে অন্য কোথাও না গিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়া থেকে নরিম্যান পয়েন্ট হয়ে চৌপট্টি পর্যন্ত ঘুরলাম। তারপর বিকেলবেলা রোদের তেজ একটু কমলে মেরিন লাইন্স থেকে ট্রেন ধরে সোজা চলে এলাম আন্ধেরিতে। ঠিকানা আমাদের কাছেই আছে। রেল দফতর রিজার্ভেশন স্লিপ ঘেঁটে যে ঠিকানা আমাদের দিয়েছে সেটাও আন্ধেরির।

আন্ধেরির জুহুতে এসে সমুদ্রের ধারে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আমরা। তারপর খুঁজে বের করলাম মিঃ এবং মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটটাকে। খুবই উন্নতমানের ফ্ল্যাট। তবে দুঃখের বিষয় ঘরে তালা দেওয়া। আমরা সমুদ্রতীরে বসেই ফ্ল্যাটের দিকে নজর রাখলাম। আলো জ্বললেই ধরব।

এখানে জুহু বিচে এখন টুরিস্টের মেলা। বোম্বাইয়ের চৌপট্টির থেকেও এখানটা আরও আকর্ষক, লোভনীয়। অনেক রাত পর্যন্ত এখানে মানুষের মেলা বসে থাকে। এই শহর দিনে-রাতেও ঘুমোয় না তাই।

হঠাৎ একসময় একজনের দিকে নজর পড়ল আমার। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির এক যুবক সমুদ্রের দিকে মুখ করে বারবার সিগারেট ধরাতে গিয়ে ব্যর্থ হচ্ছে। বললাম, "একে কি একটুও চেনা-চেনা লাগছে মিঃ ভদ্র?"

"হ্যাঁ। ইনিই তো সেই ব্রজগোপাল।"

আমি লাইটারটা নিয়ে ব্রজর দিকে এগিয়ে গিয়ে ফট করে ওর মুখের সামনে জ্বেলে ধরলাম সেটা।

ব্রজ প্রথমে একটু চমকে উঠল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, "থ্যাঙ্কস।"

আমিও মিষ্টি হেসে ঘাড় নেড়ে ধন্যবাদ গ্রহণ করলাম।

ব্রজ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে যেতে চাইল।

আমি বললাম, "আপনাকে কলকাতায় কোথায় যেন দেখেছি মনে হচ্ছে।"

"ভুল দেখেছেন। আমি বম্বেতেই থাকি।"

"বউবাজারের কোনও সোনার দোকানে কখনও গেছেন কি?"

"মাঝে-মাঝে গেছি হয়তো, সোনাদানা কিনতে।"

"বোম্বাই থেকে কলকাতায় কেউ সোনা কিনতে যায়? আপনি গুণধর পাইনকে চেনেন?"

আর চেনা। ব্রজ অতর্কিতে আমাকে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, এক ঝটকাতেই ধরাশায়ী হলাম। তারপর আমি উঠে দাঁড়াবার আগেই দৌড় শুরু করল সে। ততক্ষণে মিঃ ভদ্র এসে চেপে ধরেছেন তাকে।

ব্রজ ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "কে, কে, কে আপনারা? আপনারা কারা? আমি আপনাদের চিনি না।"

আমি তখন ওর পেটের কাছে রিভলবার ধরে বললাম, "আমাদের তুমি নিশ্চয়ই চিনবে ব্রজদুলাল।"

"আমি ব্রজদুলাল নই। আপনারা ভুল করছেন। আমি ব্রজগোপাল।"

"এখানে কোথায় এসেছিলে? দিদির বাড়ি?"

"আমার কোনও দিদি-টিদি নেই।"

আমি খবরের কাগজের কাটিংটা ওর দিকে মেলে ধরে বললাম, "এঁদের তুমি চেনো? এরা কারা? এখানকার সাউথপয়েন্ট ব্লকে ফিফথ ফ্লোরে কারা থাকে?"

ব্রজ তখন দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেলল। বলল, "সব বলব আপনাদের। আমাকে ছেড়ে দিন। আপনারা নিশ্চয়ই পুলিশের লোক?"

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকে আমরা ওত পেতে আছি তোমাদের ধরবার জন্য। ওঁদের ফ্ল্যাটে তালা দেওয়া। কোথায় গেছেন ওঁরা?"

"আমরা সবাই গিয়েছিলাম বজ্রেশ্বরী। একটু আগেই ফিরেছি।"

"তা হলে চলো। ওঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় একটু করিয়ে দাও।"

জুহু বিচ ঘিরে তখন উৎসাহী জনতার কৌতূহলী দৃষ্টি। আমরা হাতের ইঙ্গিতে তাদের সরে যেতে বলে টেলিফোন বুথে গিয়ে লোকাল থানায় একটা ফোন করলাম। বোম্বাই পুলিশকে আগে থেকেই জানানো ছিল ব্যাপারটা। তারাই এখানকার ফোন নম্বর আমাদের দিয়েছিলেন। তাই অসুবিধে হল না।

আমরা ব্রজকে সঙ্গে নিয়ে মিঃ অ্যান্ড মিসেস সিনহার ফ্ল্যাটে যখন পৌঁছলাম, তখন আমাদের দেখেই ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন তাঁরা। আমাদের দু'জনের হাতে রিভলবার আর ব্রজগোপালের অবস্থা দেখেই ব্যাপারটা যে কী হতে চলেছে, তা অনুমান করতে পারলেন।

একটু পরেই স্থানীয় পুলিশও এসে গেল।

জেরার মুখে অপরাধ স্বীকার করল অপরাধীরা। উদ্ধার হল লক্ষাধিক টাকার সমস্ত গয়না। ব্রজগোপাল স্বীকার করল, এরাই তার নিজের দিদি-জামাইবাবু। এই জামাইবাবুই তাকে বোম্বাইতে নিয়ে আসেন। এইখানে বসেই এই অভিনব প্রতারণার পরিকল্পনা করে ওরা। উদ্দেশ্য, এইভাবে সোনা সংগ্রহ করে নিজেরা স্বাধীনভাবে এখানে একটা ব্যবসা করবে। তবে পার্ক স্ট্রিটের শম্ভু মালিক এবং তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আসল নাটের গুরু। প্রতারণা ছাড়াও আরও অনেক বাজে কাজ তাঁরা করে থাকেন। মিঃ সিনহাকে নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং অন্যান্য বড়-বড় শহরে বেশ কিছুদিন ধরে এইরকম প্রতারণার ফাঁদ পেতে আসছিলেন। শুধু ভাগ্য বিপর্যয়ে এইবার বমাল সমেত ধরা পড়লেন সকলে।

বোম্বাই পুলিশ প্রতারণার দায়ে তিনজনকেই গ্রেফতার করল। ওদিকে টেলিফোনে খবর পেয়ে কলকাতা পুলিশও অ্যারেস্ট করল শম্ভু মালিক ও তাঁর স্ত্রীকে। তাঁদের বিরুদ্ধে শুধু প্রতারণা নয়, খুনের অভিযোগও আনা হল।

আমরা গুণধরবাবুকেও পরদিন বিমানযোগে বোম্বাই আসতে বলে ভি.টি-তে ফিরে এলাম। এখন পূর্ণ বিশ্রাম। কাল গুণধরবাবু এলে ওঁর হাতে গয়নার বাক্স তুলে দিয়ে ভাবছি গোয়াটা একবার ঘুরে যাব।

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

গোয়েন্দা গল্প

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

সেদিন অবেলায়

বলটা গড়াতে গড়াতে দুটো তক্তার মাঝের ফাঁক দিয়ে টুপ করে ওপাশে চলে গেল।

অর্ক আসলে এ-সময় এখানে আসে না। আসে বিকেলবেলা। খেলাটা তখন জমে ওঠে। কিন্তু আজকের দিনটা অন্যরকম। শরীরটা সকালে ভাল ছিল না বলে স্কুলে-না-যাওয়াটা মা মঞ্জুর করেছেন। বাবা অফিসে। মা গেছেন বুলুমাসির বাড়ি। ফিরতে বিকেল কিংবা সন্ধে। মেঘের আড়ালে সূর্য মুখ লুকিয়েছে। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না।

"গেটের বাইরে যেয়ো না যেন," সবিতাপিসি বলেছিলেন। অর্ক বলটা হাতে নিয়ে নেমে এসেছিল। ছ'তলা ফ্ল্যাটবাড়িটার পেছন দিকে একচিলতে ফাঁকা জায়গা। লম্বা পাঁচিল ঘেরা। এখানে অর্ক এবং ওর বন্ধুরা ছাড়া আর কেউ বিশেষ আসে না। জায়গাটা অর্কর ভারী ভাল লাগে। বলটা আকাশের দিকে সোজা ছুড়ে দিয়ে আবার লুফে নিচ্ছিল সে। এবারেই ফসকে গেল।

উঁচু পাঁচিলটার ওপাশটা দেখা যায় না এমনিতে। কয়েকটা ইট সরে গিয়ে জমি ঘেঁষে ছোট্ট ফোকর, সেখান দিয়ে অর্ক দেখেছে ওপাশে ডাঁই করে রাখা লোহা-লক্কড়। 'কমলা এঞ্জিনিয়ারিং'-এর বন্ধ কারখানার পেছন দিক। ইটের ফোকরটা অবশ্য এখন নেই, পাঁচিলের ওদিক থেকে খাড়া দুটো তক্তা কারা আটকে দিয়েছে ক'দিন আগে।

কয়েক পা দৌড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গেল অর্ক। কী করে আনা যাবে বলটা? তক্তা দুটো না থাকলে কোনও অসুবিধেই ছিল না। কিন্তু এখন?

শেষ দুপুরের আকাশে মেঘ জমতে-জমতে এখন আকাশের রং ঘোলা হয়ে গিয়েছে। ফ্ল্যাটবাড়ির ছাদের কার্নিসে বসে দুটো কাক কা-কা ডেকে চলেছে। ধারেকাছে আর কেউ নেই।

ঘাসজমির ওপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল অর্ক। নিচু হয়ে তক্তার ফাঁকে হাত গলিয়ে দিল। না, বলটা নেই। আরও খানিকটা। হাতের আঙুলগুলো এপাশ-ওপাশ করেও হাত ঠেকল না কিছুতে। ওপাশের ঢালু জমিতে বলটা নিশ্চয় অনেকটা দূরে গড়িয়ে গেছে। নাগালের বাইরে। হাতটা টেনে বের করে নিয়ে দুটো তক্তার মাঝামাঝি সরু ফাঁকটায় চোখ রাখল অর্ক। বলটাকে যদি দেখা যায়।

চোখের দৃষ্টি স্থির হতেই অর্কর সারা শরীর নিথর হয়ে গেল। যেন কোনও সাড় নেই। ভাঙা ইটের ওপর হাতটাও বুঝি আটকে গেছে। নড়তে পারছে না অর্ক। সরে আসতে পারছে না।

কতক্ষণ এভাবে ছিল সে নিজেই জানে না। আচমকা একটা অচেনা চিৎকার যখন নিজেরই গলা ঠেলে বেরিয়ে এল, সংবিৎ ফিরল তার। ছিলে-ছেঁড়া ধনুকের মতো ছিটকে উঠে এল অর্ক, তারপরই দৌড়। ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ি আর পাঁচিলের মাঝের সরু প্যাসেজ দিয়ে সামনের দিকটায় এসে পড়ল। পাঁচিল ঘুরে এসে লোহার বড় গেট। তার ওপাশে রাস্তা। গেট খোলা নেই। এক মুহূর্ত থামল অর্ক। তাকাল গেটের দিকে। সে মুহূর্তেই দ্বিতীয় চিৎকারটা বেরিয়ে এল অর্কর গলা দিয়ে। লোকটাকে দেখল অর্ক। গেটের সামনে।

অর্ক দেরি করেনি। ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ি পেরিয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে দিলেন সবিতাপিসি।

"কী রে, কী হয়েছে? চলে এলি যে! হাঁফাচ্ছিস কেন?"

সবিতাপিসির কথা কানে ঢুকছে না। অর্ক শোবার ঘরের জানলায়। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে ওপর দিকেই। জানলা বন্ধ করে পিঠ চেপে দাঁড়াল অর্ক।

"কী হল তোর? কথা বলছিস না কেন?"

"একটু জল দাও।"

চোখটা বুজে ফেলল অর্ক। একটা গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার শব্দ কানে এল।

"এই নে জল।"

জলটা ঢকঢক করে খেয়ে ফেলল অর্ক। পেটটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠল। নিজেকে

সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল সে।

"হ্যাঁ রে, শরীর খারাপ করছে আবার ?"

মাথা নাড়ল অর্ক। "না।"

"কী যে হল, কিছুই বুঝতে পারছি না বাপু।"

"কিছু হয়নি। বলটা হারিয়ে গেছে।"

সবিতাপিসিকে এড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল অর্ক। চোখের সামনে ভাসছে একটু আগে দেখা দৃশ্যটা। লোকটা নিশ্চয় পাঁচিলের ওপাশ দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এসেছিল। কী অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছিল ওর দিকে। অর্ক যদি চিৎকারটা না করত !

অর্কর চোখের সামনে সব কেমন ঝাপসা হয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টি নামল ঝমঝম করে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দিগন্ত। বিকেল তিনটে। কাল বিকেল থেকে টানা বৃষ্টি হয়ে ঘন্টাখানেক আগে থেমেছে। আকাশে এখনও মেঘ। তার ওপর একফালি পশ্চিমি রোদ খেলা করছে। 'সুবর্ণ আবাসন'-এর গেটের সামনে এক মুহূর্ত দাঁড়াল দিগন্ত। কাছাকাছি কেউ নেই। আবাসনের সীমানার পাঁচিলের পাশে সরু পথটায় পা রাখল দিগন্ত। পাঁচিল ঘেঁষে লম্বাটুকু পেরিয়ে পেছনের কারখানার চত্বর। বড়-বড় লোহার বিম আর টুকরো লোহালক্কড়ে জায়গাটা ভরে আছে। তার মাঝে-মাঝে আগাছা আর ঘাস জন্মে গেছে। পাঁচ-ছ'বছর ধরে জায়গাটা এমনই পড়ে আছে। ওদিকের বড় রাস্তা থেকে এদিকে আসতে লোকে শর্টকাট হিসেবে এ জায়গাটুকু পেরিয়ে যায়। এমনিতে জায়গাটা সুনসান। চারদিকটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল দিগন্ত। কোনও অসঙ্গতি চোখে পড়ছে না। আবাসনের লম্বা পাঁচিল পাক খেয়ে আড়াআড়ি চলে গেছে। তার গা ঘেঁটে দুটো তক্তা দাঁড় করানো। জায়গাটাতে লম্বা-লম্বা ঘাস বর্ষার জল পেয়ে আরও বেড়ে উঠেছে। হাততিনেক দূরে লোহার বড় একটা চাকতি। মাটির সঙ্গে গাঁথা। চিন্তিত মুখে দিগন্ত বসে পড়ল চাকতিটার কাছে। এক সময় এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড রেজারভোয়ার ছিল। কারখানা বন্ধ হওয়ার পর থেকে পরিত্যক্ত পড়ে আছে। বিপজ্জনক জায়গাটা, জানা না থাকলে। ঘাসের মধ্যে কী যেন একটা চকচক করছে। হাতে তুলে দিগন্ত দেখল একটা দামি লাইটার। একটা কোনও নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা আছে। লাইটারটা পকেটে ঢোকাল দিগন্ত। তারপর লোহার ঢাকনির চারদিক খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল। আস্তে করে লোহার চাকতিটার একদিক ধরে চাপ দিতেই খুব সহজেই ঢাকনাটা সরে এল। ভিতরটা ঘন অন্ধকার। তলায় বোধ হয় জল জমে আছে। উৎকট ভ্যাপসা পচা গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল দিগন্তর। তাড়াতাড়ি ঢাকনাটা টেনে দিল। উঠে দাঁড়াতে খাড়া তক্তা দুটোর তলায় সবুজ আগাছার মধ্যে লাল একটা বল চোখে পড়ল। বলটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক দিগন্ত ফিরে এল সুবর্ণ আবাসনের গেটের সামনে।

আস্তে-আস্তে বিছানা থেকে নামল অর্ক। কাল নাকি ওর ভীষণ জ্বর এসেছিল। ভুল বকছিল। সবিতাপিসি বলেছেন। ডাক্তারকাকুকে নিয়ে এসেছিলেন বাবা। আজ এখন জ্বর নেই। শরীরটাও ঝরঝরে। আস্তে-আস্তে রাস্তার দিকের জানলাটার সামনে এসে দাঁড়াল অর্ক। অনেক বৃষ্টির পর মিষ্টি রোদে চারদিকটা ভারী ভাল লাগছে। নীচে গেটের দিকে তাকাল অর্ক। আবারও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সেই লোকটা। হাতের ইশারায় ওকে ডাকছে। দড়াম করে জানলাটা বন্ধ করে খাটের কাছে ছুটে আসতে গিয়েই মাথাটা ঘুরে গেল। কোনওক্রমে বিছানায় উঠতে পারল অর্ক।

"মা,সবিতাপিসি।"

"কী হয়েছে অর্ক ?"

"দরজাটা বন্ধ আছে ?"

"হ্যাঁ। কেন ?"

"সেই লোকটা আবার এসেছে।"

"কোন লোকটা অর্ক, ?"

অর্ক কোনও উত্তর দিল না। বালিশে মুখ গুঁজে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল।

"সুবর্ণ আবাসন ? মানে পূর্ণ দত্ত রোডের কাছে !"

"হ্যাঁ। আপনি চেনেন ?"

"ওখানে আমার এক রিলেটিভের বাড়ি ছিল। কমলা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের কাছে। আগে যেতাম। কী হয়েছে ছেলের ?"

অসীমবাবু গত চারদিনের কথা বলে গেলেন। টেবিলের ওপর পেপারওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে শুনলেন মৃগাঙ্ক সেন।

"বেশ, আপনি একটু বাইরে ওয়েট করুন। আমি দেখছি।

"অর্ক, ওই নীল আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকো। তোমার ঘুম আসছে। হাত ভারী হয়ে গেছে। শরীর ভারী হয়ে গেছে। তোমার পা নড়ছে না। চোখের পাতা ভারী হয়ে দু'চোখ ভরে ঘুম নেমে আসছে। শান্তির ঘুম। তোমার ভীষণ ভাল লাগছে। কোনও চিন্তা নেই। এই সুন্দর বিছানায় নরম আলোয় তুমি শুয়ে আছ।

"অর্ক। শুনতে পাচ্ছ ? আমি তোমায় ডাকছি। শুনতে পাচ্ছ ? অর্ক....."

আচ্ছন্ন অর্কর মৃদু কণ্ঠ জবাব দিল, "হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।"

"কী হয়েছিল সেদিন ? যেদিন তুমি একা-একা খেলতে গিয়েছিলে ?"

অর্ক বলতে লাগল।

অর্ককে একা বসতে বলে অসীমবাবুকে ডাকলেন ডঃ সেন।

"আচ্ছা অসীমবাবু, আপনাদের এলাকায় গত কয়েকদিনের মধ্যে কোনও অন্য ধরনের ঘটনা বা কোনও অ্যাকসিডেন্ট..."

"হ্যাঁ। একটা ব্যাপার হয়েছে। কবে হয়েছে জানি না। সুবর্ণ আবাসনের পেছন দিকের, মানে কমলা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের পোড়ো জায়গাটা থেকে পুলিশ আজ সকালে একটা লাশ পেয়েছে। ওখানে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড রেজারভোয়ারের মধ্যে কেউ দেহটা ফেলে রেখে গিয়েছিল। পুলিশ আশপাশে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করেছে।"

"হুঁ।" খুব চিন্তিত দেখাল ডঃ সেনকে।

"অর্কর কী হয়েছে, ডাক্তারবাবু ?"

"ও একটা স্ট্রেঞ্জ ডেসক্রিপশন দিচ্ছে। আমার মনে হয় ও কিছু একটা দেখেছে। বিশেষ করে একটি লোকের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছে অর্ক। হতে পারে ও মার্ডারটা দেখেছে। আর সেটাই ওর ভয়ের কারণ।"

"কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব ?"

"তা তো আমি বলতে পারব না। আচ্ছা, এই লাশটা যে পাওয়া গেছে অর্ক জানে ?"

"না।"

"সেটা ওকে না জানানোই ভাল। ব্যাপারটা একটা মিথ্যে ইলিউশন বলে ওর মন থেকে মুছে ফেলতে হবে। আমি চেষ্টা করব। ডঃ মিত্র যে ওষুধ দিয়েছেন, তাই চলবে। সামনের সপ্তাহে ওকে আবার নিয়ে আসবেন।"

"হ্যালো, রঞ্জিত আমি ডাঃ মৃগাঙ্ক সেন বলছি।"

"ও মৃগাঙ্কদা। বলুন, কী ব্যাপার ?"

"কমলা এঞ্জিনিয়ারিংয়ের বাউন্ডারির মধ্যে একটা লাশ পাওয়া গেছে নাকি ?"

"হ্যাঁ। আজ সকালে। তার সঙ্গে আপনার.."

"সম্পর্ক কিছু আছে। ব্যাপারটা একটু বলবে ?"

"মামুলি ব্যাপার। ক'দিন আগে মার্ডার হয়েছে। রেজারভোয়ারের মধ্যে কেউ বডিটা ফেলে গিয়েছিল। লাশটা আইডেন্টিফাই করার মতো অবস্থায় নেই। জমা জলে পচে গিয়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। মনে হয় মাথার পেছন দিকে আঘাত করা হয়েছিল। পোস্টমর্টেম করার জন্যে পাঠিয়েছি। ট্রেশ করার চেষ্টা করছি। রুটিন কাজ।"

"খবরটা পেলে কী করে?"

"সুবর্ণ আবাসনের পেছন দিকের সি ব্লকের তিনতলায় এক ভদ্রলোক থাকেন। তিনি গতকাল ফোন করেছিলেন। দিনচারেক আগে দুপুরের দিকে দু'জন লোককে তিনি নাকি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন। গতকাল ওই জায়গা থেকে নাকি প্রচণ্ড দুর্গন্ধ পেয়েছেন ভদ্রলোক।"

"আর কিছু?"

"না, না, এই ভদ্রলোক এটুকুই ইনফর্ম করেছেন। ওঁর পুরো স্টেটমেন্ট নিয়েছি। —না না, ওঁকে সন্দেহ করার কিছু নেই। আমরা জানি। নির্বিরোধ ভালমানুষ। একা থাকেন। কী ব্যাপার বলুন তো? আপনার হঠাৎ..."

"আজ একটা অদ্ভুত কেস পেয়েছি। ব্যাপারটা যদি মার্ডার হয়, তোমাকে হয়তো খানিকটা সাহায্য করতে পারি। মার্ডারারকে শনাক্ত করার মতো খানিকটা সূত্র বোধহয় আছে।"

"ডিটেলসটা বলুন।"

"ডিটেলসটা এখন বলা যাবে না। শুধু খুনির একটা ডেসক্রিপশন দিতে পারি। ঝাঁকড়া চুল, প্রায় ছ'ফুটের মতো হাইট, মেদবিহীন চেহারা, কালো ট্রাউজার আর শাদা শার্ট পরনে, ইয়াং...।"

"বর্ণনাটা হুবহু আপনার চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে না! চারদিন আগে আপনি সারাদিন কী করেছেন সেটাই তা হলে আগে খোঁজ নিতে হবে!"

"ঠাট্টা নয় রঞ্জিত। পুরো ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার কথা বলতে পারলে, আমার পেশেন্টের স্টেটমেন্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেত।"

"স্বচ্ছন্দে। ভদ্রলোকের নাম অবনী সান্যাল। আপনি যদি চান আমি না হয়..."

"আজ তো হবে না ভাই। যদি পারি, কাল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

দরজায় বেশ কিছুক্ষণ নক করার পর সাড়া পাওয়া গেল। দরজাটা খুলে মুখ

বাড়ালেন ভদ্রলোক। "আপনাকে তো ঠিক..."

"আমাকে আপনি চিনবেন না। একটা বিশেষ ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসেছি। একটু বসা যাবে...?"

"কী ব্যাপার?"

"এখানে যে লাশটা পাওয়া গেছে....."

"আপনি পুলিশের লোক?"

"না। এই যে আমার কার্ড।"

"ও। কিন্তু ও ব্যাপারে তো পুলিশকে আমি যা বলবার বলেছি।"

"তবু তো।"

"ভেতরে আসুন।"

সামনে বসবার জায়গাটাতে একটা কম পাওয়ারের আলো জ্বলছে। আগন্তুক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন।

"আপনি একাই থাকেন?"

"কাজের কথা বলুন।"

"আপনি পুলিশের কাছে মিথ্যে কথা বলেছেন।"

"না। আমি মিথ্যে বলি না।"

"তা হলে আপনি পুরো কথা বলেননি।"

"সেটা ঠিক। যেটুকু দরকার বলেছি।"

"আপনি সেদিন কী দেখেছিলেন?"

"তার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক যাই হোক। আপনি সত্যি বলুন।"

"পুরো ঘটনাটাই আমি দেখেছি। পুলিশকে বলিনি।"

"কিন্তু চারদিন পরে খবর দিলেন কেন? ঘটনাটার সময় কোথায় ছিলেন আপনি?"

"অন্য কেউ খবর দিলে ব্যাপারটাতে নিজেকে জড়াতাম না। কিন্তু চোখের সামনে দেখলাম একজন আর-একজনকে মারল, ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে লাশটা গায়েব করে দিল, চুপ করে বসে থাকব?"

"আপনি কোথায় ছিলেন?"

"এই ফ্ল্যাটের বাথরুমের জানলা থেকে জায়গাটা পরিষ্কার দেখা যায়।"

"লোক দু'জনকে আপনি স্পষ্ট দেখেছিলেন?"

"হ্যাঁ। দেখলে চিনতে পারব কালপ্রিটটাকে। পুলিশকে অবশ্য একথা বলিনি।"

"প্রয়োজন হলে বলতে রাজি আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ। তা হলে আমি পরে যোগাযোগ করব। ধন্যবাদ অবনীবাবু। ও হ্যাঁ, আপনার এখানে কি ফোন আছে?"

"না।"

উঠে পড়লেন আগন্তুক। বাইরে বেরিয়ে এলেন। "সিঁড়িতে আলো থাকে না?"

"আছে। জ্বলে না সব সময়।"

খটখট শব্দ করে নেমে গেলেন মানুষটি। অবনীবাবু দরজা বন্ধ করে দিলেন।

"হ্যালো, ও সি সায়েব আছেন নাকি?"

"বলছি।"

"আমি মৃগাঙ্কদা কথা বলছি।.... আজ চেম্বার আওয়ার্সের পর একটু ফাঁকা থাকব। তোমার সেই অবনী সান্যালের কাছে একটু যাওয়া যাবে?"

"লাভ নেই। ভদ্রলোক কাল রাত্তিরে মারা গেছেন।"

"মানে?"

"সিম্পল অ্যাকসিডেন্ট। বয়স হয়েছিল। সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে যান। সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু।"

"ব্যাপারটা কেমন হল, রঞ্জিত?"

"না না, এর মধ্যে কোনও রহস্য নেই। চারতলার এক ভদ্রলোক অবনীবাবুকে সিঁড়ির কোণে ঘাড় মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখেন। ডাক্তার মিত্র এসে দেখেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম। কিন্তু রহস্যজনক কিছুই দেখতে পাইনি। শুধু একটা ইনফরমেশন ছাড়া।"

"কী ইনফরমেশন?"

"এক ভদ্রলোক রাত্তির আটটা নাগাদ অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। চলেও যান। গেটের দরোয়ান বলেছে। চেহারার বর্ণনাটা আপনি যেমন বলেছিলেন তার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।"

"স্ট্রেঞ্জ !"

"আমি নজর রাখবার চেষ্টা করছি। আপনার পেশেন্টের কী খবর ?"

"ভাল আছে নিশ্চয়। ডেডবডিটা কার, কোনও হদিস পেলে ?"

"না। তবে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পেয়েছি। ঘাড়ের কাছে আঘাত করা হয়েছিল। যে করেছে অ্যানাটমি সম্বন্ধে তার জ্ঞান নিখুঁত। পাঁচদিন আগে বিকেলবেলা ধরুন দুটো থেকে চারটের মধ্যে মার্ডার হয়। আর লোকটি মৃত্যুর কিছু আগে কোনও-কোনও ওষুধ খেয়েইছিল।"

"ইন্টারেস্টিং। ভাবছি তোমার কাছে একবার যাব। ছেলেটিকেও দেখে আসব। মানে আমার যে পেশেন্টের জন্য তোমাকে...."

"জানি। অর্ক রায়। সুবর্ণ আবাসনের এ-ব্লকের দোতলায় থাকে। বাবার নাম অসীম রায়। একটা প্রাইভেট কনসার্নের মার্কেটিং ম্যানেজার।"

"কে বলে পুলিশ কোনও কাজের নয় ? ঠিক আছে, কাল যদি... ।"

"হ্যাঁ। আসুন না।"

"অর্ক আছে ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু..."

"আমার নাম ডাঃ মৃগাঙ্ক সেন।"

"ওঃ। আপনি। আমি তো...'

"কেমন আছে, অর্ক ?"

"ভালই। ভেতরে আসুন। আমি তো ভাবতেই পারছি না।"

ভিতরে নিয়ে এসে বসালেন অর্কর মা। অর্ক এল। ডাঃ সেন আদর করে কাছে টেনে নিলেন।

"কী অর্কবাবু, কী খবর ? লোকটাকে দেখেছ আর ?"

"হ্যাঁ। কালও দেখেছি।"

"ভয় করেনি তো ?"

"না। এখন আর ভয় করছে না।"

"চলো, তোমার বলটা খুঁজে আনি। যাও, জামা পালটে এসো।"

অর্ক ভেতরে চলে গেল। সবিতা চা নিয়ে এল।

"আমি একবার অর্ককে নিয়ে ফ্ল্যাটবাড়ির পেছন দিকটায় যাব। আপনার আপত্তি নেই তো ? আসলে ওর ভয়ের উৎসটাকে একেবারে নির্মূল করে দিতে হলে....."

"সে আর কী আছে ! আপনি যা ভাল বুঝবেন। ভাগ্যিস ডাঃ মিত্র আপনার কাছে ছেলেকে নিয়ে যেতে বলেছিলেন, নইলে তো..."

আজও শেষ দুপুর। কিন্তু আকাশে মেঘ নেই। বর্ষার উজ্জ্বল রোদ্দুরে সবকিছু ঝকঝক করছে। অর্ক ডাক্তারকাকুকে দেখাল কোন জায়গায় ওর বলটা পড়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে ঘুরে কারখানা চত্বরে অর্ককে নিয়ে এলেন ডাঃ সেন।

"একটা লোক আর একজনকে মারে কেন, ডাক্তারকাকু ?" হঠাৎ প্রশ্ন করল অর্ক। মৃগাঙ্ক সেন তাকালেন অর্কর দিকে। তারপর হা-হা করে হেসে উঠলেন।

"মারে। মেরে ফেলে। আর একজনের বেঁচে থাকাটা সহ্য হয় না, তাই।"

"অর্কবাবু, এইখানটাতেই তো তুমি দেখেছিলে..."

মৃগাঙ্ক সেন দাঁড়িয়ে আছেন লোহার চাকতিটার ঠিক সামনে। অর্ক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ডাক্তারকাকু, ওই যে, ওই যে সেই লোকটা..."

"কোথায় ? কোথায় সে—?"

কারখানার পোড়ো শেডটার দিকে হাত তুলে দেখাল অর্ক। মৃগাঙ্ক সেন হাঁফাচ্ছেন, চোখ-মুখ পালটে যাচ্ছে। একটানে ফুলহাতা জামার হাতের বোতাম দুটো খুলে ফেললেন মৃগাঙ্ক সেন। দু' হাতে দুটো হাতা গুটিয়ে নিলেন।

"কেউ কোথাও নেই অর্ক। শুধু আমি আছি। সেদিন...."

"তুমি। তুমি। তুমিই লোকটাকে মেরে ফেলেছিলে ডাক্তারকাকু উ-উ..."

চেঁচিয়ে উঠল অর্ক। মৃগাঙ্ক সেন সোজা তাকিয়ে আছেন অর্কর চোখের দিকে, মুখের পেশি শক্ত। চোয়াল ঝুলে এসেছে।

"তক্তার ফাঁক দিয়ে আমি তোমার হাত দেখেছি— ওই যে কালো দাগটা...."

"সে হাতগুলো কী করছিল, অর্ক, কী করছিল ? সে হাত দুটো আজও যদি..."

অর্ক আর চেঁচাতে পারছে না। নড়তে পারছে না। চোখ সরাতে পারছে না মৃগাঙ্ক সেনের চোখ থেকে। মৃগাঙ্ক সেন দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন।

হঠাৎ কে যেন লাফ দিয়ে পড়ল দু'জনের মাঝখানে আর নিমেষে অর্ককে তুলে নিয়ে ছুটে গেল দূরে। ঠিক সে সময়েই পিঠের ওপর একটা শীতল স্পর্শ অনুভব করলেন ডাঃ সেন। "সমর বসুর হত্যাকারী হিসেবে আপনাকে গ্রেফতার করছি ডাঃ সেন।"

"না," চিৎকার করে উঠলেন মৃগাঙ্ক সেন, "না, কোনও প্রমাণ নেই। আমি সমরকে মারিনি।"

"শুধু সমরকে নয়, অবনী সান্যালকেও আপনিই খুন করেছেন ঠাণ্ডা মাথায়। এইমাত্র আপনি যা করতে যাচ্ছিলেন, তার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী আছে ? অর্ক আপনাকে ঠিক-ঠিক আইডেন্টিফাই করেছে।" ইস্পাতের মতো শক্ত-গলায় বললেন ইনস্পেক্টর রঞ্জিত সাহা।

একটু দূরে দিগন্তকে আঁকড়ে ধরে আছে অর্ক।

চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন রঞ্জিত সাহা, "পুরো ব্যাপারটায় যা কিছু কৃতিত্ব সেটা পাওনা দিগন্তর। ওর জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।"

অসীমবাবুদের ফ্ল্যাটে বসেছিলেন ওঁরা। অসীমবাবু চায়ের নেমন্তন্ন করেছিলেন।

"রঞ্জিতদা না থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না।"

"কিন্তু মৃগাঙ্ক সেনের মতো একজন প্রথম সারির সাইকিয়াট্রিস্ট, তাঁকে সন্দেহ হল কী করে তোমার ?" অসীমবাবু জানতে চাইলেন।

"অনুমান, প্রথম থেকেই," বলল দিগন্ত, "কিন্তু কোনও প্রমাণ ছিল না।"

ঝাঁকড়া চুল, মেদহীন দিঘল চেহারা, বছর বাইশের শ্যামলা ছেলেটির দিকে তাকাল সকলে। এতক্ষণে একটু সপ্রতিভ হল দিগন্ত।

"আসলে পুরো ঘটনায় দুটি সমাপতন কাজ করেছে। প্রথম, ঘটনার দিন ঠিক ওই সময়েই এক বন্ধুর জন্যে আমি অপেক্ষা করছিলাম আপনাদের এই কম্পাউন্ডের গেটের বাইরে। ডাঃ সেন আর সমরবাবুকে গাড়ি থেকে নেমে একসঙ্গে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। দু'জনের কাউকেই আমি চিনতাম না। একজন কেমন যেন ঘোরের মধ্যে হাঁটছেন, সেটা আমার নজর এড়ায়নি। আর বয়েস হওয়া সত্ত্বেও ঋজু চেহারা, ডাঃ সেনের ওপরও চোখ পড়েছিল। ওঁর পরনে ছিল কালো প্যান্ট আর সাদা শার্ট, আমারই মতো। খটকা লাগে অর্কর আচরণে। একটু পরেই ডাঃ সেন ফিরে এলেন একা। পুরো ব্যাপারটাতে কোথাও একটা অসঙ্গতি ছিল যা আমাকে ভাবিয়েছিল।

"পরের দিনই ঘটনাটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল। স্পট থেকে পাওয়া ডাঃ সেনের লাইটার আর ওঁর গাড়ির নম্বর আমাকে সাহায্য করেছিল ডাঃ সেনের পরিচয় পেতে। পুরো দুটো দিন ধরে আমি ডাঃ সেনের সম্বন্ধে খোঁজ নিলাম, তাতেই ছবিটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

"অর্ক অবশ্য আমাকে খুনি বলেই ধরে নিয়েছিল," হাসল দিগন্ত। "ভয় পেলেও ও কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছেলে। তিনদিনের দিন, মানে গত শুক্রবার, ওর সঙ্গে আমার ভাব

হয়ে গেল। আমার হাতে কোনও কালো দাগ নেই, তাতেই ও বুঝেছিল, আমি অন্যলোক, ওর বন্ধু। ও ঠিক-ঠিক আমার কথামতো কাজও করেছিল। আপনিও বুঝতে পারেননি যে ও আর ভয় পাচ্ছে না।" অর্কর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল দিগন্ত।

"ঘটনাটা দেখার সময় অর্ক ডাঃ সেনের মুখ দেখতে পায়নি, সবচেয়ে স্পষ্ট দেখেছিল দুটো হাত, যার মধ্যে এক হাতে কালো জড়ুলের দাগ। আর অচৈতন্য বা মৃত সমরবাবুর দেহটাকে ঢাকনি সরিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া।

"দ্বিতীয় সমাপতন," একটু থেমে বলল দিগন্ত, "আপনাদের হাউস-ফিজিসিয়ান ডাঃ মিত্র যে অর্ককে ডাঃ সেনের কাছেই রেকমেন্ড করবেন—এটা হিসেবের বাইরে ছিল। কিন্তু এটাই পুরো ঘটনাটা সহজ করে দিল। অর্ককে সম্মোহন করে ডাঃ সেন দেখলেন। হত্যাকাণ্ডের একটি প্রত্যক্ষদর্শী রয়েছে, যা ওঁর, চিন্তাতেই আসেনি। অবনীবাবুর কথা অবশ্য রঞ্জিতদাই জানান ডাঃ সেনকে। তার আগেই আমি রঞ্জিতদার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।"

"হ্যাঁ। আমি কিন্তু ওর কথায় গুরুত্ব দেওয়ার বদলে সন্দেহই করেছিলাম। তারপর যখন দেখলাম ওর দেওয়া তথ্যের প্রতিটিই সঠিক! তখনই ওর ওপর আস্থা বাড়ল।" বললেন রঞ্জিত সাহা।

"ঘটনার দিন আমাকে দেখেছিলেন ডাঃ সেন। অর্কর বর্ণনা আর এই দেখাটা উনি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। অর্ককে কিন্তু গুরুত্ব দেননি ডাঃ সেন। ওঁর নিজের ওপর আস্থা ছিল, অর্কর শিশুমন থেকে ছবিটা উনি মুছে ফেলতে পারবেন। কিন্তু আর-এক সাক্ষী— অবনীবাবুকে সরিয়ে দিতে হল।"

"কী করে?" জিজ্ঞেস করলেন অসীমবাবু।

"খুব সহজে। যদিও বিরাট ঝুঁকিই নিয়েছিলেন ডাঃ সেন। উনি ধরে নিয়েছিলেন, অবনীবাবু ওঁকে চিনতে পারবেন আর পুলিশকে জানাবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ওঁর ফ্ল্যাটেই ফোন আছে কিনা জেনে নেওয়াটা জরুরি ছিল। নিজের পরিচয়েই উনি এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে।

"সম্ভবত সিঁড়ির আলোটা নেভা দেখেই পরিকল্পনাটা ওঁর মাথায় আসে। নীচে নেমে গেলেও উনি চলে যাননি। কয়েক মিনিট পরে অবনীবাবু যখন দ্রুত নেমে আসছেন, তখন অল্প একটু ধাক্কাই যথেষ্ট ছিল। চিকিৎসক হিসেবে উনি জানতেন মেরুদণ্ডের

ঠিক কোন জায়গায় আঘাত করলে সেটা সাঙ্ঘাতিক হবে। এটুকু করে স্বচ্ছন্দে উনি চলে এসেছিলেন বাইরে।"

"হ্যাঁ," রঞ্জিত সাহা বললেন, "ওই সময়ই আমি ওঁকে অ্যারেস্ট করতে পারতাম। কিন্তু তাতে প্রথম ঘটনাটার কিনারা হত না।"

"পরের ব্যাপার আপনাদের জানা।" বলল দিগন্ত।

"এ পরিকল্পনাও অবশ্য দিগন্তর।"

"হ্যাঁ, ডাঃ সেন যে অর্ককে একা পেতে চেষ্টা করবেন, এ-ব্যাপারে আমি প্রায় স্থির নিশ্চিত ছিলাম।"

"বাবাঃ, অর্ককে ওঁর হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি প্রায় দমবন্ধ করে বসেছিলাম। শুধু রঞ্জিতবাবু ছিলেন বলে," বললেন অর্কর মা।

"অর্ক নিখুঁত ভূমিকাই পালন করেছিল।" অর্কর পিঠ চাপড়ে দিলেন রঞ্জিত সাহা। "নইলে ভাবুন, কোথায় এই বেলেঘাটার পোড়ো কারখানা আর কোথায় রাসবিহারী অ্যাভিনিউতে ডাঃ সেনের বাড়ি। ওঁর নিখুঁত অ্যালিবাইও ছিল। প্রতি মঙ্গলবারই উনি রামানন্দ মেন্টাল হসপিটালে দুপুর বারোটা থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি থাকতেন। ঘটনার দিনও ছিলেন, অন্তত সাক্ষী-সাবুদ, অফিস রেকর্ড সবেতেই সে প্রমাণ ছিল। অর্ক না থাকলে..."

"কিন্তু সমরবাবু?" অসীমবাবু জানতে চাইলেন।

"সেটাই সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং। সমরবাবু ডাঃ সেনের ছেলেবেলার বন্ধু। উনিই একমাত্র জানতেন ডাঃ সেনের এমন দুর্বলতার কথা, যা তাঁর প্রতিষ্ঠা আর পেশার ক্ষতি করতে পারত। ডাঃ সেন নিজেই মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। সেজন্য তিনি দিল্লি গিয়ে চিকিৎসাও করান। পাগলের ডাক্তার নিজেই পাগল, এটা ওঁর খ্যাতির বিরুদ্ধে যেতে পারত।"

"এটাকে কাজে লাগাতেন সমরবাবু।" বললেন রঞ্জিত সাহা, "বলতে পারেন ব্ল্যাক মেইল। ডাঃ সেন তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, তার চেয়েও মারাত্মক ছিল আর-একটা ব্যাপার। সমরবাবু ডাঃ সেনের চিকিৎসা-পদ্ধতি নিয়েও বিদ্রূপ করতেন। চ্যালেঞ্জও জানাতেন সমরবাবুকে কোনওদিনই সম্মোহন করতে পারবেন না। অথচ এটাই ছিল ডাঃ সেনের সাফল্যের চাবিকাঠি, পেশার ভাইটাল জায়গা।"

"সমরবাবুর শেষ দাবিটা ছিল একটা মোটা অঙ্কের টাকা। আর ধৈর্য রাখতে পারেননি ডাঃ সেন। যদি সমরবাবু সম্মোহিত না হন, তবেই টাকা পাবেন— এই ছিল ডাঃ সেনের শর্ত। এই জায়গাটা দু'জনেরই পরিচিত। দশ বছর আগে পূর্ণ দত্ত রোডেই থাকতেন ডাঃ সেন। চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে এসেছিলেন সমরবাবু, আর তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন ডাঃ সেন।"

রঞ্জিত সাহা বললেন, "কিন্তু উনি যাকে বলে বর্ন- ক্রিমিন্যাল, তা ছিলেন না। পুরো ব্যাপারটাতে যে খুব দক্ষ পরিকল্পনা ছিল, তা বলা যায় না।"

"তবু, অপরাধ, অপরাধই, তার জালেই জড়িয়েছিলেন ডাঃ সেন।"

দিগন্ত উঠে পড়ল। অর্ক এসে হাত ধরল তার।

"তুমি আর আসবে না?"

"আসব। এদিকে এলেই তোমার কাছে আসব।"

হাসিমুখে সকলের দিকে তাকাল দিগন্ত। তারপর লিভিং রুমের বাইরে পা রাখবার আগে কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বল বার করে এগিয়ে দিল অর্কর দিকে।

"তোমার বলটা। আচ্ছা, চলি।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

নীল আলোর রহস্য

জাহাজের মাস্তুল কিংবা গির্জার চুড়োয় মাঝে-মাঝেই দেখা গেছে রহস্যময় এক নীল আলো। শুধু অন্ধ বিশ্বাসই নয়, এর পেছনেও আছে উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক কারণ।

বুরুশের মতো দেখতে বৈদ্যুতিক ছটা— সেন্ট এলমোস ফায়ার— বায়ুমণ্ডলের বিশেষ-বিশেষ পরিস্থিতিতে জাহাজের মাস্তুলের মাথায় কিংবা আড়কাঠে অথবা গির্জার চুড়োর মতো কোনও উঁচু জায়গায় দেখা যায় এটি। নীলচে আলোর ছটা। ৫০টি পৃথক-পৃথক নামে এই ছটার পরিচিতি। গ্রিক-রোমান পুরাণ অনুসারে এই আলোর হোতা ক্যাস্টর ও পোলাক্স। জিউসের যমজ পুত্র ক্যাস্টর ও পোলাক্স গিয়েছিলেন সোনালি পশমের খোঁজে। আরগোনটস্-এর প্রথম অভিযান। সমুদ্রে উঠল ঝড়। সেই ঝড়ের মোকাবিলা করতে সমুদ্রের দেবতা পসিডন দুই ভাইয়ের মাথায় জ্বালিয়ে দিলেন আলো। সেন্ট এলমো নামটা এসেছে সেন্ট এরাসমাস থেকে। সেন্ট এরাসমাস আনুমানিক ৩০৩ খ্রিস্টাব্দের শহিদ-সন্ত। ভূমধ্যসাগরের নাবিকদের কাছে তিনি ছিলেন দেবতার মতো। অনেক সময়ে সেন্ট পিটার গঞ্জালেসকে সেন্ট এলমোস ফায়ারের স্রষ্টা বলা হয়। মুরদের বিরুদ্ধে অভিযানে স্পেনের রাজা তৃতীয় ফার্দিনান্দের সঙ্গী হয়েছিলেন গঞ্জালেস। স্পেনের উপকূলে বসবাসকারী যেসব মানুষ সমুদ্র-অভিযানে যেতেন, তাঁদের জীবনযাত্রার উন্নতির কাজে গঞ্জালেস তাঁর বাকি জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। প্রবাদ আছে, পোপ পঞ্চম আরবান-এর (১৩৬২-৭০) সাহায্যার্থে যে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল তাতে নাকি সেন্ট এলমোস ফায়ারকে কাজে লাগানোর কথা বলা হয়েছিল। অবশ্য সেখানে সেন্ট এলমোস ফায়ার না বলে বলা হয়েছিল 'দ্য লাইট অব সেন্ট এলমি'। এর আরও অনেক নাম আছে— সেন্ট এরিম, সেন্ট টেলমে, সেন্ট হেলম, সেন্ট এরমো, সেন্ট অ্যানসেলমো প্রভৃতি।

আসলে সেন্ট এলমোস ফায়ার একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনা। মেঘের বাইরে ওপরের দিকে প্রায়ই শক্তিশালী বৈদ্যুতিক-কণার একটা স্তর থাকে। পরিষ্কার বাতাসে মেঘের ওপরের দিকের অংশ ঘিরে প্রায় এক অ্যাম্পিয়ারের বিদ্যুৎ প্রবাহ ঋণাত্মক কণাগুলোকে মেঘের তলে টেনে আনে।' পৃথিবী বিদ্যুৎ পরিবহণ করে, সেজন্য মেঘের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ঋণাত্মক কণাগুলোকে মাটির দিকে এবং ধনাত্মক কণাগুলোকে কিছুটা দূরে টেনে নিয়ে যায়। মেঘের নীচে গাছগাছালির মাথায়, গির্জার চুড়োয় বা অন্যান্য উঁচু জায়গায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র এত শক্তিশালী থাকে যে একটা আয়োনাইজেশন প্রক্রিয়া কাজ করে। একে বলা হয় পয়েন্ট ডিসচার্জ। এর ফলে উঁচু জায়গাগুলি থেকে বেশ কিছু মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এই বিদ্যুৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনাত্মক। এই বিদ্যুৎ ডিসচার্জ সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র খুব শক্তিশালী হলে নীলচে আলো দেখা যায়। এরই নাম সেন্ট এলমোস ফায়ার।

মধ্যযুগে এই সেন্ট এলমোস ফায়ার দখলও ছিল আনন্দের। আবার কখনও-বা আতঙ্কের। ১৫ ও ১৬শ শতকে ইতালীয় নাবিকরা এই আলোক ছটাকে যিশুখ্রিস্টের শরীর থেকে নির্গত আলো বলে মনে করতেন। তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন কর্পোসান্ত। এর থেকে এসেছে নানারকম অপভ্রংশ— কর্পোসান্ত, কর্মজান্ত, কোমাজান্ত, কাপরা সলতান্তে, করবিস আন্ট ইত্যাদি। জানা যায়, কলম্বাস, ভাস্কো-ডা-গামা, ড্যাম্পিয়ার ও ম্যাগেলনের মতো খ্যাতিমান সমুদ্র-অভিযাত্রীরা তাঁদের অভিযানে সেন্ট এলমোস ফায়ার দেখতে পেয়েছিলেন। বজ্রমেঘের মধ্য দিয়ে এরোপ্লেন গেলেও কখনও-সখনও এই বিদ্যুৎ ছটার সৃষ্টি হয়।

অনেক নাবিকই সেন্ট এলমোস ফায়ারকে শুভচিহ্ন বলে মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস, ওই নীলচে আভাটি নাকি ঝোড়ো আবহাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। কিন্তু এক সময়ে এটা মনে করা হত, সেন্ট এলমোস ফায়ারের আলো যদি কারও মুখে পড়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

জাহাজের মাস্তুলের মাথায় সেন্ট এলমোস ফায়ার দেখা গেলে খুব কম নাবিকেরই সাহস হত তা দেখার। এরকমই একটা বিশ্বাস কাজ করে 'ফ্লাইং ডাচম্যান'-এর বেলাতেও। ফ্লাইং ডাচম্যান একটি ভুতুড়ে জাহাজ। উত্তমাশা অন্তরীপ অঞ্চলে দেখা যায়। দেখতে বোঝা যাবে বিপদ আসন্ন।

প্রশ্ন

(১) জাপানি ভাষায় 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'কে কী বলা হত ? **দীপাঞ্জন মৈত্র** জলপাইগুড়ি ।
(২) ১৮৯৩ সালে দুই বোন প্যাটি হিল ও মিলড্রেড হিল কোন গান সৃষ্টি করেছিলেন, যা আজও সমান জনপ্রিয় ? **চন্দ্রানী চক্রবর্তী,** খড়্গপুর, মেদিনীপুর ।
(৩) কোন বিজ্ঞানীকে 'আবিষ্কারের কারখানা' বলা হয় ? **সম্রাট দাস,** খটির বাজার, হাওড়া ।
(৪) জাল নোট ধরার যন্ত্রের নাম কী ? **অর্পণ দত্ত,** ভাদুল, বাঁকুড়া ।
(৫) ডেনিস কম্পটন, উইলি ওয়াটসন, সি বি ফ্রাই—এঁদের মধ্যে মিল কোথায় ? **অমিতাভ মজুমদার,** বড়বেহেড়া, হুগলি ।
(৬) শান্তসাগর কোথায় ? **রাজশ্রী দাস,** রামচন্দ্রপুর, হাওড়া ।
(৭) সলমন রুশদি তাঁর গোপন আস্তানায় থেকে নতুন একটি উপন্যাস লিখছেন । '৯৪ সালে এটি প্রকাশিত হবে । উপন্যাসটির নাম কী ? **দেবকুমার রায়,** উনসানি, হাওড়া ।
(৮) জিম করবেটের আসল নাম কী ? **সুপ্রিয় কর্মকার,** দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা ।
(৯) বছরের কোন দিনটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জ দিবস হিসেবে পালন করা হয় ? **অরিন্দম সুহাসরিয়া,** দুবরাজপুর, বীরভূম ।
(১০) 'কাকাবাবু' চরিত্রটি কার সৃষ্টি ? **সুমন মুখোপাধ্যায়,** সাঁকরাইল, হাওড়া ।
(১১) নজরুল ইসলাম কোন ছবিতে সঙ্গীত পরিচালনা ও অভিনয় করেছিলেন ? **রথীন্দ্রনাথ দে,** কোন্নগর, হুগলি ।
(১২) ভিক্টর হুগো কত সালে মারা যান ? **অমরনাথ মল্লিক,** চন্দননগর, হুগলি ।
(১৩) 'ডঃ জিভাগো' ছবিটির পরিচালক কে ? **ঊর্মিশ্রী ভৌমিক,** শিলচর, অসম ।
(১৪) কোন নদীর তীরে ওয়াশিংটন শহর অবস্থিত ? **শুভব্রত ভট্টাচার্য,** আমতা, হাওড়া ।
(১৫) 'আর্য' কথাটির আক্ষরিক অর্থ কী ? **শুদ্ধসত্ত্ব মণ্ডল,** বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ।
(১৬) বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর প্রথম ন্যাশনাল পার্কটি কোথায়, কত সালে গড়া হয় ? **চন্দনা মিত্র,** কলকাতা-৩৪ ।

নিল ও'ব্রায়েন

(১৭) লর্ড মাউন্টব্যাটেনের পুরো নাম কী ? **শুভস্মিত গোস্বামী,** জলপাইগুড়ি ।
(১৮) কোন মহিলা বৈমানিক সর্বপ্রথম একা অতলান্তিক মহাসাগর বিমানে পেরিয়েছিলেন ? **সঞ্জয়কুমার দে,** কলকাতা-৩২ ।
(১৯) প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক লুইস ক্যারলের আসল নাম কী ছিল ? **দেবাশিস সরকার,** আন্দুল, হাওড়া ।
(২০) ভারতের দ্বিতীয় রিসার্চ রিঅ্যাক্টরের নাম কী ? **রঞ্জন চক্রবর্তী,** দন্তনপুর, বর্ধমান ।

(উত্তর আগামী সংখ্যায়)

গত সংখ্যার উত্তর

(১) জিব্দি (১৯৪৮ সালে) ।
(২) প্যারিসে ।
(৩) স্যাটেলাইট টেলিভিশন অব এশিয়া রিজিওন ।
(৪) উইগিন্স ।
(৫) জিপসাম নামক খনিজ পদার্থ থেকে ।
(৬) ৮টি ।
(৭) এঁরা প্রত্যেকেই নিরামিষাশী ছিলেন ।
(৮) হরজিৎ সিংহ সেহগাল ।
(৯) ৩০ শতাংশ হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H_2O_2) দ্রবণ ।
(১০) চেস্টার ফ্লয়েড কার্লসন । ১৯৩৮ সালে ।
(১১) দু'জনেরই জন্ম একদিনে । ১৮০৯ সালের ১২ জানুয়ারি ।
(১২) অ্যানোরাইড ব্যারোমিটার ।
(১৩) বিনোদ গণপতি কাম্বলি ।
(১৪) ব্ল্যাকস্টোন ।
(১৫) ডাকটিকিট সংগ্রহের নেশা ।
(১৬) মেরি ক্যাথলিন কলিন্স ।
(১৭) কেরল ।
(১৮) ইংল্যাণ্ডের ব্রিস্টল শহরে ।
(১৯) লাতিন শব্দ— অর্থ 'আমি নিষেধ করছি' ।
(২০) কিউবা ।
(২১) এক্সক্যালিবার ।

চার্লস ডারউইন

কিশোরকুমার

বিনোদ কাম্বলি

বো ডেরেক

গোলোকদা গল্প

পার্থপ্রতিম সেনগুপ্ত

গোলোকদা

রবিবারের সকালবেলা যথারীতি গোলোকদা'র বাড়ির হলঘরে পাড়ার ছোটদের কম্পিউটার ক্লাবের জমজমাট আড্ডায় তীর্থ, রনি, শাঁওন, বুবাই—আমরা সকলেই জড়ো হয়েছি। গোলোকদা একমনে এক বাক্স ফ্লপি ডিস্কের ওপর ফেল্ট পেন দিয়ে নামধাম, বিষয় লিখছেন। ওঁর পি. সি. অর্থাৎ পার্সোনাল কম্পিউটারের ডিস্কে প্রয়োজনীয় বিষয়ের ওপর রকমারি তথ্যের এক বিশাল লাইব্রেরি তৈরি করা এখন গোলোকদার লেটেস্ট হবি। ওঁরই উদ্ভাবন করা এক সহজ 'ক্ল্যাসিফিকেশন সিস্টেম' ব্যবহার করার ফলে সেই লাইব্রেরি থেকে তথ্য খুঁজে বের করাও দেখেছি দারুণ সহজ। অন্তত মোটা-মোটা বই বা এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতা ঘেঁটে খোঁজার চেয়ে অনেকগুণে তো বটেই।

"মে উই কাম ইন ?"

গম্ভীর শানানো গলার ডাক শুনে আমরা তাকাই। হলঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জোড়া-মূর্তি। গোলোকদার কাছে হরদম নানা লোকের আনাগোনা, ফ্রিল্যান্স কনসালটেন্সি শুরু করার পর ব্যাপারটা আরও বেড়েছে। তবে রবিবারের সকালগুলোতে গোলোকদা কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখেন না আমরা জানি। তাই গোলোকদার দেড় ইঞ্চি ওঠানো ভুরুতে ঈষৎ বিরক্তির ইঙ্গিত।

"ইয়েস," বলে গোলোকদা হাত বাড়িয়ে আগন্তুক দু'জনকে ভেতরে আসতে বলার সঙ্গে-সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন একটা 'থানা-পুলিশ, থানা-পুলিশ গন্ধ' এসে ঢুকল। দু'জনের মধ্যে প্রথমজনের ফরসা রং, ঈষৎ টাক, মাঝারি হাইট, পরনে বাদামি সাফারি সুট, সোনালি ফ্রেমের চশমা, হাঁটা-চলা দেখে বোঝা যায় কর্তৃত্ব করতে অভ্যস্ত। দ্বিতীয়জন লম্বা-চওড়া, ময়লা রং, চোখে কড়া দৃষ্টি, হাতে একতাড়া কাগজপত্র।

"বলুন," গোলোকদার চোখ থেকে বিরক্তির আভাসটা তখনও মোছেনি।

"বিরক্ত করার জন্য স্যাপ চেয়ে নিচ্ছি। আমরা আসছি দিল্লির রেভিনিউ ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট থেকে।"

ভদ্রলোক বসবার পর একপাশে কাত হয়ে প্যান্টের পকেট থেকে আইডেনটিটি কার্ড বের করে ইংরেজিতে বললেন, "আমি এস. কে. জামকর। উনি আমার সহকর্মী মিঃ পি. এন. প্রধান। আপনাদের পাড়ায় আমরা সকাল থেকে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে একটা 'সার্চ অ্যান্ড সিজার' অপারেশন চালাচ্ছি।"

"আয়কর হানা ?" গোলোকদা জিজ্ঞেস করলেন, "মানে রেইড ?"

"হ্যাঁ। ভদ্রলোককে চেনেন নিশ্চয়ই, মিঃ নিরুপম ঢনঢনিয়া ?"

"থার্টি বাই টু, আশাবরী অ্যাপার্টমেন্ট, তিনতলায়, নাক-কান মলা ডাক্তার হাজরা'র ফ্ল্যাটের উলটোদিকের ফ্ল্যাট," বলে ওঠে রনি। বলেই জিভ কাটে নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হাজরার পাড়ায় চালু বিশেষণটা বলে ফেলে।

"ইয়েস। বাট ডক্টর হাজরা ইজ মোস্ট আনকোঅপারেটিভ," রনির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন মিঃ জামকর, "এই সমস্ত ব্যাপারে পাবলিক কোঅপারেশনকে আমরা খুব মূল্য দিই। সেই প্রসঙ্গেই আপনার কাছে আসা। কম্পিউটার সোসাইটির মিঃ শ্রীনিবাসন আপনার কথা রেকমেন্ড করেছেন আমাদের ডিপার্টমেন্টকে। আপনাকে লেখা একটা চিঠিও আছে।"

গোলোকদা চিঠিটায় একঝলক চোখ বুলিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। বলুন মিঃ জামকর, কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি। আপনাদের কফি চলবে ?"

"না। ধন্যবাদ, আমরা ডিউটিতে আছি ব্যাপারটা সংক্ষেপে বলি। আমাদের কাছে গোপন খবর ছিল, মিঃ ঢনঢনিয়া ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট, কাস্টমস ডিউটি অ্যাক্ট, ফরেন এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ইত্যাদির আইনকানুন ভেঙে 'হাওয়ালা' অর্থাৎ বেআইনি লেনদেনের ব্যবসা চালান। আজ ভোর থেকে আমাদের টিম ওঁর বাড়ি আর অফিসে তল্লাসি চালিয়েও কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি, কারণ ওর

হিসেবপত্র সব কিছুই দেখছি কম্পিউটারাইজ্‌ড। আমাদের সঙ্গে একজন কম্পিউটার-এক্সপার্টও এসেছেন, এই মিঃ প্রধান। ইনিই বলবেন সমস্যাটা কী বা আপনার থেকে কী সাহায্য আমরা চাইছি।"

লম্বা-চওড়া ভদ্রলোকটি এবার গোলোকদার দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে ছোট্ট 'নড' করে বললেন, "মিঃ রাহা, আপনার কথা অনেক শুনেছি। কম্পিউটার ক্রাইম ও সিকিউরিটি সিস্টেমের ওপর আপনার বিখ্যাত প্রবন্ধগুলোও আমার চোখে পড়েছে। আমাদের পদ্ধতিমতো নানা চেষ্টা চালিয়েও এই ঢনঢনিয়ার কম্পিউটার কোডগুলো আমরা উদ্ধার করতে পারছি না। যার ফলে ওঁর কম্পিউটারে রাখা গোপন সূত্রগুলোর নাগালও পাওয়া যাচ্ছে না। আমাদের সব চেষ্টা বিফল হওয়ার পরই আপনার কাছে আসা।"

"দেখুন, মিঃ জামকর, অন্যের প্রাইভেসিতে নাক গলানোটা কতটা প্রতিবেশীসুলভ কাজ হবে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না।"

"মিঃ ঢনঢনিয়ার কার্যকলাপগুলো যে বেআইনি সে-ব্যাপারে কোনও প্রমাণ আমাকে দেখাতে পারেন?"

দুই ভদ্রলোক মুখ-চাওয়াচাওয়ি করেন। একটু চুপ করে থেকে সোনালি চশমা বললেন, "জোরালো সন্দেহ আছে। গোপনসূত্রে পাওয়া কিছু তথ্য আছে। কিন্তু সেগুলো তো গ্রেডেড ইনফরমেশন, মানে গোপনীয়, তা তো আপনাকে, মানে পাবলিকের কাউকেই দেখানোর আদেশ নেই।"

গোলোকদা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "আপনার অফিস ম্যানুয়াল কী বলছে, সে-ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই। কিন্তু শুধুমাত্র মৌখিক সন্দেহের ওপর ভিত্তি করে আমি কারও অধিকার ভাঙায় সাহায্য করতে পারব না। দুঃখিত। মিঃ শ্রীনিবাসনকে বলবেন, উনি বুঝবেন। উনি আমাকে চেনেন।"

সোনালি চশমার ফরসা মুখ টাক অবধি লাল হয়ে উঠল। হাত দুটোর আঙুল শক্ত করে সোফার হাতলে রেখে বললেন, "কিন্তু মিঃ রাহা, সরকারকে সাহায্য করাটাও কী আপনার কর্তব্য নয়?"

"সেটা কী কাজে সাহায্য করছি, তার ওপর নির্ভর করছে।" গোলোকদা উঠে দাঁড়ান। ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। গোলোকদার দিকে বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে সোনালি চশমা যেন হার মেনে, চোখ সরিয়ে লম্বা-চওড়ার দিকে চেয়ে একটু মাথা হেলালেন। উনি আবার আড়চোখে আমাদের দিকে দৃষ্টি ফেললেন। মুখে একটু বিব্রত হাসি।

গোলোকদা বসতে-বসতে বললেন "ওরা সবাই আমার কম্পিউটার ক্লাবের খুদে সদস্য। আমার সহকারী দলও বলতে পারেন। যা বলার স্বচ্ছন্দে বলুন।"

ততক্ষণে গর্বে আমাদের বুকটুক ফুলে উঠেছে। একজন অন্যকে ঠেলাঠেলি করে নিঃশব্দে মজাটা ভাগ করে নিচ্ছি। ইতিমধ্যে লম্বা ভদ্রলোকটি গোলোকদার পাশে উঠে গিয়ে দু-একটা ফোটো আর কাগজপত্র দেখাতে শুরু করেছেন আর কথা বলছেন ফিসফিস করে। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে আমরা বেশ মজা পাচ্ছিলাম। তা ছাড়া গোলোকদার কাছে সোনালি চশমা একটু 'টাইট' হওয়ায়, আমাদের খুশি চেপে রাখা যাচ্ছিল না।

"আমি এতে মাথা গলাতে চাইতাম না," গোলোকদা সোনালি চশমা-র দিকে চেয়ে বলেন, "তবে ব্যাপারটার মধ্যে প্রবলেম সলভিংয়ের চ্যালেঞ্জ আছে। সেটা আমাকে টানছে। শোনা যাক আপনাদের কথা।"

দুই মূর্তির মুখে তখন হাঁপ-ছাড়া হাসি। মিঃ প্রধান বললেন, "এই ঢনঢনিয়া ওঁর পি. সিগুলোতে যে পাসওয়ার্ড, মানে গোপন সঙ্কেত দিয়ে রেখেছেন সেটা না জানলে তো আমরা কিছুতেই পি. সি-র মেমোরিতে রাখা ফাইলগুলো আর সেই ফাইলে লুকনো হিসেবনিকেশ, সূত্র বা তথ্য কিছুই পড়তে পারছি না। সাধারণত এই সঙ্কেতগুলো লোকে নিজের বা আত্মীয়দের নাম, ডাকনাম, জন্মতারিখ, গাড়ির নম্বর, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নম্বর, ইনশিওরেন্স পলিসি নম্বর, ফ্ল্যাটের নম্বর ইত্যাদি একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ে তৈরি করে রাখে। কিন্তু এই ঢনঢনিয়া গভীর জলের মাছ। আমরা ওর নাড়িনক্ষত্র তোলপাড় করে দেখার চেষ্টা করেছি, এমনকী, ওর পোষা কুকুরের নামও। কিন্তু সবটাই পন্ডশ্রম।"

"মিঃ ঢনঢনিয়াকে আমি পাড়ায় দেখেছি। একটা মারুতি—ওয়ান থাউজেন্ড নিয়ে চলাফেরা করেন। অতিশয় ভদ্র। একবার ওঁর গাড়িতে লিফটও দিয়েছিলেন, মনে পড়ছে। খুব পানের মসলা খান। কম্পিউটার নিয়ে কিছু কথা বলছিলেন। ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসার কথাও। হরদম বিদেশ যান শুনেছি। ঠিক?"

"ঠিক। এ ছাড়াও ওঁর সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে। ওঁর ডোসিয়ারটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখতে পারেন। ঢনঢনিয়ার কম্পিউটারগুলো আমরা সিজ করে নিয়ে এসেছি, সেটাও দেখতে পারেন যখন খুশি।"

"না। পাসওয়ার্ড জানার জন্য তার দরকার পড়বে বলে মনে হয় না। তবে আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। আপনারা উঠেছেন কোথায়?"

"আমাদের পুরো টিমটাই উঠেছি হোটেলে। ফোন নম্বর রইল। আমরা অপেক্ষা করে থাকব। যা-যা দরকার জানাবেন। বুঝতেই পারছেন ব্যাপারটা বড় জরুরি আর গুরুত্বপূর্ণ। এর একটা হিল্লে হলে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে আপনাকে প্রচুর ধন্যবাদ এবং অবশ্যই কিছু ক্যাশ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে।"

"তার কোনও প্রয়োজন হবে না। কাজটা মিঃ শ্রীনিবাসনের প্রতি আমার শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবেই ধরে নেবেন।"

যুগল-মূর্তি বিদায় নিলে, গোলোকদা বললেন, "তাই তো হে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে।

নিরুপম ঢনঢনিয়া
হাইটেক্ ফন্দি নিয়া
রেখেছেন ডিস্কে পি.সি'র
লুকনো হিসেব কষি
যত দুই নম্বরিয়া।

গোলোকদার মুখে-মুখে তৈরি লিমেরিক বা ধাঁধা বা কূটকবিতা মানেই ওঁর মেজাজ শরিফ। দেখেছি মনের মতো সমস্যার সন্ধান পেলেই ওঁর মনের স্ফূর্তিটা জমে ওঠে, তখন ওঁর কথাবার্তা ভাবভঙ্গি সবই শোনার আর দেখার মতো হয়ে ওঠে। "তা, তোমাদের লোকাল রেকর্ড বুক, ভার্সন জিরো ওয়ান, এই মিঃ ঢনঢনিয়া সম্বন্ধে কী বলছে?" গোলোকদা আমাদের দিকে তাকিয়ে বলেন।

এর একটু ছোট্ট ইতিহাস আছে। 'লিমকা' বা 'গিনেস' বুক অব রেকর্ডস' নিয়ে আমাদের মাতামাতি দেখে গোলোকদা একদিন বলেছিলেন, "চোখের সামনে অনেককিছু দেখেও আমরা দেখি না। আমাদের পাড়াতেই কত বিস্ময়কর ব্যাপার রয়েছে তার খোঁজ না রাখাটা কোনও কাজের কথা নয়।"

সেই সূত্রেই আমরা জানতে পেরেছি, অনেক অবাক-করা খবর। যেমন আমাদের পাড়ার সবচেয়ে লম্বা লোক হচ্ছেন পাক্কা ছ'ফুট চার ইঞ্চি ইনশিওরেন্স এজেন্ট দেবাশিস রায়, কিন্তু তাঁর বাবা অবিনাশবাবু মাত্র পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি লম্বা। আমাদের পাড়াতেই এক খেয়ালি ভদ্রলোক আছেন, যিনি হাওয়াই গিটারকে স্প্যানিশ করে সরোদের কায়দায় দারুণ সেতার বাজান, দূর থেকে শুনলে ম্যান্ডোলিন মনে হয়। আর এক ভদ্রলোক আছেন যিনি দামি হোটেলের মোগলাই শেফ, মাইনে পান নাকি ত্রিশ হাজার টাকা। তিনি নাকি এক হোটেল থেকে চাকরি ছেড়ে অন্য হোটেলে যাওয়ার সময় ষোলোজন সহকর্মীর দলটাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। নতুন চাকরিতে যোগ দেওয়ার সেটাও নাকি শর্ত। এ ছাড়া আমাদের পাড়াতেই আছেন মহিম মিত্রমশাই, যাঁর পায়রা পোষার শখ নাকি সারা ভারতে সুবিদিত। তাঁর কাছে লক্কা, মুখখি, নোটন, রেশমি, সিরাজি, গুলি, অপরাজিতা, গেরোবাজ ইত্যাদি দেশি পায়রা থেকে শুরু করে আর্কেঞ্জেল, লার্ভ মডেনা, ব্লন্ডিনেট, রান্ট ইত্যাদি বিলিতি পায়রা প্রায় দেড় হাজারটি আছে। আমরা তাঁর বাড়ির ছাদে গিয়ে দেখে এসেছি, জলভরা গামলা ছাদের মাঝখানে রেখে মিত্রমশাই গেরোবাজদের উড়িয়ে দিয়েছেন আর ওদের ছায়া ঘুরে-ঘুরে ঠিক গামলার জলের মধ্যেই ফিরে আসছে। ওঁর কাছেই বিলিতি হোমিং পিজিয়ন দেখেছি, যে নাকি ৫০০ মাইল দূর থেকেও বাড়ি ফিরে আসে ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে। এসব তথ্য জোগাড় হওয়ার পর, গোলোকদাই বলেছেন সবকিছু একটা ছকে ফেলে, নিয়ম অনুযায়ী সাজিয়ে গুছিয়ে তুলে রাখতে। গোলোকদা'র ভাষায় এটা হল 'লোকাল রেকর্ড বুক, ভার্সন জিরো ওয়ান', সমস্তটাই একটা ফ্লপি ডিস্কে এন্ট্রি করে ঢোকানো আছে। গোলোকদা বলেছিলেন জিনিসটা কাজে লাগতেও পারে।

আজ সেই কাজে লাগার দিন। তীর্থ ডিস্কটা পি.সি-তে ঢুকিয়ে কম্পিউটারের পরদায় চোখ রেখে ঝানু রিপোর্টারের ভঙ্গিতে বলতে থাকে, "নিরুপম ঢনঢনিয়া। ঠিকানা : আশাবরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফোর বাই থ্রি নং, অফিস : কুইন'স ম্যানসন, পার্ক স্ট্রিট। বয়স : ৪০/৪২। চেহারা : হ্যান্ডসাম, ড্যাশিং। পেশা : ব্যবসা। ইয়ার্ন আর টেক্সটাইলের এক্সপোর্টার। শিক্ষা : বি.কম কম্পিউটার। পরিবারের সদস্য : স্ত্রী রেখা। ওই এক ছেলে, ডাকনাম পাপ্পু, ভাল নাম অভিষেক। বৈশিষ্ট্য : বহুদেশ ভ্রমণ করেছেন। বেশ ক'টা ভাষা জানেন বলে দাবি। প্রমাণ নেই। তবে ভাল ইংরেজি ও বাংলা বলেন।

গোলোকদা চুপ করে শুনছিলেন। বললেন, "হোটেলে ফোন করে মিঃ জামকরকে চাও তো।"

"মিঃ জামকর,, দুটো জিনিস পাঠান এক্ষুনি। আপনারা হানা দেওয়ার পর মিঃ

কবিতা

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

রহস্যময়

শ্যামলকান্তি দাশ

ওই যে দেখুন, সন্ধেবেলায় আমতলা-জামতলার মোড়ে
যে-ভদ্রলোক হাওয়া খাচ্ছেন ঝিমকালো 'কনটেসা'য় চড়ে
টিভিতে রোজ দ্যাখেন তাঁকে, মস্ত বড় মানুষ তিনি,
আজ যাচ্ছেন হস্তিনাপুর, কাল যাচ্ছেন উজ্জয়িনী।
এই রয়েছেন নিজের মধ্যে, এই রয়েছেন প্রবল ভিড়ে,
দৃষ্টি কিন্তু নিবদ্ধ তাঁর কংসাবতী নদীর তীরে।
এই উঠছেন বৃক্ষচূড়ায়, এই যাচ্ছেন শ্মশানঘাটে,
কিন্তু মনটা ছড়িয়ে আছে সাতাশপল্লী খেলার মাঠে।
আপনি কিছু বলতে গেলেই ছিটকে যাবেন দু'হাত দূরে,
গোঁফের নীচে মিচকি হাসি, কথা কইবেন গানের সুরে।
"এখন বড় ব্যস্ত মশাই, ঘেঁষবেন না বাড়ির কাছে,
একটু বাদেই বেরিয়ে যাব, বাইরে ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে।"
দু'য়ের নীচে ছয় বসাবেন, সূত্র খোঁজায় মগ্ন তিনি,
দুধের পাশেই জল রয়েছে, চায়ের সঙ্গে খান না চিনি।
দেখতে হলে আসুন, বসুন, এতই সহজ দেখতে পাওয়া,
রহস্যময় মানুষ তিনি, মেঘ ছায়া রোদ দমকা হাওয়া।

ঢনঢনিয়ার বাড়ি ও অফিসে যা-যা পাওয়া গেছে তার একটা তালিকা, আপনারা যাকে বলেন 'ইনভেনটরি লিস্ট'। আর, ওঁর ব্যাঙ্কের বেনামে বা স্বনামে লকারগুলো সিজ করা হয়েছে তো ? গুড। এবার প্রত্যেকটা লকারের পাসওয়ার্ডগুলো আমার চাই। ব্যাঙ্কে খোঁজ করলেই পাবেন।"

আধঘণ্টার মধ্যে এক চটপটে ভদ্রলোক গোলোকদার হাতে জিনিসগুলো পৌঁছে দিয়ে গেলেন। আমরা উঁকি মেরে দেখি একগোছা কাগজে টাইপ-করা লিস্ট, তাতে ২৭৪টা আইটেম। প্রথম আইটেমটা ৫১ ইঞ্চি কালার টি.ভি· আর শেষটা চিনেমাটির ফ্লাওয়ার ভাস। অন্য একচিলতে কাগজে ব্যাঙ্কের পাঁচটা লকারের নম্বর আর পরিষ্কার হাতে লেখা পাঁচটি ইংরেজি শব্দ :

Enemy, Panel, Analog, Reign, Spruey. গোলোকদা খুব মন দিয়ে আট-দশ পাতার লিস্টটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। নোট নিলেন। এবার আবার ফোন তুলে বললেন, "মিঃ জামকর, ইনভেনটরি লিস্টে দেখছি বুকস অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যালস, টোয়েন্টি নাম্বার্স। এগুলো স্কুলের টেক্সট বইটই নয় তো ? তা হলে বইগুলোর নাম চাই।" আমাদের দিকে ফিরে, "পাঁড় ব্যবসায়ীর বাড়িতে কুড়িটা বই ! ভাবনার কথা।" দশ মিনিটের মধ্যে ফোন এল। "শুধুই টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির ট্রেড জার্নাল ? পনেরোটাই ? বাকিগুলো ? তিনটে ? আর ? আশ্চর্য তো। নাম বলুন, নাম বলুন," গোলোকদা দ্রুত হাতে নোট নেন।

এর পর গোলোকদা ওঁর পি.সি-তে গিয়ে বসলেন। ইংরেজি শব্দ পাঁচটা টাইপ করেন। কী একটা প্রোগ্রাম চালান।

আবার ফোন তোলেন, "মিঃ ঢনঢনিয়ার পাসপোর্ট-টাসপোর্ট থেকে উনি কোন-কোন দেশে ঘুরেছেন তার নামগুলো পাওয়া যাবে ? বেশ, বলুন। দাঁড়ান, দাঁড়ান, মিলিয়ে দেখুন তো ইয়েমেন, নেপাল, অ্যাঙ্গোলা, নাইজার, সাইপ্রাস এসব আছে ? ওঃ, নেপাল ছাড়া সবকটা আছে ? আচ্ছা, আচ্ছা, নেপাল যেতে তো পাসপোর্ট লাগে না। চমৎকার ! মিলে যাচ্ছে ? কেমন করে বুঝলাম ? অ্যালগরিদম বোঝেন ? মানে যুক্তির সূত্র। সেই অ্যালগরিদম দিয়ে। যাক্, বাকি দেশগুলোর নাম বলুন তো। হুঁ, বতসোয়ানা, সুরিনাম, সিঙ্গাপুর, ইউ. এস. এ, দুবাই, কাতার, সুদান, আলজিরিয়া। ব্যস ? ঠিক আছে। এবার একটু মিঃ প্রধানকে ফোনটা দিন না। মিঃ প্রধান ? পাসওয়ার্ডটার ক'টা অক্ষর হবে মনে হয় ? পাঁচটা থেকে আটটা ? ভেরি গুড।"

এবার গোলোকদা আবার পি.সি-রসামনে বসেন। কিছুক্ষণ কি-বোর্ড নাড়াচাড়া করে, আবার টেলিফোন। কানেকশন না হওয়ায় ওঁর বিরক্তিটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। লাইন পেতেই বললেন, "এইটা ট্রাই করে দেখুন তো, এস. ডব্লিউ. এ. এন. বি. ও. এ. টি— সোয়ানবোট। হাঁ সোয়ানবোট।"

আমরা হতবাক হয়ে বসে রইলাম। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। সোয়ানবোট ? সেটা আবার কী ? 'রাজহংস তরণী' ? তার মানে ? এটাই কি ঢনঢনিয়াজির গুপ্ত পাসওয়ার্ড ? তাই যদি হবে তবে গোলোকদা সেটা এখানে বসে -বসে, ঢনঢনিয়াজির কম্পিউটারে একবার চোখও না বুলিয়ে খুঁজে বের করলেন কী করে ?

গোলোকদা নির্বিকার মুখে বললেন, "অবাক হচ্ছ ? এর নাম গোলোকট্রিক। গোলোকট্রিক শক্।"

পঁচিশ মিনিটের মধ্যে, গাড়ি থামার শব্দ, দরজা খোলা ও বন্ধের শব্দ আর দু'জোড়া পায়ের দ্রুত আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, মিঃ জামকর ও মিঃ প্রধান প্রায় দৌড়ে-দৌড়েই ঢুকছেন। মিঃ জামকর গোলোকদার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন, "এ কি ম্যাজিক ? আপনি জাদুকর ? দিস ইজ উইচ-ক্রাফ্‌ট ইন ব্রড ডে-লাইট। অবিশ্বাস্য ! আপনি তো ঢনঢনিয়ার কম্পিউটারে হাতও লাগাননি !"

একগাল হাসি হেসে মিঃ প্রধান বললেন, "আমরা ঢনঢনিয়ার কম্পিউটারের ডিস্ক সিল করে দিয়েছি। গোটা ডিস্কের কপিও নিয়ে নিয়েছি। এবার দিল্লি গিয়ে ধীরেসুস্থে ওর নাড়ির খবর সব টেনে বের করব। এবার একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছে।"

মিঃ জামকর বললেন, "আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এটা একটা মস্ত ব্রেক-থ্রু। ঢনঢনিয়া একটা নাটের গুরু। ডিপার্টমেন্ট খুব খুশি হবে। সরকার আপনাকে অ্যাপ্রিসিয়েশন পাঠাবে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার তরফ থেকে..."

গোলোকদা হাতের একটা ছোট্ট ভঙ্গি আর চোখের দৃষ্টিতে তাকে থামিয়ে দেন, তাঁর ভঙ্গিতে এমন একটা কিছু ছিল মুখে কিছুই বলতে হল না। মিঃ জামকর অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেলেন। আমাদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, "কিন্তু আপনার, মানে, কীভাবে আপনি রহস্যভেদ করলেন, যদি..."

"না। সেটা আমার প্রফেশন্যাল সিক্রেট। আশা করি মার্জনা করবেন। তবে একটা ছোট্ট সূত্র দিচ্ছি, 'অ্যানাগ্রাম'।"

কথাটা শুনে মিঃ জামকরের মুখটা একটু ফাঁক হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে সেটা উনি সামলে নিলেন, কিন্তু মিঃ প্রধানের ফ্যালফ্যালে চাউনিটা ল্যাম্পপোস্টে আটকানো কাটা ঘুড়ির মতো তাঁর মুখে লটকে রইল।

গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যেতে আমরা গোলোকদাকে ঘিরে ধরলাম হইহই করে। "আমরা কিন্তু ছাড়ছি না। ওসব সিক্রেট-টিক্রেট বুঝি না। বুঝিয়ে বলুন।"

গোলোকদা বলেন, "স্রেফ অ্যালগরিদম। ঢনঢনিয়ার বাড়িতে অ্যানাগ্রাম প্যালিনড্রোম এর দু-দুটো ইংরেজি বই পাওয়া গেছে শুনে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। সে পড়ুয়া লোক নয় বোঝাই যায়, তাই এরকম স্পেশালাইজড বই তার কাছে থাকাটা একটু খটকা লাগায়। তারপর ব্যাঙ্কের লকারের পাসওয়ার্ডগুলো ভাল করে দেখেই বুঝি এগুলো অ্যানাগ্রাম করা শব্দ, কারণ একটার সঙ্গে অন্যটার কোনও লজিক্যাল মিলই নেই।"

"অ্যানাগ্রাম মানে একটা শব্দের অক্ষরগুলোকে অন্যভাবে সাজিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করার খেলা। যেমন ঢনঢনিয়াজির ব্যাঙ্ক লকারের পাসওয়ার্ডগুলোই ধরা যাক :

Enemy-এর অ্যানাগ্রাম Yemen
Panel-এর Nepal
Analog-এর Angola
Reign-এর Niger
Sprucy-এর Cyprus

"বুঝতেই পারছ প্রতিটা এক-একটা দেশের নাম। আমার কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডার আবার জানাল এই সব ক'টা দেশই টেক্সটাইল ইমপোর্ট করে। ঢনঢনিয়াজি যা এক্সপোর্ট করেন। দুয়ে-দুয়ে চার। ব্যাঙ্কের পাসওয়ার্ডে যিনি দেশের নাম ব্যবহার করেছেন, অন্যত্রও একই লজিক ব্যবহার করবেন এটাই স্বাভাবিক। আবার দেশের নাম খুঁজতে গিয়ে ঢনঢনিয়াজিকে অন্ধকারে হাতড়াতে হবে না, কারণ উনি প্রচুর টুর করেন। যে দেশে গেছেন, সেই দেশের নাম মনে পড়াই স্বাভাবিক। ওঁর পাসপোর্ট থেকে বাকি দেশগুলোর নাম পাওয়া গেল। পাসওয়ার্ডটা পাঁচ থেকে আট অক্ষরের। তাই আট অক্ষরের Botswana-কেই বেছে নিলাম, এর কোনও অ্যানাগ্রাম হয় কি না পরীক্ষা করে দেখতে। আমার কম্পিউটার মুহূর্তের মধ্যে তা করে দিল— SWANBOAT। আর এটাই দেখা গেল শেষ পর্যন্ত ঢনঢনিয়াজির লুকনো কম্পিউটার পাসওয়ার্ড হয়ে দাঁড়াল।"

"আর প্যালিনড্রোম ?" সাগরনীলের জিজ্ঞাসা।

"প্যালিনড্রোম মানে শব্দের ফেরতাই। অবশ্য এর সঙ্গে ঢনঢনিয়াজির পাসওয়ার্ডের সম্পর্ক নেই। এটাও এক ধরনের শব্দের খেলা। যেমন ধরো, ইভের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পর আদম বলল, 'Madam I'm adam'। উত্তরে ইভ শুধু একটা কথা বলল, 'Eve'। দুটোই প্যালিনড্রোমের উদাহরণ, উলটোদিক থেকে পড়ো, দ্যাখো ঠিক একই বাক্য বা শব্দ। আরও শুনবে ? 'থাক রবি কবির কথা'।"

"আমি একটা জানি," বুবাই বলে, "বেনে তেল সলতে নেবে'। আমার দাদু শিখিয়েছেন।"

"বাঃ। ভারী সুন্দর তো।" গোলোকদার উচ্ছ্বাস।

আমাদের কথাবার্তার মধ্যে ধবধবে আলিগড়ি পাজামা আর মোটা কলারের কুর্তা পরা, হাতে পানমসলার কৌটো, ধারালো চেহারার যে ভদ্রলোকটি দরজায় দাঁড়িয়ে, তিনিই যে স্বয়ং নিরুপম ঢনঢনিয়া, তা বুঝতে সময় লাগল না।

"নমস্কার। আপনিই তো গোলোকধান্ধাজি ? আমার নাম নিরুপম ঢনঢনিয়া। আসতে পারি ?"

সর্বনাশ ! ধাঁধার ভক্ত গোলোকদাকে পাড়ার কিশোর মহল যে গোলোকধাঁধা বলে আড়ালে ডাকে, ইনি তা জানলেন কী করে ? পাপ্পুর কাছে শুনেছেন ?

"আসুন, আমার নাম গোলোকবিজয় রাহা। ছোটদের ভালবাসায় দেওয়া দারুণ জুতসই নামও ধেড়েদের মুখে বেমানান শোনায়।"

বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ঢনঢনিয়াজি ভেতরে ঢুকলেন। হাতজোড় করে বললেন, "আমি আপনার প্রতিবেশী। শুনলাম আই টি ডিপার্টমেন্টের আদমিরা আপনার কাছে এসেছিল। ওরা আমার কম্পিউটার নিয়ে চলে গেল। শুনলাম আমার পাসওয়ার্ড ওরা খুঁজে পেয়েছে। আমি জানতে এলাম। এতে আপনার কোনও হাঁথ আছে কি না।"

"হ্যাঁ," গোলোকদা বলেন, "আমার হাত আছে। আমিই আপনার অ্যানাগ্রাম করা পাসওয়ার্ড খুঁজে বার করেছি।"

"ইউ আর এ ডার্লিং মিঃ রাহা। অ্যান্ড এ জিনিয়াস টু। আপনার নামডাক আমি শুনেছিলাম। আপনি সফট্ওয়্যার উইজার্ড। কিন্তু আমার পাসওয়ার্ডটা ধরলেন কী করে ?"

"ভেরি ইজি। আপনার ব্যাঙ্কের লকারগুলোতে কী-কী পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন মনে আছে ?"

"ওহ। যাকগে। আমার কোনও ক্ষতি এতে হবে না। আমার ল-ইয়াররা আমার সিজ করা অ্যাকাউন্ট আর লকারগুলো সব ফেরত আনার বন্দোবস্ত করবে কাল থেকেই। ডিপার্টমেন্ট ওর কাজ করল। আমি আমার কাজ করব।"

"কিন্তু, আপনার সব সিক্রেট ইনফরমেশন তো ওদের হাতে।"

"ওঃ, ইউ আর সাচ এ ডার্লিং মিঃ রাহা ! এ সুইট ইনোসেন্ট ডার্লিং ! আপনি সত্যি ভাবছেন আমার ডিস্কে সিক্রেট ইনফরমেশন কিছু আমি রেখেছিলাম ? হ্যান্ডস্ট আই ওয়াইপড্ ইট ক্লিন ? লাইক এ ক্লিনশেভ্ন হেড ! ন্যাড়া মাথার মতো পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, বুঝলেন। দেন আই পুট টন্স অব গার্বেজ ইনটু ইট। মানে যত্তসব আবোলতাবোল জঞ্জাল, অর্থহীন ডেটা ঢুকিয়ে রেখেছিলাম ডিস্কে। ওদের আমি বিলকুল বুদ্ধু বানিয়ে দিলাম। ওরা মিথ্যে পাসওয়ার্ড নিয়ে মাথা ঘামাল, আমি অনেক সময় পেলাম। মূল্যবান সময়। সেটা আমি কাজে লাগালাম।"

গোলোকদা ঢনঢনিয়াজিকে থামিয়ে দেন, "তার মানে আপনি জানতেন আজ আপনার বাড়ি বা অফিসে রেইড হবে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"আপত্তি না থাকলে বলবেন কীভাবে ?

"আপত্তির কিছু নেই। সিমপল ডিডাকশান। বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লিতে কিছুদিন আগেই রেইড হয়েছে। একসাথ বিশ-তিশ জায়গায়। এবার নিশ্চয়ই বাঙ্গালোর, কলকাতা ইত্যাদির পালা। তাই অ্যালার্ট ছিলাম। এইসব রেইড একসঙ্গে এত জায়গায় হয় যে, লোকাল স্টাফে কুলোয় না। তা ছাড়া এত বড় তোড়জোড় লোকাল অফিস থেকে করলে ইনফরমেশন লিক হয়ে যেতে পারে। তাই ওরা অন্য শহর, স্পেশ্যালি দিল্লি থেকে অফিসার নিয়ে আসে। এই অনুমানের ওপর আমার আদমি হোটেলে খোঁজ রাখছিল একসাথ বিশ-তিশ আদমি ব্লক বুকিং করছে কি না। তা ছাড়া এয়ারপোর্টেও আমার আদমি ছিল। দিল্লি ফ্লাইটের ওপর নজর রাখার জন্য। সেখান থেকে খবর পেলাম কাল সাতাইশ আদমির পার্টি ইভনিং ফ্লাইটে কলকত্তা নামল, ব্যস।"

গোলোকদা তারিফ করার গলায় বললেন, "বাঃ, চমৎকার অ্যালগরিদম।""

"আপনি আমার মাথা খাটিয়ে বের করা পাসওয়ার্ড ধরে ফেলেছেন। তার মানে আপনার মাথা খুব সাফ। আমি এলাম আপনাকে বন্ধু বানাতে। আপনি আমার কম্পিউটার কনসালট্যান্ট বনে যান। অব কোর্স, আপনার ঠিকঠাক ফিজ্ আমি দিতে রাজি। এনি অ্যামাউন্ট। আমার নাম N.Dhandhania'র অ্যানাগ্রাম কী হয় জানেন তো ? A hand-in-hand. তাই আপনার হাঁথে হাঁথ মেলাতে এলাম।" বলে একটা হাত গোলোকদার দিকে বাড়িয়ে দেন ঢনঢনিয়াজি।

গোলোকদা হাতটা বাড়িয়ে দেন, "অতি বুদ্ধিমান প্রতিবেশীর সঙ্গে হাত মেলাতে কারও আপত্তি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আপনার আরও একটা পরিচয়ও যে আমি জেনেছি। আপনি ট্যাক্স ফাঁকি দেন, ডিউটি ফাঁকি দেন, চোরাই লেনদেন, জালিয়াতি করেন, আপনার টাকা কামানোর আসল উপায়গুলো সবই বেআইনি। আপনার হাতে তাই অনেক ময়লা।" গোলোকদা পকেট থেকে রুমাল বের করে ডান হাতটা মুছতে-মুছতে বলেন, "আমার এই হাতটা তাই ভাল করে মুছে নেওয়া দরকার।"

ঢনঢনিয়াজি ধীরেসুস্থে কৌটো খুলে পরপর তিন চামচ পানের মসলা মুখে ফেললেন, "আমি বিজনেসম্যান। ইনসাল্ট আমরা গায় মাখি না। আমার অফারটা কিন্তু স্ট্যান্ড করছে। আপনি রাজি খুশি থাকলে আপনারও লাভ, আমারও। কথাটা কিন্তু ভেবে দেখবেন। চললাম, নমস্কার।"

"দাঁড়ান।" গোলোকদা ধারালো গলায় বলেন, "আমার কথাটাও তা হলে শুনে যান। আপনার প্রস্তাবটার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু গোলোকবিজয় রাহা যে কোনও চুক্তিতে কাজ করে না সেটা না জেনে প্রস্তাবটা করা আপনার ঠিক হয়নি। কোন কাজটা আমি নেব, সেটা আমিই ঠিক করি, অন্যে নয়। তা ছাড়া যে কম্পিউটারে আপনি আপনার 'উলটাফুলটা'র হিসেব কষবেন, সেটা যে আমি বাঁ হাত দিয়েও ছোঁব না, সেটা আপনার বোঝা উচিত ছিল। পাড়ায় যখন থাকি, আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে, তবে তার জন্য আমি যে খুব উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করব তা বললে ভুল হবে। আসুন। নমস্কার।"

"ওয়েল, ওয়েল," বলে কাঁধ ঝাঁকালেন মিঃ ঢনঢনিয়া, "অ্যাজ ইউ প্লিজ, মাই ডার্লিং, আপনার মর্জি।" বলতে-বলতে উনি বেরিয়ে যান।

ঠিক সেই সময় পাড়ার একটা নেড়ি কুকুর বাইরে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

এক্সপ্রেস ডেলিভারি মিঃ ক্লজ... আপনার জন্য ভেরনিকা লজের বড়দিনের ফর্দ এনেছি !
ভেতরে আনুন।
কাজটা অত সহজ নয়, সার...
এক্সপ্রেস ডেলিভারি
হা হা ! লোকে বলে কে দুষ্টু আর কে লক্ষ্মী আমি জানি !
কয়েক বছর আগে ভেরনিকা খুব দুষ্টু ছিল !
তার বাবা টাকা ছাড়া অন্য কথা ভাবত না !
তাই সেই বছর বড়দিনে আমি ওদের শুধু একটুকরো কয়লা দিয়েছিলুম !
তবে এর থেকে মিঃ লজের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল...
12-27
তিনি তাঁর শেয়ারের দালালকে কাজে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন...
নববর্ষের আগেই তিনি তাঁর সম্পদ দ্বিগুণ করলেন...
কয়লা
দীর্ঘনিশ্বাস : কিছু হার... কিছু জিত !

কোমলতা চায় কোমল পরশ

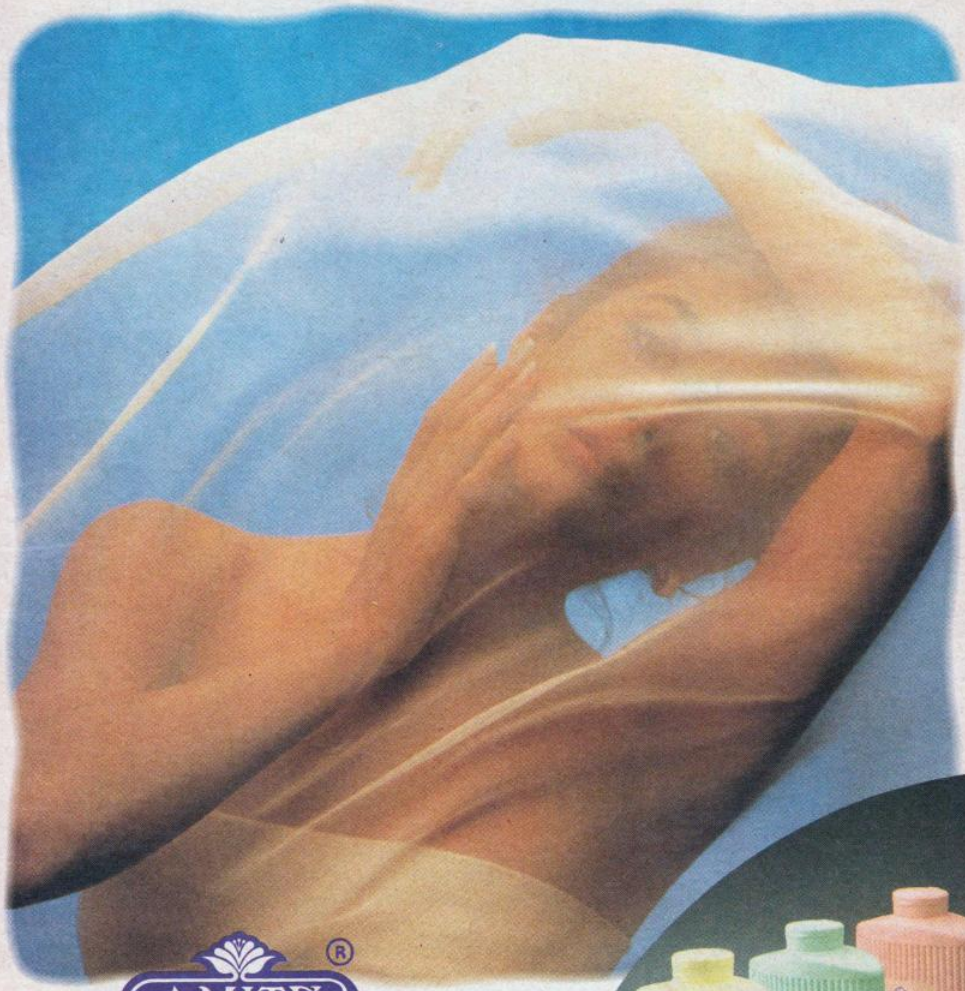

AMITY®

TALC

গাবলু
এই প্যাকেটটা ২ নম্বর বোসপাড়া রোডে মিসেস রায়কে দিয়ে এসো।
আর সাবধান, ওঁর বাড়িতে একটা কুকুর আছে।
মিসেস রায়, এক ঘন্টা আগে একটি ছেলের হাতে আপনার জন্য একটা প্যাকেট পাঠিয়েছি... এতক্ষণ ওর পৌঁছে যাওয়ার কথা!
ওহ্, তুমি এসেছ!

গাবলু

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
ভেবেছিলুম তোমাকে কুয়োর মধ্যে রেখে এসেছি ! মনে হয় ভুল সংশোধন করতে হবে ।
তুমি দেখছি আশাবাদী !
তুমি বেঁচে থাকার যোগ্য নও ! হয়তো ভুলটা আমি সংশোধন করব ।
দুর্গের মধ্যে, মার্কুই পল ডারনটকে খুন করে ওঠবার আগেই টারজান লড়াইয়ে যোগ দিল ...
পল, পিস্তল নিয়ে ছেলেটাকে খোঁজো !
উফ !
হুঁশিয়ার বন্ধু, এটা অনুশীলন নয় !
টারজান: তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলেছি । তুমি মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক হোয়ো না । যে-কাজ করছ তাতেই সব মনোযোগ দিয়ো ....
মার্কুই ওর তলোয়ারে বিষ মাখিয়েছে ! একটি খোঁচা মানে মৃত্যু । আমার কথা বিশ্বাস না হলে ক্লডকে জিজ্ঞেস করো ।
সত্যি নয়, ক্লড ?
3038

ধারাবাহিক উপন্যাস

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

পাণ্ডব গোয়েন্দা

ভোম্বল বলল, "করলেই হল ? বিলুর ব্যাপারটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট। আমি জেনেশুনে তৈরি হয়েই যাচ্ছি।"

গোপা বলল, "ভোম্বল একাই বা ওই দ্বীপে যাবে কেন ? আমিও যাব। সাঁতার আমিও নেহাত কম জানি না। তবে কী জানো ? এই যে দেখছ বিশাল পারাবার, এই যে ধীরপ্রবাহিণী গঙ্গা, এর কিন্তু জলের টান খুব। পাহাড়িয়া গাঙ। এটা পুকুরের জল নয়। তার ওপর এই শীতকালে বরফের মতো ঠান্ডা জলে স্পর্শ-মাত্রেই হাত-পা কোলাপ্স।"

ভোম্বল বলল, "ওইটাই যা একমাত্র ভয়ের। না হলে কলকাতার সাগরমুখো গঙ্গার টানও বড় কম নয়। সেই গঙ্গাও আমি সাঁতরে পার হয়েছি।"

বাবলু একটু ভেবে বলল, "গোপাকে সঙ্গে নিতে পারিস।"

ভোম্বল বলল, "বিপদ বুঝলে আমি জলে ঝাঁপিয়ে ঠিক আত্মরক্ষা করতে পারব। গোপাটা সঙ্গে থাকলে মনোবল আরও বাড়বে। তোরা একটু দূর থেকে লক্ষ রাখিস। বিপদের গন্ধ পেলেই পুলিশে খবর দিবি।"

বিলু বলল, "ভোম্বলের এই প্রস্তাবটা মন্দ নয়। আমরা আজই বিকেলবেলা এইখানে এসে নৌকো ঠিক করে সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করব।"

ওরা নিজেদের মধ্যে এইসব আলোচনা করে ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। কত ছোট-ছোট মন্দির আছে এইখানে। নানান দেব-দেবী আছে তাতে। কত লোক স্নান করছে, দানধ্যান করছে। বাবলুরা স্নানের জন্য জলে নেমেই বুঝল, গোপার কথা ভুল নয়। সে কী প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জল ! বরফকেও বুঝি হার মানায়। ভোম্বল কি পারবে বিপদের সময় এই জলে ঝাঁপিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে ? যাই হোক, ওরা ভালভাবে স্নান সেরে পঞ্চুকেও স্নান করিয়ে ফিরে এল ধর্মশালায়। তারপর চৌরাস্তায় গিয়ে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে সারাটা দুপুর ধরে শুধু আলোচনা আর আলোচনা।

বিকেলবেলা ওরা আবার চলল গঙ্গার ঘাটে। অবশ্যই রীতিমত তৈরি হয়ে। তবে এবারে আর কষ্টহারিণী ঘাটে নয়, মুন্সের স্টেশনের পেছন দিকে যে ঘাট, সেইখানে। ভাগ্যে গোপা সঙ্গে ছিল, তাই কোথাও কোনও অসুবিধেই হল না। ওরা শ্মশানের পাশ দিয়ে শবদাহ দেখতে-দেখতে চলল পারঘাটার দিকে। সেখানে নিয়মিত স্টিমার সার্ভিস রয়েছে।

সুন্দর জায়গাটা। শবদাহের উৎকট গন্ধ নাকে লাগে না। গঙ্গার জলের ছলছল কলকল শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ওপারে ধু-ধু করছে বালুচর। তারও ওপারে সবুজ বনানী ও ছোট-ছোট ঘরবাড়ি। এপারে মুঙ্গের, ওপারে মুঙ্গের ঘাট। কত নৌকো, স্টিমার বাঁধা আছে ঘাটে। এইখানে এসে যেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর হয়ে উঠল পঞ্চু। সে মনের আনন্দে এদিক-সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল অবাধে।

গঙ্গার ধারে সারি-সারি হোগলার ছাউনি দেওয়া দোকানে শিঙাড়া, জিলিপি, কচুরি ইত্যাদি ভাজা হচ্ছে। ওরা তাই খেয়েই বৈকালিক জলযোগ সারল। তারপর গরম চায়ের ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে এই মনোমুগ্ধকর পরিবেশে নয়নাভিরাম দৃশ্যের মুখোমুখি হয়ে স্টিমারে যাত্রী-পারাপার দেখতে লাগল।

এক জায়গায় একটি বড় স্টিমার নোঙর করা ছিল। তাতে লোকজন ছিল না। বাচ্চু আর বিচ্ছু গিয়ে উঠে বসল তাতে।

আর বাবলু করল কি, বাইনোকুলারে চোখ দিয়ে দূরের সেই সীতাচরণ মন্দিরকে লক্ষ করতে লাগল।

তাই দেখে একজন মাঝি এগিয়ে এসে বলল, "কী দেখছ খোকাবাবু, যাবে নাকি ওইখানে ? নাওমে লিয়ে যাব।"

বাবলু বলল, "কী আছে ওইখানে ?"

"সীতা মাঈজি কি মন্দির।"

ভোম্বল বলল, "হ্যাঁ যাব। কিন্তু অতখানি পথ যেতে সময় লাগবে কত ?"

"কমসে কম দো-তিন ঘণ্টে লাগ যায়েগা।"

গোপা বলল, "লাগুক। চলো তো যাই।"

বাচ্চু, বিচ্ছু তখন স্টিমার থেকে নেমে এসেছে।

বাবলু বলল, "আসলে ব্যাপার কী জানো মাঝিভাই, নৌকোয় চাপতে আমার দারুণ ভয়। তাই আমি যাচ্ছি না। সাহস থাকলে ওরা যাক।"

বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু এই অভিনয়টা বুঝল। তাই বলল, "আমরাও যাচ্ছি না বাবা।"

ভোম্বল আর গোপা ওদের দিকে একচোখ টিপে বলল, "আমরা যাব। ভয় কী। মরি মরব। তবু নৌকোয় যেতে ছাড়ব না। এতদূর এসে একটু নৌকোয় না চাপলে হয় ?"

মাঝি বলল, "তুম ভি চলো খোকাবাবু। কুছ ডর নেহি। সবাই চলো তোমরা। আমি গজানন মাঝি। আমার হাতে কোনও নৌকো কখনও ডোবেনি। শাওন-ভাদর মাহিনামে এই গঙ্গার পানি দেখলে তোমরা কী বলতে ! তখনও আমি শক্ত হাতে হাল ধরেছি।"

বাবলু বলল, "আমরা কেউ যাচ্ছি না বাবা। ওরা দু'জনে সাঁতার জানে। যায় তো যাক।"

ভোম্বল বলল, "আমরা যাবই। তোমার নৌকো নিয়ে এসো মাঝিভাই।"

মাঝি বলল, "লেকিন খোকাবাবু, আমার নাওয়ের ভাড়া কত জানো তো ? পঁচ্চিশ রুপাইয়া।"

বাবলু বলল, "নাওয়ের ভাড়া যাই হোক, আমি দিয়ে দেব। কিন্তু এখনই তো সন্ধে হয়ে আসছে। কোনও বিপদ হবে না তো ?"

"আরে বাবা, ডরো মাত। কুছ নেহি হোগা।"

ভোম্বল বলল, "তোমাদের এখানে পটকা পাওয়া যাবে ? খুব জোরে শব্দ হয় এমন পটকা ?"

"হাঁ হাঁ, সব কুছ মিলেগা। লেকিন পটকা তোমাদের কোন কাজে লাগবে ?"

"আরে বুঝছ না কেন, আমরা ওই দ্বীপের মাটিতে পা দিয়েই ফাটাব। যাতে এরা এখানে বসেই আমাদের পৌঁছনো-সংবাদটা পেয়ে যায়।"

মাঝি তখন খুশিমনে বাবলুর কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে পটকা আনতে চলে গেল। সেই ফাঁকে ভোম্বল বাবলুকে বলল, "শোন বাবলু, আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তোরা এইখানে অপেক্ষা কর, আর আমাদের দিকে নজর রাখ। আমরা দ্বীপে পৌঁছেই পটকা ফাটাব। যদি একটা কি দুটো ফাটাই, তা হলে জানবি সব ঠিক

আঁকিবুকি — রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমরা খুঁজে দ্যাখো

আমাদের আঁকার পাতায় দ্যাখো এবারে রয়েছে একটা মজার ছবি। ছবিটি দেখে তোমরা কল্পনা করে এঁকে ফ্যালো ছবির খাতায়। হ্যাঁ, দেখতে একটা কলসির মতো ছবি মনে হলেও, আসলে কিন্তু তা নয়। কী ছবি লুকিয়ে আছে এবারের আভাষের মধ্যে তোমরা খুঁজে দ্যাখো !

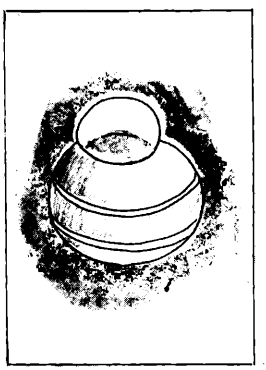

হাসিখুশি

ইন্দু বলল, "বিন্দুদি তোমার বিনুনির রিবন দুটো তো দু' রকমের আর বেশ মজার। একটা হলুদ, একটা নীল।"
বিন্দু বলল, "বাড়িতেও আমার এরকম একজোড়া রিবন আছে বেশ মজার। একটা হলুদ আর একটা নীল।"

❑

রামবাবু : শ্যামবাবু, ল্যাম্পপোস্টের নীচে কী খুঁজছেন ?
শ্যামবাবু : গাছতলায় আমার আংটিটা পড়ে গেল তাই খুঁজছি।

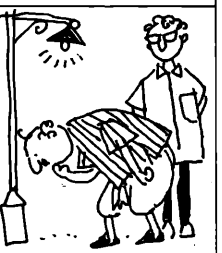

রামবাবু : গাছতলায় পড়ে গেছে, তা হলে ল্যাম্পপোস্টের নীচে খুঁজছেন কেন ?
শ্যামবাবু : আরে মশাই, গাছতলায় কি আলো আছে যে খুঁজব ?

ছবি : দেবাশিস দেব

আছে। আর যদি একসঙ্গে সবক'টা ফাটাই, তা হলেই জানবি আমরা বিপদে পড়েছি। তোরা তখন পুলিশে খবর দিয়ে আমাদের উদ্ধার করবার চেষ্টা করবি। কেমন ?"

বাবলু বলল, "অবশ্যই।"

একটু পরেই মাঝি এল। তারপর অল্প যাত্রী বইবার মতো ছোট একটা নৌকো এনে পাড়ি জমাল মাঝ-দরিয়ায়। বাবলুরা হাত নেড়ে বিদায় জানাল ওদের।

নৌকোটা অনেক দূরে চলে গেলে ওরা সেই নোঙর-করা স্টিমারের ডেকে গিয়ে বসল। যদিও ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাঁপুনি দিচ্ছে, তবুও মাথার ওপর একটা আচ্ছাদন আছে। দেখতে-দেখতে সূর্য ডুবে গেল। সন্ধে হল। সন্ধে উত্তীর্ণ হয়ে রাতের অন্ধকারে ঢেকে গেল চারদিক। আর ওদের দেখা গেল না সেই অন্ধকারে। ফেরি-সার্ভিসও বন্ধ হয়ে গেছে। তাই ঘাটে লোকজন নেই। এমন সময় হঠাৎ মনে হল, কোথা থেকে যেন একটা চাপা কান্না ভেসে আসছে। কে কাঁদে ? পঞ্চু কানখাড়া করে শুনল একবার। তারপর স্টিমারের চারদিকে বেড়াতে লাগল। বাবলুও এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল সেই অন্ধকারে।

হঠাৎ একসময় পঞ্চু ছুটে এসে কুঁই-কুঁই শব্দ করে বাবলুর প্যান্ট কামড়ে টানাটানি করতে লাগল।

বাবলু, বিলু, বাচ্চু, বিচ্ছু চারজনই চলল তখন পঞ্চুকে অনুসরণ করে। ওরা পা টিপে-টিপে গিয়ে দেখল স্টিমারের খোলের মধ্যে নামার মুখে যেখানটায় একটা কাঠের ভারী পাটাতন দিয়ে ঢাকা আছে পঞ্চু সেইখানে নখ দিয়ে আঁচড়াচ্ছে। তখনই ওরা বুঝতে পারল আসল রহস্য এইখানেই। ওরা সেই ঢাকা সরিয়ে টর্চের আলো ফেলে এক-এক করে ভেতরে ঢুকল। উঃ, কী অন্ধকার ভেতরটা ! কোথাও একটু আলো পর্যন্ত নেই। যাই হোক, ওরা টর্চের আলোয় দেখল এক জায়গায় স্টিমারের মাঝামাঝি অংশে একটি খুঁটির সঙ্গে শক্ত মোটা দড়ি দিয়ে এক তরুণীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। পাছে চেঁচায় তাই তার মুখটাও বাঁধা আছে শক্ত কাপড় দিয়ে।

ওরা সবাই মিলে হাত লাগিয়ে সেই বাঁধন খুলেই অবাক, "এ কী ! ঈশিতাদি ! আপনি এখানে ?"

ঈশিতা বলল, "অন্ধকারে তোমাদের মুখ দেখতে পাচ্ছি না যদিও, তবুও বুঝতে পারছি তোমরা কারা। আমার এই দারুণ বিপদের মুহূর্তে তোমরা এখানে কী করে এলে ? তোমরা কি আমাকে উদ্ধার করবে বলেই এসেছ ?"

বাবলু বলল, "না দিদি। আমরা জানিই না আপনি এখানে আছেন বলে। আপনার কাকার মুখে একটা খবর শুনে ভোম্বল আর গোপাকে আমরা জলদ্বীপে পাঠিয়েছি আপনার ভাই বিশ্বরূপকে উদ্ধার করবার জন্য। এমন সময় আপনার কান্নার শব্দ আমরা শুনতে পাই। কিন্তু আপনি এখানে কী করে এলেন ?"

"তোমাদের সঙ্গে ফোনের কথামতো আমার ভাইয়ের ফোটো নিয়ে হাওড়া স্টেশনে আমি নিজেই এসেছিলাম। মাকে একটু সুস্থ দেখে কয়েকজন আত্মীয়ের হাতে দেখাশোনার ভার দিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিলাম ওর সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলব বলে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, হাওড়া স্টেশনেই আমি ওদের খপ্পরে পড়ে যাই। তারপরে তো দেখছ, কী অবস্থা হয়েছে আমার।"

বাবলু বলল, "ভাগ্যে আমরা এই স্টিমারে এসে বসে ছিলাম।"

ঈশিতা বলল, "আমার কাকার সঙ্গে তোমাদের কোথায় দেখা হল ?"

বাবলু আগাগোড়া সব কথা খুলে বলল ঈশিতাকে। বিলুকে উদ্ধার করা থেকে সাধুচরণের সঙ্গে দেখা হওয়া, এমনকী তার খুন হওয়ার ঘটনার কথাও বাকি রাখল না।

সব শুনে ঈশিতা বলল, "কাকা যখন বলেছে, তখন ওকে জলদ্বীপে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। না হলে কাল সকালে সীতাকুণ্ডে খোঁজখবর নিলেই হবে। তবে আমার মনে হয়, কাকার ওপর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আমার ভাইকেই না খুন করে মিঃ এক্স। যাই হোক, শিগ্‌গির তোমরা আমাকে নিয়ে পালিয়ে চলো এখান থেকে। না হলে ওরা এসে পড়লে দারুণ বিপদ হবে আমার।"

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত চৌধুরী

ধারাবাহিক উপন্যাস

শিউলি

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জয় ভেবেছিল, দিদি গল্পটা সুবিধে করতে পারবে না। দিদি সমুদ্রের কী জানে, কতটুকু জানে ! একটা জাহাজ, বিশাল সমুদ্র। ওপরের ডেকে তিনটে লোক। সহজ না কি এমন গল্প ! জয়া প্রথমটায় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। গল্পটাকে কোথা থেকে ধরে কোন দিকে নিয়ে যাবে ! রূপকথার গল্প করে ফেললে চলবে না। অরুণ-বরুণ-কিরণমালা। ওরা তিনজন বড় হয়ে বাণিজ্যে যাচ্ছিল, এমন সময় মাঝসমুদ্রে সর্বনাশা ঝড়। মাস্তুল ভেঙে গেল, পাল উড়ে গেল। জয়া জানে জয় এই গল্প বিশ্বাস করবে না। বলবে, 'দিদি, আমি কী এখনও অতটাই ছোট আছি যে, আমাকে রূপকথার গল্প শোনাচ্ছিস !'

জয়কে সত্যি গল্প বলতে হবে, যে-গল্পে ইতিহাস আছে। জয়া শুরু করল, "স্পেনের মানুষ সমুদ্র ভালবাসে। তাদের কেউ ভীষণ ভাল নাবিক। কেউ আবার দুর্দান্ত জলদস্যু। ছেলেরা যেই বড় হয়। সাবালক হয়, স্বাস্থ্যে যখন তাদের শরীর ফেটে পড়ে। তারা আর ঘরে থাকতে পারে না। সমুদ্র তাদের ডাকে, নতুন দেশ হাতছানি দেয়। তারা ভূগোল-টুগোলের ধার ধারে না। প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষজন তাদের সেইভাবে টানে না, যেমন আমাদের টানে। তারা চায় দেশজয় করতে, ধনসম্পদ লুঠ করে নিজের দেশে এনে ফেলতে। নিজের দেশকে তারা বড়লোক করবে। ভীষণ নিষ্ঠুর, তেমন দয়ামায়া নেই। রক্ত দেখলে তাদের আনন্দ হয়। এইভাবেই তারা একদিন দক্ষিণ আমেরিকা, মেক্সিকো এইসব দেশ জয় করেছিল, দখল করেছিল। সেখানে তখন প্রচুর ঐশ্বর্য। সোনা, রুপো, দামি পাথর। সে হল গিয়ে সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কিছু পরেই। সব হইহই করে আসতে লাগল নতুন দেশে। যে-দেশের নাম হল নিউ ওয়ার্ল্ড।"

জয় বলল, "দিদি, কলম্বাসের কথা আগে একটু বল।"

"কলম্বাসের পুরো নাম, ক্রিস্টোফার কলম্বাস, জাতিতে ইতালীয় ; কিন্তু স্পেনের রাজার চাকরি করতেন। ১৪৯২ সালে আবিষ্কার করেন সান সালভাদর, এখন যার নাম হয়েছে ওয়াটলিং আইল্যান্ড। ওই সময়ই আবিষ্কার করেন বাহামাস, কিউবা আর হাইতি। ১৪৯৩ থেকে '৯৬-এর মধ্যে আবিষ্কার করেন গুয়াদেলপা, মন্টসেরাট, অ্যান্টিগুয়া, পুয়েরটোরিকো আর জামাইকা। ১৪৯৮ সালে কলম্বাস হাজির হলেন দক্ষিণ আমেরিকায়। এই হল কলম্বাসের কথা।"

"তুই এত সব জানলি কী করে ? আমি কেন জানি না !" জয়ের অভিমান হল।

জয়া বলল, "আমি যে তোর চেয়ে বড়। ফাদার আমাকে একটা বই দিয়েছেন, সেই বইয়ে সব আছে। এতে চোখ ছলছল করার কী আছে ! আমি জানলে তুইও জানবি পাগলা।"

"ফাদার যে তোকে একটা বই দিয়েছেন, সে-কথা বলিসনি কেন ?"

"কী আশ্চর্য ! বইটা তো আমাদের পড়ার টেবিলেই রয়েছে।"

"তুই আর আমাকে আগের মতো ভালবাসিস না দিদি ! তুই আর আমাকে কিচ্ছু বলিস না। তুই একা-একা সব জায়গায় যাস। আমাকে সঙ্গে নিস না। তুই কেমন নিবেদিতাদির লিলি ফোর্টে একা-একা গিয়ে ভাব জমিয়ে নিয়েছিস। ওখানে বসে তুই ছবি আঁকিস, ওদের কত কাজে সাহায্য করিস ! আমাকে বলিসনি।"

এইবার জয় সত্যিই কেঁদে ফেলবে। দিদির ওপর ভয়ঙ্কর অভিমান হয়েছে। দিদি তাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, দিদি তার চেয়ে

বেশি সব জেনে ফেলছে, শিখে ফেলছে। কেন, কেন ? এমন কেন হবে ! এই দিদিই তো একদিন বলেছিল, দেখ জয়, আমি আর তুই একই গাছের দুটো ডাল। একই পাখির দুটো ডানা।

জয়া জয়কে জড়িয়ে ধরে বললে, "বোকা ছেলে, লিলি ফোর্টে যে ছেলেদের যেতে দেয় না। যেতে দিলে তোকে আমি নিশ্চয় নিয়ে যেতুম।"

"যেখানে আমি যেতে পারব না সেখানে তুই যাস কেন ?"

"আমাকে যে অনেক কিছু শিখতে হয় ভাই, যা তোকে কোনওদিন শিখতে হবে না, যেমন সেলাই, বোনা, রান্না, ফুল সাজানো, রোগীর সেবা, ইনজেকশান দেওয়া, ফ্লুইড চালানো, ঘর সাজানো।"

"এমন কোনও ওষুধ নেই দিদি, যা খেলে মেয়ে হওয়া যায় ! আমরা বেশ দুই বোন হয়ে যেতুম ?"

দিদা বললেন, "সে উপায় নেই রে গাধা। ছেলে হওয়াই তো ভাল। তোর দাদা, তোর বাবার মতো লম্বা-চওড়া হবি। লেখাপড়া শিখে একা-একা দেশ-বিদেশ ঘুরবি। কত মানুষ দেখবি, কত অভিজ্ঞতা হবে। দিদির বিয়ে হলে দিদি তো তোকে ছেড়ে চলে যাবে, তখন তুই কী করবি ?"

জয়ের আর গল্প শুনতে ভাল লাগল না। সমুদ্র, জাহাজ, নিউ ওয়ার্ল্ড, স্পেনের নাবিক, যাক, সব ভেসে চলে যাক। জয় বিছানা থেকে ছিটকে নেমে পড়ল। ছুটে চলে গেল বাগানে। আকাশে একটা ভাঙা চাঁদ। নরম আলোয় প্রকৃতিতে যেন সেতার বাজছে রিমঝিম করে। অনেক অনেক দূরে কেউ কাঠ কাটছে। কোথায় একটা পাম্প চলছে ঘিনঘিন শব্দে। জয় রক থেকে বাগানে লাফিয়ে পড়ে শিউলি গাছের তলায় চলে গেল। এই গাছের তলায় তাদের জীবনের অনেক সুন্দর মুহূর্ত ফুলের মতো ঝরে আছে। জয় গাছ তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাল। পাতার ফাঁকে-ফাঁকে আলোর আকাশ। ঘাসের ওপর পাতার ছায়া। সেই দিকে তাকিয়ে জয় ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। দিদি তার পাশে নেই, এ তো সে ভাবতেই পারে না। বিয়ে হয়ে গেলেই হল। দিদি বিয়ে করবে না। বিয়ে খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার। দিদিদের নিয়ে চলে যায়। দিদি যদি বিয়ে করেও জামাইবাবু এই বাড়িতে থাকবে।

উদয়ন ঠিক এই সময়েই সরোদে ধরেছেন বাগেশ্রী। এই সুরটা শুনলেই জয় হয়ে যায় পথিক। পথ চলে গেছে দূরে বহু দূরে নীলপাহাড়ের কোল দিয়ে। অনেক রাতের পথিক সে। খড়ক সিংয়ের মতো লাঠি-পোঁটলা নিয়ে চলেছে। পায়ে কড়া নাগরা। পাথর চুরচুর হয়ে যাওয়ার শব্দ। তারা মিটমিট করানো বাতাস। বিশাল-বিশাল দৈত্যের মতো গাছ। ডালে-ডালে বানরছানার কিচিমিচি।

ভাইয়ের খোঁজে জয়া ছুটে এসেছে। জয়া আজ শাড়ি পরেছে, ফিকে হলুদ রং। জয়া বলল, "এখানে অন্ধকারে কী করছিস ? কিছু কামড়ালে কী হবে ?"

"কামড়ালে কামড়াবে, তাতে তোর কী ? তোর তো বিয়ে হয়ে যাবে, তুই তো জামাইবাবুর !"

"তোর মতো এমন নরম ভাইটাকে নিয়ে আমি কী করি ! আমার যখন বিয়ে হবে তখন তুইও তো বড় হয়ে যাবি। বড় হয়ে গেলে তোর নিজের কত বন্ধুবান্ধব হবে, তখন আমাকে কি তোর মনে থাকবে ! তুই তখন বিলেত চলে যাবি। সেই সব দিন একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে।"

"দেখিস, আমি তোর শ্বশুরবাড়িতে কোনওদিন যাব না। তোর বরটা অসুর। রাবণের মতো। দশটা মাথা, ডাবের মতো চোখ। বিটকেল একটা লোক। সারা শরীরে ভালুকের মতো লোম।"

"তুই দেখেছিস বুঝি ?"

"এখনও দেখিনি, দেখতে চাইও না।"

"তোর তো শিরিন আছে, প্রাণের বন্ধু। আমাকে তোর আর দরকার কী ?"

জয় একটু লজ্জা পেল। চাপা গলায় বললে, "ধ্যাত।"

"আজকাল আমাকে আর বলাও হয় না। কোথায় জয়, কোথায় জয় ! জয় শিরিনদের বাড়িতে।"

"শিরিনের সঙ্গে আমি লেখাপড়া করি। শিরিন আমাকে পড়ায়, আমি পড়াই শিরিনকে।"

"সে তো ভালই, তা হলে আর দিদি-দিদি করছিস কেন ?"

জয় ঘাসের উপর বসে পড়ল। একটু স্যাঁতসেতে। ফুলের গন্ধ। পিটিং পিটিং করে লাফিয়ে পালাল কয়েকটা পোকা। জয় জানে ওগুলো কী ? ঘোড়া ফড়িং। রাতে বেরোয়। ছোট-ছোট দেখতে। কী করে সারারাত কে জানে ! এই গাছতলাতেই বিশাল একটা ব্যাঙ থাকে। জয় আর জয়া তার নাম রেখেছে, কোলাভোলা। ভীষণ ভাল। বন্ধুর মতো। চুপচাপ পড়ে থাকে একপাশে। মুড়ি-লজেন্স খেতে ভালবাসে। মহাকৌতূহলী একটা ইঁদুরও আছে। সারারাত ঘুরে-ঘুরে বেড়ায় চৌকিদারের মতো।

দূর থেকে একটা সাদা মূর্তি এগিয়ে আসছেন। দিদা।

সঙ্কেত : পাশাপাশি : (১) কবিগানের আসরে দুই দলের গান। (৩) সংসারে এর দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। (৫) চিত্র, প্রতিকৃতি। (৭) সুন্দরী রূপবতী। (৯) চন্দ্র। (১১) 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' কাব্যগ্রন্থের লেখকের নাম। (১২) এর সঙ্গে ল এসে জুটলে ভয়ঙ্কর হয়ে পড়ে। (১৩) রমণী। (১৫) উত্তম অঙ্গযুক্ত। (১৭) নিযুক্ত। (১৮) আমার। (১৯) দস্তখত। (২০) হ্রদ। (২২) চাপরাস, পদক। (২৪) মাঠ। (২৫)—মনে কাদা নেই। (২৭) পিপাসার্ত। (২৮) বিদ্যাসাগরের রচিত বিখ্যাত বোধমূলক বই। (৩০) পাঁচ বছরের পর পুত্রটির জন্য এই কর্মটি অত্যাবশ্যক। (৩১) প্রিয় রাম। (৩২) শরৎচন্দ্রের গল্পের এক মূক পশুর নাম। (৩৩) ঠিকা, লিজ।

উপর-নীচ : (১) ঋণের দলিল। (২) পালি ভাষায় রচিত বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মবৃত্তান্ত সংবলিত গ্রন্থ। (৩) গর্বিতা। (৪) এঁকে পুত্রের জন্য জেল খাটতে হয়েছে, পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ। (৬) মালিক, গভর্নমেন্ট। (৮) সমর্থ। (১০) একটানা, অবিচ্ছিন্ন। (১৪) অল্প। (১৬) শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ কবি। (১৯) সাবধানতা। (২০) একে ছাড়া চর্বণ, হাস্য, বচন—সবই অচল। (২১) সে নানা বুলি বলে। (২৩) শাক্ত সাধকের কাছে এর চেয়ে প্রিয় নাম আর কিছু নেই। (২৪) সকালবেলার প্রথম আহার, যার নাম ব্রেকফাস্ট। (২৬) ঠেকায় পড়ে অযত্নে কাজ শেষ করা। (২৯) প্রক্ষালন।

গত সংখ্যার সমাধান

বি	প	রী	ত		বা	সী			
মা	রি		ঞ্চ		মা	তা	পি	তা	
ন	দে		ক			ভো		লা	ভ
	ব	নি	তা		স	গ	র		ক্ত
বা	ন	র		স	ন্ত		ক্ত		মা
লে		ক্ষ		হা	তি		ধা	রা	ল
শ্ব		র	হ	স্য		বি	রা	ম	
র	ফা		ন্য			হ		মো	ম
	টা	কা	মা	টি		ঙ্গ		হ	র
			ন	য়া		ম	হা	ন	দ

কাছে এসে বললেন, "কী, অভিমান ভেঙেছে! কাপ ভাঙে, ডিশ ভাঙে, অভিমান কি অত সহজে ভাঙে! কোথাকার জল কোথায় গড়াল, তাই না! খুব হয়েছে, এইবার সব চলো। রাত প্রায় বারোটা হল। কালপুরুষ কতটা নীচে নেমে পড়েছে, দেখেছ?"

জয়ার হঠাৎ খড়ক সিংয়ের একটা কথা মনে পড়ল, "রাত না জাগলে পৃথিবীটাকে জানা যায় না। একটা অন্য পৃথিবী ওইসময় জেগে ওঠে। অন্যধরনের সব প্রাণী ঝোপঝাড় গর্ত থেকে বেরিয়ে আসে। কতরকমের বাদুড় আর প্যাঁচা। গাছেরা এইসময় অন্যরকমের শ্বাস ছাড়ে। আকাশের যত তারা সব এইসময় বেরিয়ে পড়ে মিছিল করে। চাঁদ একা-একা ভেসে পড়ে, যেসব শব্দ দিনের পৃথিবীতে শোনা যায় না, সেই সব শব্দ শোনা যায় রাতে। খড়ক বলেছিলেন, 'রাতে চুপ করে বসবে একপাশে। শরীরের শক্ত ভাবটা আলগা করে দেবে। ধীরে-ধীরে তলিয়ে যাবে, যেভাবে একটা ঢিল তলিয়ে যেতে থাকে সরোবরের জলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনতে পাবে, কে যেন কথা বলছে তোমার ভেতরে। এই ভেতরের মানুষটাই তো বাইরের মানুষটাকে চালায়।' খড়ক সিং নিজের মতো করে নিজের উচ্চারণে রবীন্দ্রনাথের গান গায় :

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক, তারা তো পারে না জানিতে—
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ আমার হৃদয়খানিতে।
যারা কথা বলে তাহারা বলুক, আমি করিব না কারেও বিমুখ
তারা নাহি জানে ভরা আছে প্রাণ তব অকথিত বাণীতে।
নীরবে নিয়ত রয়েছ আমার নীরব হৃদয়খানিতে॥

জয় তাকিয়েছিল জয়ার মুখের দিকে। আলোছায়ায় মুখটা যেন জ্বলজ্বল করছে। ফিকে-হলুদ শাড়ির আঁচল বাতাসে দুলছে। জয়ের সব অভিমান গলে গেল। দু' হাতে দিদির কোমর জড়িয়ে ধরে বললে, "আজ আমি তোর কাছে শোব দিদি।"

দিদা বললেন, "তা হলে তোমার মনের সব দুঃখ দূর হয়ে যাবে?"

শিবশঙ্কর পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, "এ-বাড়ির কোনও মানুষের চোখেই দেখি ঘুম নেই! এত রাতে কিসের সভা হচ্ছে এখানে?"

দিদা বললেন, "মান-অভিমানের পালা।"

"কার আবার অভিমান হল?"

"জয় সুন্দরের। বিষয়টা হল, দিদি কেন তার চেয়ে বেশি শিখে ফেলছে!"

"তাই তো! এ অতি সাঙ্ঘাতিক কথা। তুমি যাচ্ছ এগিয়ে আমি পড়ছি পিছিয়ে। তা তুমিও সমান তালে এগোও। আমার কাছে আছে খনি। আছে সোনা-হিরে-জহরত। ওরে তোরা কে নিবি আয়!"

শিবশঙ্কর দু'জনের হাত ধরে ভেতরে নিয়ে এলেন। কিশোরের হাত কিশোরীর হাত। বাইরে ছিল তাই ঠাণ্ডা। দু'জনেই পবিত্র, তাই ফুলের গন্ধ। বারান্দা পেরিয়ে চলেছেন তিনজন। উদয়নের ঘর। কার্পেটে বসে তন্ময় হয়ে সরোদ বাজাচ্ছেন, এইবার ধরেছেন কেদারা। মুখের চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে গেছে। মা উমা কুকুরের গায়ে বুরুশ দিচ্ছেন। দিনের শেষ কাজ। দিদার ঘরে ধূপ জ্বলছে। সারা বাড়িতে সেই গন্ধ।

শিবশঙ্কর এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মুখে। ঘুরে-ঘুরে উঠে গেছে ওপর দিকে। এই সিঁড়িটা সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। কেউ তেমন আসে না এদিকটায়। (ক্রমশ)

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

বইয়ের খবর

বিস্ময় বিজ্ঞানী

১৯৯১ সাল। কেমব্রিজ সিটি সেন্টারের কাছে পথ দুর্ঘটনায় পড়লেন স্টিফেন হকিং। দুর্ঘটনা তেমন কিছু নয়। কিন্তু ওই সামান্য দুর্ঘটনার খবরই পরের দিন ব্রিটেনের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশিত হল। সম্প্রচারিত হল আমেরিকার প্রতিটি দূরদর্শন কেন্দ্র থেকেও। হকিংয়ের বিশেষ কোনও ভাবান্তর হল না। অথচ সংবাদপত্রগুলি ফলাও করে কেন প্রকাশ করল সেই খবর ? আসলে স্টিফেন হকিং এই যুগের সবচেয়ে বড় বিস্ময়! আর সেইজন্যই হকিংয়ের জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাও সংবাদপত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার দাবি রাখে। 'স্টিফেন হকিং, আ লাইফ ইন সায়েন্স'—বইটির শুরু এইভাবে করেছেন লেখক মাইকেল হোয়াইট এবং জন গ্রিবিন। মাইকেল এবং জন সাবলীল, সহজ-সরল ভাষা ও বর্ণনার মধ্যে দিয়ে সুন্দরভাবে পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন স্টিফেন হকিংয়ের কথা—যিনি এ যুগের দ্বিতীয় আইনস্টাইন। মাত্র ২১ বছর বয়সে যখন হকিং দুরারোগ্য মোটর নিউরন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেলেন—সে-সময় থেকে আজ অবধি পদার্থবিজ্ঞান, বিজ্ঞান-বিষয়ক লেখায় হকিংয়ের সাফল্য এবং তাঁর জীবনযাত্রার সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন দুই লেখক। বইটি তাই হয়ে উঠেছে অত্যন্ত মনোগ্রাহী। স্টিফেন হকিং—আ লাইফ ইন সায়েন্স বইটির লেখক মাইকেল হোয়াইট ও জন গ্রিবিন। প্রকাশক পেঙ্গুইন বুক। দাম ৯৫ টাকা।

নাইটিঙ্গেল ও গোলাপ

বাগানে একা শুয়ে কাঁদছিল ছেলেটি। তার দরকার একটা লাল গোলাপ। বান্ধবী বলেছে একটা লাল গোলাপ দিলে রাজকুমারের দেওয়া পার্টিতে সে সারারাত তার সঙ্গে নাচবে। ওক গাছের উঁচু ডালে বসে ছেলেটির কান্না শুনে ভীষণ দুঃখ পেল নাইটিঙ্গেল। উড়ে বেড়াতে লাগল লাল গোলাপের সন্ধানে। অবশেষে বহু দূরে খোঁজ পাওয়া গেল। কিন্তু শীতের প্রকোপে সব পাতা ঝরে গেছে গোলাপ গাছটির। ডালগুলোও শুকিয়ে গেছে। নাইটিঙ্গেল গোলাপ গাছটির কাছে গিয়ে জানাল ছেলেটির দুঃখের কথা। লাল গোলাপ দিতে রাজি হল গাছটি, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক এক শর্ত দিল

নাইটিঙ্গেলকে। নাইটিঙ্গেলের নিজের জীবনের চেয়েও দামি মনে হল মানুষের ভালবাসার অঙ্গীকার। রাজি হয়ে গেল সেই ভয়ানক শর্তেই। নাইটিঙ্গেল কি পেরেছিল শর্ত পূরণ করতে ? গল্পটির লেখক বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড। শুধু নাইটিঙ্গেল আর গোলাপের গল্পই নয়, প্রথিতযশা এই সাহিত্যিকের সমস্ত গল্প, নাটক, কবিতার এক দারুণ সুন্দর সঙ্কলন 'সিলেক্টেড ওয়ার্কস অব অস্কার ওয়াইল্ড' পাঠকদের সামনে হাজির করেছে ম্যাগপাই বুক্স কোম্পানি। পাউন্ডের হিসেবে বইটির দাম অনেক। কিন্তু ভারতীয় পাঠকদের কথা মনে রেখে বইটির পেপারব্যাক সঙ্কলন এখন পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ১৬০ টাকায়।

ছড়া আছে ছড়িয়ে

নানা রঙের ছড়া
শৈলেন্দ্র হালদার
পদাতিক, কলকাতা-৫৯
দাম : ১০ টাকা

বেশ ভাল ছড়া লেখেন শৈলেন্দ্র। 'একেবারেই সাচ্চা/ জ্যান্ত ভূতের বাচ্চা/ দেখলাম এই চক্ষে/ নেই তো বাবা রক্ষে।' কিংবা 'আকুম বাকুম ডাকুম না/ কলিকাতায় থাকুম না।' তবে সব ছড়াই যে সমান উতরেছে, তা বলা যাবে না। কোনও কোনও

ছড়া পড়তে গিয়ে কানে লাগে। আশা করব, এর পরের বইয়ে শৈলেন্দ্র আর একটু সতর্ক হবেন। লেখার হাত আছে বলেই এই আশা করছি। ছড়া তো সবাই লিখতে পারেন না। বইটির প্রচ্ছদ তেমন আহামরি না হলেও নেহাত মন্দ নয়। কাগজ ও ছাপা উঁচুমানের।

হিমাংশু জানা

বিচিত্র বিজ্ঞান

জীবন ঘিরে বিজ্ঞান
ডঃ কমল চক্রবর্তী
দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা-৭৩
দাম : ২৫ টাকা

বিজ্ঞান-বিষয়ক বইয়ের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বৈচিত্র্যময় নানা বিষয়ের ওপর আমাদের দৃষ্টি পড়েছে। প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আমরা জানি না। এইসব সমস্যার দিকে লক্ষ রেখে মোট ২৫টি বিষয় নিয়ে লেখক সহজভাবে আলোচনা করেছেন। যেমন, চোখের জল ও তার উপাদান, চোখ ও চশমা, পরিবেশ ও আমরা, লম্বা-বেঁটে রহস্য ইত্যাদি। বইটি না পড়লে জানাই যেত না, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, চার্লি চ্যাপলিন বাঁ-হাতি ছিলেন। কিংবা ১৯৮৫-তে নাক-ডাকা প্রতিযোগিতায় যিনি প্রথম হয়েছিলেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার তাঁকে ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন। এরকম অনেক আকর্ষক তথ্যের সঙ্গে লেখক বৈজ্ঞানিক সত্যকেও জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু ছোটদের জন্য নয়, বড়দেরও বইটি ভাল লাগবে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে সুন্দর ছবি আছে।

অমিতেশ মাইতি

বিপ্লবীদের বিচার

সময়টা ২৮ জুন ১৯১৪। সদ্য যৌবনে পা দেওয়া জনৈক কিশোর এক খ্যাতনামা আর্চডিউককে বুলেটবিদ্ধ করে সূচনা ঘটিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের। যুবকটি আগে কখনও কাউকে হত্যা করেনি। অন্তত পুলিশের রেকর্ড তাই বলে। সেইজন্যই আর্চডিউককে হত্যা করেই সায়ানাইড মুখে দিয়ে ঝাঁপ দেয় নদীতে। নদীর জলে পড়ে এত জল খেয়ে ফেলে যে, পুরো বিষটাই বেরিয়ে আসে। প্রাণেও বেঁচে যায়। পরবর্তীকালে ওই নদীর ওপর নির্মিত ব্রিজটির নাম তার নামেই রাখা হয়। বইটি এমনভাবে শুরু হলেও, ভারতবর্ষের খ্যাতনামা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিচারপর্ব নিয়ে লেখা। যার মধ্যে আছে বাহাদুর শাহ জাফর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বালগঙ্গাধর তিলক, ঋষি অরবিন্দ, সাভারকর, মহাত্মা গান্ধী, ভগত সিং প্রমুখ খ্যাতিমানদের বিচারপর্ব। মেরঠ ষড়যন্ত্র মামলার বিচারপর্বের কথাও আছে বইটিতে।

'ট্রায়াল অব ইন্ডিপেন্ডেন্স' নামের এই বইটির লেখক বি. কে. আগরওয়াল। প্রকাশক ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট। দাম ৩২ টাকা।

শান্তনু সরস্বতী

ছবি : কৃষ্ণেন্দু চাকী

নানারকম

ধাঁধা

ক্লিন্টন বি সিলি। ক্লিন্টন বি সিলি। নাগাড়ে ক'দিন ধরে ছোট্কার মুখে এই নামটা শুনছি। শুনে-শুনে আমারই মুখস্থ হয়ে গেছে। সেই একটা শনিবার গ্র্যান্ড হোটেলে নেমন্তন্ন ছিল ছোট্কার। একটা সাহিত্য-পুরস্কার অনুষ্ঠানে। সেদিন রাত্তির থেকেই ছোট্কার মুখে কেবল মার্কিন মুলুকবাসী এই অধ্যাপকের নাম। ওই অনুষ্ঠান থেকে পুঁথির চেহারার স্যুভেনির জাতীয় যে-বইটা এনেছিল সেদিন ছোট্কা, তার মধ্যে এই সাহেবের একটা প্রতিকৃতিও ছিল। চাপ দাড়ি, উজ্জ্বল দুটি চোখ, ভারী বুদ্ধিদীপ্ত মুখ। ছোট্কার মুখে তো শুনলামই, বইটাতেও দেখলাম, আমাদের বাঙালি কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে 'এ পোয়েট অ্যাপার্ট' নামে অসাধারণ একটি বই লিখেছেন ক্লিন্টন। এমন কাজ নাকি বাংলাতেও হয়নি। প্রচুর পরিশ্রম আর প্রগাঢ় ভালবাসার ফসল এই গ্রন্থের জন্যই ক্লিন্টনকে পুরস্কৃত করা হল। ছোট্কার মাথায় ঘুরছে এখন— বইটি কীভাবে

পড়া যাবে। ভারতে এখনও পাওয়া যায় না। এককপিমাত্র এসেছিল, আর তার ভিত্তিতেই পুরস্কার। ছোট্কা এখন হন্যে হয়ে বইটি পড়ার চেষ্টা করছে।

ছোট্কাই বলল, পুরস্কার-সভায় সাহেব নাকি দারুণ একটি বাংলা ভাষণ দিয়েছেন। ছোট্কা মুগ্ধ। আমাদের বলছিল, কী রসজ্ঞান, ভাবা যায় না। যে-প্রকাশক ছেপেছেন বইটি, তাঁকে নাকি ক্লিন্টন লিখেছিলেন, লক্ষ রেখো— জীবনানন্দ নামটি ভুলে জীবানন্দ না ছাপা হয়ে যায়। এর উত্তরে তাঁরা বলেছিলেন, 'ভুল হবে না, নামের মধ্যে 'ব্যানানা' অর্থাৎ কলা থাকলেই বুঝব— বানান ঠিক আছে।'

কথাটা কিন্তু বাস্তবিক দারুণ। ইংরেজিতে 'জীবনানন্দ' লিখতে গেলে সত্যিই যে ব্যানানা থাকে, আমরা এতকাল খেয়ালই করিনি। ছোট্কার মাথায় এই ব্যাপারটাও ঘুরছে ক'দিন থেকে। ঘুরছে যে, তা আরও ভাল বুঝতে পারবে এবারের ধাঁধাগুলো দেখলে। সবই ইংরেজি বানান নিয়ে বানানো। তবে কিনা দারুণ মজার। এবং শক্তও তেমন নয়। কেমন, সেটাই বলি।

প্রথম ধাঁধা ॥ গুপ্তঘাতক হতে গেলে অন্তত দুটো গাধা চাই। কীভাবে তা বুঝিয়ে বলো।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ মাংসের টুকরো সাজিয়ে অন্তত তিনটে নতুন শব্দ তৈরি করো। না, বাংলায় নয়। ইংরেজি 'MEAT' শব্দটা ভেঙে তৈরি করতে হবে তিনটে নতুন শব্দ। চারটে অক্ষরই নতুন শব্দে থাকবে কিন্তু।

তৃতীয় ধাঁধা ॥ হাতির মধ্যে পিঁপড়ে, পায়রার মধ্যে শূকর, ময়ূরের মধ্যে মোরগ— এমন দেখেছ কোথাও? কোথায় দেখেছ?

গতবারের উত্তর ॥ (১) অমল ২৪০০ টাকা, কমল ২০০০ টাকা, বিমল ৮০০ টাকা এবং ইন্দ্রজিৎ ২৮০০ টাকা।
(২) ZEBRA.
(৩) গীতবিতান।

সত্যসন্ধ

মজার খেলা

এবারের মজার খেলাটা এতই মজার আর এতই সহজ যে, খেলাটা শেখার পরের মুহূর্তেই তুমি বন্ধুদের দেখাতে চাইবে। দেখাতে মানে মজা করতে চাইবে বন্ধুদের নিয়ে।

আসলে শেখারও তেমন কিছু নেই। শুধু শুনে নেওয়ার ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে। শর্তটা এই যে, রাস্তায়-ঘাটে মাটিতে-মাঠে এ-খেলা দেখানো চলবে না। মোটামুটি একটা টেবিলের সামনে বসেই দেখাতে হবে।

এ-খেলায় টেবিল ছাড়া আর যা লাগবে, তা হল দুটো কাঠি। দুটো পোড়া দেশলাইকাঠি কিংবা দুটো টুথপিক। সুতরাং কাঠি দুটো আগে জোগাড় করে ফেলো।

বেশ। এবার এই কাঠি দুটো দিয়ে একটা বর্গক্ষেত্র বানিয়ে ফেলো তো। মনে রেখো, কাঠি ভাঙা কিংবা দুমড়নো-মুচড়নো চলবে না। শুধু দুটো কাঠি দিয়ে একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করতে হবে।

শুনেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা অসম্ভব। ১ নং ছবিতে দ্যাখো দুটো কাঠি দিয়ে ১১ হয়, ইংরেজি এল, ভি— এই জাতীয় অক্ষর তৈরি হয়, সমকোণ বানানোও কঠিন নয়, কিন্তু বর্গক্ষেত্র! অসম্ভব ব্যাপার।

ব্যাপারটা কিন্তু অসম্ভব নয় মোটেও, যদি তুমি একটা টেবিলের সামনে সমাধান করতে চাও। তবে হ্যাঁ, মজাদার সমাধান— সন্দেহ নেই। বন্ধুরা উল্লাসে ফেটে পড়বে সমাধানের চেহারাটা দেখলে। দেখবে সমাধানের চেহারাটা? ২নং ছবিতে দ্যাখো।

টেবিলের একটা কোণে কাঠি দুটোকে বসিয়ে দাও— ঠিক এই দু'নম্বর ছবির মতন।

মজারু

(১ নং ছবি)

(২ নং ছবি)

ভাবতে-ভাবতে

কোন কাজেই বা বুদ্ধি লাগে না? সব কাজেই বুদ্ধির দরকার। এমন অনেক মজার প্রশ্ন করা যায়, যার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে উত্তরের সূত্র। শুধু বুদ্ধি দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের। বলতে গেলে বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্নের বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর আর কী! এবারের ভাবতে-ভাবতে থাক না এরকম কিছু প্রশ্ন নিয়ে!

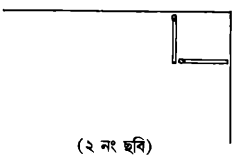

১॥ একজন গ্রাহক

লাইব্রেরিতে এসে বললেন, তিনি এখনই যে বইটা ফেরত দিয়ে গেছেন, তার ১৯ এবং ২০ পৃষ্ঠার মাঝখানে একটা একশো টাকার নোট থেকে গেছে। সেটা ফেরত চাই। এ-কথা শুনে লাইব্রেরিয়ান হো-হো করে হেসে উঠলেন কেন?

২॥ এভারেস্ট আবিষ্কারের আগে কোনটি ছিল পৃথিবীর উচ্চতম পর্বত?

৩॥ কোনটা কাছাকাছি—ইংল্যান্ড থেকে উত্তরমেরু না অস্ট্রেলিয়া থেকে দক্ষিণমেরু?

উত্তর: (১) ১৯ এবং ২০ পৃষ্ঠা হল একই পাতার দুটো দিক, তার মধ্যে একশো টাকার নোট থাকবে কীভাবে? (২) এভারেস্ট। (৩) ইংল্যান্ড থেকে উত্তরমেরু।

বর্ণপ্রিয়

ছবি: দেবাশিস দেব

রূপ-লাগি দেশ-বিদেশের
বিশেষ সম্ভারে
নারীর মুখশ্রীতে
মোহিনীরূপ ঝরে

কিউটিকিউরা'র তিনটি আন্তর্জাতিক বিউটি ট্যাল্ক। বিশ্বের অনুপম সৌরভে ভরা, মনমাতোয়ারা। রেশমের মত পেলব-কোমল। গোলাপের মত সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে, দেশ-বিদেশের বিশেষ সম্ভারের দৌলতে আপনার মুখশ্রীতে মোহিনীরূপ খেলে।

Cuticura
International
BEAUTY TALCS

Chaitra Leo Burnett B MP 10/93 - BEN

ANANDAMELA 26 MAY 1993 REGD. NO.
WB/CC/264 MH-BY-SOUTH-683 TN/MS(C)731

"গড়ন ছিম্‌ছাম্‌, নিব চক্‌চক্‌,
ক্যামলিন আমার হোমটাস্ক সারে চট্‌পট্‌।"

ছোট্ট পাশার চট্‌পট হোমটাস্ক সেরে ফেলার

রহস্য – ক্যামলিন ফাউন্টেন পেন।

এর বেশি ভালো নিব দিয়ে তরতর করে লেখা

এগোয়, দেখতে দেখতে কাজ সারা হয়।

তাইতো তুড়ি মারতেই হোমটাস্ক সেরে ফেলে,

পাশা মনের সুখে দিনভোর খেলে।

সব সময়ের সঙ্গী

Contract.CL.922.93.Bn